মুখপাত।

রহস্য এবং রসিকতা এক পদার্থ নহে। আমি সরস রহস্য লিখিতে পারিয়াছি কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু শুধু রসিকতার অনুরোধে কিছু লিখি নাই, ইহা যেন পাঠক মহাশয়দের—এখন আবার বলিতে হয়-পাঠিকা মহাশয়াদের মনে থাকে। বাঙ্গালায় এখন হাসিবার কিম্বা হাসাইবার দিন আইসে নাই। তবুও যে লোকে হাসে, সে আমার কপালগুণে এবং হাসকদের বুদ্ধির অনুগ্রহে, সে পক্ষে ক্ষমতার দাবি দাওয়া কিছু রাখি না।

একটা সুসংবাদ দিয়া মুখপাতের চূড়ান্ত করিব। শাস্ত্রে আছে, কার্য্যভেদে অবতার ভেদ; পঞ্চানন্দ যে পাঁচুঠাকুর রূপে অবতীর্ণ হইলেন, তাহার এক এবং অদ্বিতীয় কারণ—অর্থলোভ; অথবা, বৈজ্ঞানিক ভাষা বলিতে হইলে,—লক্ষ্মীর চাঞ্চল্য প্রমাণ। ইতি

শ্রীইন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা।

সূচীপত্র।

পাঁচুঠাকুর।

তামাসা নয়।

এই ত ভবের হাটে রসের পসরা মাথায় উপস্থিত হওয়া গেল! এই ত ভবসাগরে রঙ্গিল পান্সী ভাসান গেল! এই ত ভবের ঘানিতে আত্ম-যোড়ন করা গেল! এই ত ভবের আসরে নামা গেল! এই ত ভবলীলা আরম্ভ হইল! এখন দেখা যাউক—তোমারই এক দিন, কি আমারই এক দিন!

পঞ্চা-নন্দ বাহির হইল, লোক-সমাজে এই অলোক-সামাজিক—অলোক-সামান্যই বলিতাম, কিন্তু তাহা হইলে অনুপ্রাস ভঙ্গ হয়—এই অলোক-সামাজিক বর্ত্তিকা এখন নয়নানন্দদায়িনী হইবে, তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। কিন্তু লোকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে, এ আলোক কত দিন অন্তরে ভারত-উজ্জ্বল করিবে? সূর্য্য প্রতিদিন উদিত হন, কিন্তু সূর্য্যের আলোক অতি তীব্র—অসূর্য্য-স্পশ্যরূপা! চন্দ্র ক্রমে ক্রমে কলা প্রদর্শন পূর্ব্বক মাসে একবার মাত্র পূর্ণিমায় আত্ম-বিকাশ করেন;

তদ্‌ভিন্ন, পুরাতন কাহিনী অনুসারে চন্দ্রের কলঙ্ক আছে! নিত্য নৈমিত্তিক গৃহস্থের প্রদীপ—

" স্বর্ণ দেউটি যথা তুলসীর মূলে "—

মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলে, বাতাসে নিবিয়া যায়, এবং টিকা ধরাইবার সময়ে দীপ-ছায়া উপস্থিত হয়, তবে এ আলোক কেমন?

এ আলোক কেমন? গম্ভীরভাবে এই গুরু প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা বাধ্য। এ আলোক—বলিয়াই ফেলি—এ আলোক করাল কাদম্বিনীর অন্ত্রবিদারিণী সৌদামিনী সদৃশ; ভৈরবী শ্যামার সমর রঙ্গ-কালীন হাসির মত! ইহাতে জগৎ চকিত হইবে, স্তম্ভিত হইবে, ঘন বিকম্পিত হইবে, মোহিত হইবে! ভয়ে বিহ্বল হইবে, অথচ আনন্দে অধীর হইবে। তবে আমাদের মুখে এ কথা শোভা পায় না। নাই পাইল, লেখা ত জমিয়া গেল! যাহা হইবে, তাহা হইবে। অদৃষ্টবাদ, কারণবাদ, বিবাদ, বিসম্বাদ কিছুতেই তাহার প্রতিবাদ হইবে না।

অসময়ে যে বন্ধু, সেই বন্ধু—" শ্মশানেচ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।"—পঞ্চা-নন্দ সেই অসময়ের বন্ধু, পঞ্চা-নন্দ সেই শ্মশানবন্ধু। ষড়্‌দর্শনের লোপে ভারতে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল; ঔরস পুত্রের অভাবে আরও একাদশ প্রকার পুত্রের ব্যবস্থা মনুসংহিতায় আছে; সেই জন্য ষড়্‌দর্শনের অভাব দূরীকরণ জন্য বঙ্গ-দর্শন, আর্য্য-দর্শন শ্যাম দেশোদ্ভব যমজ ভ্রাতার

ন্যায় কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ ধরাতলে অবতীর্ণ হইলেন। এখন তাঁহাদেরও অন্তিম দশা—মুখ ব্যাদন করেন বটে, কিন্তু সে খাবি খাইবার জন্য—আর কি নীরব থাকিবার সময়? অতএব উঠ বন্ধুগণ উঠ! জাগ ভারতের হিতব্রত, জাগো!—পঞ্চা-নন্দ স্বয়ং উপস্থিত। (এখানে বুঝিতে হইবে)—অতএব উপস্থিত।

পঞ্চা-নন্দ মুমূর্ষ দেহে জীবন সঞ্চার করিবে, পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিবে, অর্থাৎ যাহারা পত্রিকার গ্রাহক হইয়া মূল্য না দেয়, তাহাদিগকে খুব—খুব শক্ত—আরও শক্ত—আশীর্ব্বাদ করিবে। দীর্ঘায়ুরস্তু!

"বঙ্গ-দর্শন" প্রভৃতি সাময়িক পত্র; সেই জন্য মাসে মাসে দেখা দিবার আশ্বাস দিয়াছিল। পারে নাই, কারণ বাঙ্গালী—স্ত্রীজাতি। স্ত্রীজাতির এমন প্রতিজ্ঞা থাকে না; প্রথম প্রথম দুদিন দশ দিন; তাহার পরে—ভগবান্‌কি হাত!

পঞ্চানন্দ দুঃসময়ের বন্ধু, সেই জন্য অসাময়িক, যখন ফুরসৎ, তখনি সাক্ষাৎ। পঞ্চা-নন্দ স্ত্রীলোক নহে।

পঞ্চা-নন্দের দর্শনী—যে বার যেমন মর্জ্জি। আধুনিক "দর্শন" সমূহের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কেহ কেহ দিয়া থাকেন; সে শ্রেণীর লোককে এই মাত্র বলা যাইতেছে যে, তাঁহারা যখন চব্বিশ মাসে বৎসর গণনা করিয়া পরিতুষ্ট, তখন পঞ্চানন্দকেও যাহা ইচ্ছা দিয়া রাখিতে পারেন, অগ্রাহ্য হইবে না!

এখন আশীর্ব্বাদ করি, এই শুক্তির মুক্তা, দেবতার

ইন্দ্র, নন্দনের পারিজাত, স্নেহের পঞ্চা-নন্দ—দীর্ঘজীবী হইয়া নিজের আয়ুর্ব্বৃদ্ধি এবং যশোবৃদ্ধি এবং অর্থবৃদ্ধি এবং সর্ব্ব সমৃদ্ধির কামনা করিতে রহুন।—এমেন্।

ভূমিকা।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

নন্দ উবাচ।

হরিতে হর, হরে হরি,
দুই দেহ এক আত্মা ভিন্ন কভু নয়।
দুই আত্মা এক দেহ ভিন্ন কভু হয়?

অতএব হরি হর দুয়ে এক, একে দুই; পঞ্চা-নন্দ তদ্বৎ।

তথাপি রূপভেদে উপাসনাভেদ; অবতার ভেদে লীলাভেদ; সেই জন্য—নন্দেরও ভূমিকাভেদ আছে। এ ভেদে যিনি ভয় পাইবেন, তিনি চৈত্র মাসের কেহ নন, চৈত্র মাস তাঁহার কেহ নয়; সকের জলপান, সাড়ে আঠার ভাজা, চনক চূর্ণ, চাল কলাই ভাজায় তাঁহার অধিকার নাই। তিনি দন্তহীন বৃদ্ধ, চর্ব্বণরসে বঞ্চিত। যখন দুর্ভিক্ষ জন্য আর্ত্তনাদ পুরঃসর আমরা অশ্রুপাত করিব, তখন চক্ষের সেই জলের দু ফোটা, তাঁহারা পাইবেন। ইহার অধিক প্রত্যাশা করিলে—যাও, কুছ নেহি মিলে গা।

শুকদেব গোস্বামী লায়েক হইয়া, তাহার পর ভূমিষ্ঠ হন; আর বাঙ্গালার গ্রন্থকারগণ মৃত্যুর পরে বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করেন; আমরা দুয়ের বা'র। আমাদের যে কিছু বিদ্যা বুদ্ধি, তাহা জন্মগ্রহণের পর উপার্জ্জিত; এবং আমাদের যে শিক্ষা, তাহা মৃত্যুর পূর্ব্বেই সমাহিত হইবে।

পঞ্চা-নন্দ লিখিবেন কি সম্পাদিবেন, সুতরাং অগত্যা এই প্রশ্ন উঠিতেছে। বঙ্গোজ্জ্বল-জ্জ্বলা সমুদয় পত্র পত্রিকাতেই বাঙ্গালার সমস্ত প্রধান প্রধান লেখক লিখিয়া থাকেন; এমতাবস্থায় ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, বঙ্কিম চাটুয্যে, সেকস্পিয়ার, গেটে, এমার্সন্, কার্লাইল এবং রাজা রামমোহন রায় এই কয়েকজনকে লেখক শ্রেণীতে বেতন দিয়া নিযুক্ত করিয়া আমরা আসরে অবতীর্ণ হইলাম। ইহাতে কেহ দুঃখিত হইবেন না। সত্বরেই যাহাতে লেখক সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে; "শকুন্তলাগৃহের" বাহিরে যে শাদা ফর্দ্দ ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহা আমাদেরই; সেখান-কার অনুগ্রাহকবর্গ তথাকার স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদনানন্তর সেই ফর্দ্দে নাম লিখিয়া যাইবেন; আমরা তাঁহাদের বেতনের বন্দোবস্ত করিয়া তদ্দিগের দ্বারা রচাইব।

পঞ্চা-নন্দের এক কলম অর্থাৎ এক লেখনী লিখিলে দুই টাকা দেওয়া যাইবে; যাঁহাদের লেখা পত্রস্থ হইবে, তাঁহাদিগকে দেওয়া যাইবে না; যাঁহারা

বেতনের জন্য পীড়াপীড়ি করিবেন, তাঁহাদের লেখা লওয়া যাইবে না। পঞ্চা-নন্দ কখন দেউলিয়া পড়িবে না, বুক ঠুকিয়া এ কথা ঘোষণা করা যাইতেছে।

এবারে যে যে প্রবন্ধ প্রকটিত হইল, তাহা পাঠ সাপেক্ষ; সুতরাং তৎ সমস্তের গুণ গান করিয়া পঞ্চা-নন্দ জঘন্য আত্ম-তৃপ্তি সাধন করিতে পরাঙ্মুখ। এতদ্ভিন্ন পঞ্চা-নন্দ অতিশয় লাজুক, সেই জন্য প্রথম মজলিশে গলা ছাড়িয়া গান করিতে চাহেন না। এবারে নিদাঘের নব-জলদ-সঞ্চার, করকা-নির্ঘোষ, অশনিসম্পাত, বিদ্যুদ্দাম, এবং কদাচ শিলা বর্ষণে পর্য্যবসান। কিন্তু আগামী বারে প্রাবৃটের মূষলধার, ধরিত্রীর কর্দ্দম-চর্চ্চিত বপু, দদ্রুরের স্বরসাধন ওগায়রহ মনোহার্য্যের প্রাচুর্য্য বিদ্যমান দেখা যাইবে। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর ওজোময়ী সীতার বনবাসের ছন্দে "মনসার ভাসান," রামমোহন রায় "কুলবালার বিষম জ্বালা," বঙ্কিম চাটুয্যে "স্ত্রী পুরুষের জাতিভেদ কত দিন হইয়াছে এবং তাহা উন্মূলনের উপায় কি?" প্রবন্ধ দিতে প্রতিশ্রাব করিয়াছেন। অপর শুভ কিমধিকমিতি।

পঞ্চা-নন্দের আত্ম চরিত।

প্রথম অধ্যায়।

অবতারণিকা।

অনেকগুলি কারণের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে আত্ম-জীবন-বৃত্তান্ত লিখিতে এবং প্রকাশ করিতে হইয়াছে; জীবনীতে প্রবেশ করিবার অগ্রে, সেই কারণগুলি ব্যক্ত করা আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে।

প্রথম কারণ, আমার অনিচ্ছা। আমার বিশ্বাস যে, ছাপার অক্ষরে, পুস্তকের আকারে, দোকানদারের মাচায়, .ফেরিওয়ালার বোচ্‌কায়, বিদ্যালয়ের ছাত্র-দের জলখাবারের ঘরে, আমার এই আত্মচরিত গৌরব বিকীর্ণ করিবে; আমার বিশ্বাস, যে উই কি ইন্দুর যদি শত্রুতা না করে, ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম যদি বাদ না সাধে, তবে আমার এই অতুলকীর্ত্তি যুগে যুগে বর্ত্তমান রহিয়া কালের লোল-করাল-রসনাকে লালা-য়িত করিতে থাকিবে, অথচ কখন তাহার খোরাক হইবে না। গ্রন্থ পঠিত হইলে ক্ষয় পায়, ক্রমে লয় পায়; প্রথমে মলাট যায়, তার পর সেলাই যায়, ক্রমে জীর্ণ শীর্ণ, ছিন্ন ভিন্ন। কোন কোন গ্রন্থকার

এই শোকজনক, লজ্জাজনক, ঘৃণাজনক ভাবে নিজকীর্ত্তি বিধ্বস্ত এবং কালের করালকবলে কবলিত হইতে দেখিয়াও সন্তুষ্ট হন, সত্য ; কিন্তু অনেকেরই ভাগ্য অন্যরূপ। আমার সাধ থাকিলেও শঙ্কা নাই। সেই জন্য আমার অনিচ্ছা। এবং এই অনিচ্ছা নিতান্ত বেগবতী বলিয়াই এই আত্মচরিতের প্রকাশ। শতকরা নিরানব্বই খানি পুস্তকের ভূমিকা খুলিয়া দেখ, আমার বাক্যের যাথার্থ্য সপ্রমাণ হইবে। পুস্তক লিখিতে ইচ্ছা নাই, লিখিলে ছাপাইতে ইচ্ছা নাই, কিন্তু নাচার, বন্ধুবান্ধব না ছাড়, তাঁহাদের অনুরোধে পুস্তক বাহির করিতে হয়। আমার বন্ধু-বান্ধব নাই, কেবল অনিচ্ছাটুকু আছে। সেই জন্য এ জীবন-বৃত্তান্ত সহস্র সহস্র দীন দুঃখীর ভরণপোষণ জন্য সংসারে অগ্রসর হইল। কতক্ষণে আমার মত মহানুভবগণের প্রকাশ প্রবৃত্তি জন্মিবে এই উদ্দেশে, কাগজওয়ালা, ছাপাওয়ালা প্রভৃতি কত কত ওয়ালা তীর্থের কাকের মত হা-প্রত্যাশ করিয়া বসিয়া আছে,—যখন এই কথা আমার মনে হয়, তখন চক্ষে জল আইসে ; ইহারা কেহই দাম পাইবে না, সুতরাং নালিশবন্দ হইবে, এই আশ্বাসে কত কত নিরাশ্রয় উকীল মোক্তার, দালাল দাগাবাজ ছোট বড় আদালতে নিয়ত পরিভ্রাম্যমাণ হইতেছে—এ চিত্র যখন আমার অন্তরে উদিত হয়, তখন আমি নিজ মহত্ত্ব অনুভব করিয়া অশ্রুপাত করি ; তাহার পর ইহারা

মামলা জিতিয়া দেনার দায়ে আমাকে ধরিতে আসিবে—এই কল্পনায় যখন আমার মস্তিষ্ক আন্দোলিত এবং সঞ্চালিত হইয়া উঠে, তখন আমি ভাবিভয়ে কান্দিয়া ফেলি। তথাপি আমার অনিচ্ছা, এবং সেই অনিচ্ছা হেতু এই প্রকাশ।

দ্বিতীয় কারণ, বিদ্যাভূষণ ভায়া। জন্ষ্টুয়ার্ট মিল্ নামক এক ব্যক্তি ধরাধামে জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু কেবল জন্মগ্রহণে পরিতুষ্ট না হইয়া মৃত্যুগ্রহণ পর্য্যন্ত করেন। তিনিও—অর্থাৎ মিল্—আমার মত আত্মচরিত লেখেন, কিন্তু তাহা ইংরেজীতে। বিদ্যাভূষণ ভায়া নিঃস্বার্থভাবে বাঙ্গালাভাষায় সেই আত্মচরিতের অনুবাদ করিয়াছেন; কেহই সে অনুবাদ পড়ে না, কেহই সে অনুবাদ কেনে না, তবু স্বার্থত্যাগ এমনই বস্তু, মিল্ এখন বাঙ্গালা অক্ষরে অমর। হনুমান অমর বর লাভ করিয়া নানা মূর্ত্তিতে আমাদিগকে জ্বালাতন করিতেছেন; দাঁত খিঁচোন্, আঁচড়ান্, কামড়ান্—ভয়ে কথাটি কহিবার যো নাই। আমার এই সৌভাগ্য হইবে না বলিয়া আশঙ্কা আছে; কিন্তু আমার নাম অমর হইতে পারে না, ইহা তোমাকে কে বলিল? আফ্রিকার মরুভূমে, নায়াগারার জলপ্রপাতে; আল্‌প্সের উত্তুঙ্গ শিখরে, সুয়েজের সঙ্কীর্ণখালে; চীনে, তাতারে; ফ্রান্সে, জর্ম্মণীতে; মাড্রিডে, সেণ্টপিটর্সবর্গে—এই ত্রিভুবনে আমার জন্য একটীও বিদ্যাভূষণ নাই, ইহা কোন্ প্রাণে বিশ্বাস করিব?

তবে, তবে বল দেখি আমি যদি না লিখিয়া রাখি— তবে সে বিদ্যাভূষণটির দশায় কি হইবে? অগত্যা আমাকে আত্মচরিত লিখিতে হইতেছে।

তৃতীয় কারণ, সাফ্ পরোপকার। প্রকৃতিতে প্রকৃত মাধুরি নাই, প্রকৃত সৌন্দর্য্য নাই, অনেকে এই বলিয়া আক্ষেপ করেন। সেই দুঃখে কল্পনা দেবীর উদরে, বঙ্কিমচন্দ্রের মস্তকের ঔরসে কতকগুলি মাধুরি এবং সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি; পূর্ণচন্দ্রের উপর সেইগুলির লালন-পালনের ভার। কিন্তু আমি মাধুরির অবতার, সৌন্দর্য্যের রূপ। এই আত্মচরিত লিখিলে বঙ্কিমচন্দ্রের মাথা বাঁচিবে; পূর্ণচন্দ্রের নরক-ঘাঁটা ঘুচিবে, সাধও মিটিবে। বিলাতের এক মেম বিজ্ঞানের ক্ষোভ নিবারণ উদ্দেশে ব্যবচ্ছেদ জন্য নিজ মৃতদেহ উইল করিয়া যান; পূর্ণচন্দ্রের ক্ষোভ নিবারণ জন্য আমি এই আত্মচরিত দান করিলাম। উইল করা অপেক্ষা দান করায় মাহাত্ম্য অধিক।

তিন কারণের উল্লেখ করিলাম; আরও তেত্রিশ কোটি আছে, কিন্তু আমার বিচারে সেগুলির কথা তুলিবার দরকার নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মৃত্যুর পূর্ব্ববর্ত্তিকালের বিবরণ।

বৎসরের বারমাস ত্রিশদিনই কিছু আমার জন্ম-পরিগ্রহ হয় নাই; নির্দ্দিষ্ট মাস. বার. তারিখে আমি

ভূমিষ্ট হই। তৎপূর্ব্বে আমি আমার এই চক্ষুতে সংসার দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ফলত ইতিহাসের প্রথমাবস্থা এইরূপ তিমিরাচ্ছন্নই হইয়া থাকে। যাহা হউক সেই অবধি, নিয়তই আমার বয়োবৃদ্ধি হইতেছে; অধিক কি, সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মরূপে আমি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি যে, কাল-গণনায় গত কল্য আমার যত বয়ঃক্রম হইয়াছিল, অদ্য তাহা অপেক্ষাও বেশী।

কোন কোন দার্শনিকের মতে, কাল-সহকারে বয়সের বৃদ্ধি না হইয়া বরং ক্ষয় হয়। কিন্তু আমি এ মতের অনুমোদন করিনা; কারণ তাহা হইলে ক্রমে স্ত্রী বিধবা হইতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, দেখা যায় অনেকের স্ত্রী বিধবা হন না, তদ্ভিন্ন বিধবাবিবাহ যুক্তি এবং শাস্ত্র সম্মত বলিয়া মানিলেই স্ত্রীর সধবাত্বাৎ বয়ঃক্ষয়ের অপ্রমাণ সিদ্ধান্ত।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ধনসঞ্চয়ের মত মহাপাতক আর নাই; উপার্জ্জনশীলের হাতে পাছে টাকা কড়ি জমিয়া যায় এই আশঙ্কায় বারমাসে তের পর্ব্ব, পনর তিথিতে সাঁইত্রিশ ব্রত, সাত পুরুষের শ্রাদ্ধ, অপর পক্ষের তর্পণ, গয়ায় পিণ্ড প্রদান, বিশ্বেশ্বরের মন্দির দর্শন, পুরুষোত্তমে আট্‌কে বন্ধন, এবং অতিথিকে ইচ্ছা-ভোজন ও ভিক্ষুককে মুষ্টিভিক্ষাদানের ব্যবস্থাতে শাস্ত্র-কারগণ নিশ্চিন্ত হইতে না পারিয়া বিবাহ, সীমন্তো-ন্নয়ন, গর্ব্ভাধান, সাধ-ভক্ষণ, অন্নপ্রাশন, নামকরণ, চূড়া, কর্ণবেধ, উপনয়ন, দীক্ষা প্রভৃতি সাত শত তিরানব্বই

হাজার বারের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমার ও অন্নপ্রাশনাদি হইয়াছিল, এ কথা লিখিয়া এই জীবনী দীর্ঘাকৃতি করা অস্মদাদির অনুচিত।

যথাক্রমে আমি পাঠশালায় প্রেরিত হইলাম; শুভক্ষণে আমার হাতে খড়ি পড়িল। গুরু বিদ্যাবীজ-ভূমিতে অঙ্কিত করিলেন, আমি মৃত্তিকা খনন এবং হল-চালন অভ্যাস করিতে লাগিলাম। গুরুর পর গুরু গেল, ক—এর ত্রিসীমার পর আঁকড়ি পর্য্যন্ত আমার আদায় হইল। এইরূপে দিন দিন শশিকলার ন্যায় আমার বিদ্যার ষোড়শ বা চতুঃষষ্টিকলা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যাহাহউক ক্রমে ক্রমে আমি বিদ্যার পারে গেলাম। তখন আমার বয়ঃক্রম সপ্তদশ বৎসর মাত্র।

একবার মাত্র আমি পরীক্ষা দিয়াছিলাম, আমার বিদ্যাশিক্ষা এবং বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় তাহাতেই হইয়াছিল; অতএব সেই বিবরণ লিপিবদ্ধ হইতেছে।

গ্রামে একটী গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বঙ্গবিদ্যালয় হইয়াছিল; প্রথম প্রথম অনেকগুলি বালক পড়িতে যাইত। পণ্ডিত মহাশয়ের তাহাতে বড়ই প্রতাপ বৃদ্ধি হইল; পড়ো অপড়ো সব ছেলেকেই তিনি লাল-চক্ষু দেখাইতেন। আমি একাধিপত্যের বিরোধী, সুতরাং পণ্ডিতের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইলাম। তাঁহার প্রতাপ টুটিল, বালকেরা বিদ্যালয় যাওয়া বন্ধ করিল।

ইন্‌স্পেক্টার একদিন সংবাদ পাঠাইলেন যে পর

দিবস তিনি পরিদর্শনে আসিবেন। পণ্ডিত ব্যতিব্যস্ত, আসিয়া আমার খোষামোদ যুড়িলেন। সেই রাত্রিতে আমার যাত্রার দলের গান হইবে; আমি দূতী সাজিবার জন্য গোঁফ্ কামাইয়া প্রস্তুত; ছেলেরা বালক সাজিবে, গান মুখস্থ করিতেছে। শেষ পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে রফা হইল, তিনি ছেলেদের কিছু বলিবেন না, আমার যাত্রা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে, আর ইন্‌স্পেক্টার আসিলে আর কেহ যাউক না যাউক আমি গিয়া স্কুল এবং স্কুলের ইজ্জত বজায় করিয়া দিয়া আসিব।

পরদিন আমার মনোমত চারি পাঁচটী বালক সঙ্গে, আমি গিয়া উপস্থিত; গোঁফ্ ছিল না, আমিও বালক, তবে প্রধান বালক। ইঃ আসিলেন।

ইঃ। বালক সংখ্যা এত অল্প দেখিতেছি কেন?

পঃ। হুজুর, মেলেরিয়া।

ইঃ। পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। বুদ্ধিমান্ চেহারা দেখিয়া আমাকেই প্রথম ধরিলেন।

ইঃ। তোমার বয়স কত?

আমি। আজ্ আঁকের দিন নয়, ছিলট্ আনি নাই।

ইঃ। স্লেট কেন?

আমি। বয়সের হিসাব করিতে।

ইঃ। পণ্ডিত মহাশয়ের উপর সোৎসাহ দৃষ্টিপাত করিলেন; পুনরপি পরীক্ষা আরম্ভ—

ইঃ। তোমরা ভূগোল পড় ?

আমি। (মৃদুস্বরে) ভূও গোল করি।

ইঃ। পৃথিবীর আকার কেমন ?

আমি। দাঁড়িম্ব (↑) মত।

ইঃ। না, ঠিক্ দাড়িম্বের মত নয় ; তাহা অপেক্ষাও গোল।

আমি। সবই গোল।

ইঃ। তবে দাড়িম্বের মত বলিলে কেন ?

আমি। কৈ তা ত বলি নি।

ইঃ। তবে বল, পৃথিবী কিসের মত ?

আমি। আপনার মাথার মত।

ইন্‌স্পেক্টর চলিয়া গেলেন। সকলে আমার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিল। দিন কতক পরে সংবাদ আসিল, বিদ্যালয়ের সাহায্য বন্ধ, পণ্ডিত মহাশয়ের অন্ন বন্ধ। *

---

* প্রকৃত পক্ষে এ "আত্ম-চরিত" আমাদের নহে ; আমরা একবচন নহি। ইহার বিবরণও আমাদের জীবনের সহিত সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হইতে পারে না। তবে এই প্রবন্ধ ডাক্তার বানরজীর প্রেরিত বলিয়া অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া ইহা আমরা পত্রস্থ করিয়াছি। বঙ্গদেশে আজ কাল সকলেই লেখক, তথাপি একখানি পত্রও রীতিমত চলে না ; কারণ প্রবন্ধ পাওয়া দুষ্কর। সেই জন্য লেখক চটাইবার যো নাই। পঞ্চা-নন্দ।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস।

মনুষ্যবর্গ।

পুরাকালে পৃথিবীর সকল সভ্য দেশ হইতে এক এক জন প্রতিনিধি আসিয়া ব্রহ্মাবর্ত্তে বাস করেন; সুতরাং ভারতবর্ষ একরূপ আদিম পার্লিয়ামেণ্ট। কোন্ ঋষি কোন্ দেশ হইতে আসেন ও তাহার কি কি প্রমাণ আছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল ;—

১। বাল্মীকি—বাহ্লীকের প্রতিনিধি। ইনি মোগল বংশের আদিপুরুষ; রামচন্দ্র ইহারই বংশসম্ভূত। উদয়পুরের বর্ত্তমান রাণা এই মোগল বংশ উদ্ভূত; প্রমাণ—টডের রাজস্থান।

২। কশ্যপ—কাষ্পীয় জাতির প্রতিনিধি। কাষ্পীয়ান হ্রদ তাঁহারই নামে পরিচিত। এ বিষয়ের প্রচুর প্রমাণ ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে আছে।

৩। গর্গ—জর্জিয়ানা (Georgiana) দেশ হইতে আসেন। তিনিই প্রথমে ভারতবর্ষে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলিত করেন। প্রমাণ—মাণ্ডুক্য উপনিষদের গার্গী উপাখ্যান, এবং হিরডটসের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে—আলেক্জাণ্ডারের আক্রমণ বার্ত্তা। জর্জ শব্দ গর্গ হয়—বিকল্পে।

৪। ভরদ্বাজ—হিস্পানিওলার বারদোয়াজা (Vardwazza) হইতে আগমন করেন। ভরদ্বাজ বংশে বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান অতি মান্য। কিন্তু বিষ্ণুঠাকুর কোন আধুনিক ব্যক্তি নহেন; অর্থলোভী শঠ ঘটকগণ প্রগাঢ়

প্রত্নতত্ত্বের মর্ম্মভেদ করিতে না পারিয়া কতকগুলি কাল্পনিক কথা রচনা করিয়াছে মাত্র; কিন্তু এখন বিজ্ঞানের বিস্তার বৃদ্ধি সহকারে পুরাকালের বিঘোর কুজ্‌ঝটিকা বিদূরিত হইতেছে।—বিষ্ণুঠাকুর বলিয়া কোন ব্যক্তি ছিলেন না, ভরদ্বাজ ঋষি হিস্পানিওলা রাজ্যের, বারদোয়াজা প্রদেশের বিষ্টুকুটারী (Vistu-kutari or Biscutukari) নগর হইতে আসেন, সুতরাং তাঁহাকে ভরদ্বাজ এবং বিষ্ণুঠাকুর দুই নামই দেওয়া হইয়াছে। প্রমাণ—এখন সন্তোষকর পাওয়া যায় নাই; আমরা অনেকগুলি পুরাণ আটলাস আনাইয়া আজি কয় বৎসর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতেছি, কোথাও বারদোয়াজা বা বিষ্ণুকুটারীর চিহ্ন দেখিতে পাই নাই; কিন্তু ভরদ্বাজ গোত্রজ মুখুটি বংশ যে স্পেন সম্ভূত, তাহা প্রমাণ না থাকিলেও নিশ্চয়; কেন না ফুলের মুখুটি অর্থাৎ Chef-del-floro—এরূপ উপাধি স্পেন ভিন্ন কোথায় থাকা সম্ভব? আর, অনেক মুখটি বিস্কুট বিক্রয় করে।

৫। গালব—প্রাচীন গাল (Gaul) রাজ্য হইতে আসেন। গালজাতীয়েরাই বর্ত্তমান ফরাসি জাতি; ইহারা অতি প্রাচীনকাল হইতে চিকিৎসা বিদ্যায় নিপুণ (Galen)। গালব মুনির ক্ষেত্রজ সন্তান বৈদ্য-বংশের আদিপুরুষ। প্রমাণ,—অম্বষ্ঠ্য সম্পাদিকা।

[মন্তব্য।—ধন্বন্তরিও ঐ গাল দেশজ।—কিন্তু ধন্বন্তরি একজন লোক নহেন। মুসেডুম (M. Dumas)

এবং মুসে দান্তেরি (M. Danteris)—এই দুই নাম কোন কারণে যুক্ত হইয়া ধন্বন্তরি নাম সৃষ্ট হইয়াছে।

৬। ঋষ্যশৃঙ্গ—সালোনিকা দেশের প্রতিনিধি। এটি বুঝিতে হইলে ভাষাবিজ্ঞানের কয়েকটি নিয়ম জানা কর্ত্তব্য। সালোনি শব্দে স্বার্থে 'ক' করিলে সালোনিক। সালনি—ক্রমে, সারণি—পরে হারণি এবং হারিণ হয়। হারিণি—হরিণের অপত্য, ঋষ্যশৃঙ্গ। ল স্থানে র এবং স স্থানে হ হওয়া ভাষা বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ; অতএব ইহার প্রমাণ দিবার প্রয়োজন নাই।

প্রাচীন বাণিজ্য।

বৃক্ষ বর্গ।

এখনকার ভারত, আর তখনকার ভারত! মনে করিলেই দীর্ঘ নিশ্বাস না ফেলে এমন একটি বীরও জুওলজিকাল গার্ডেনে নাই। এখন যে ভারত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পাইতেছে না, সে কেবল সেই প্রাচীন দুঃখের স্মৃতি জন্য। নিয়ত অশ্রুপাতে সেই উন্নতি-পথ এখন কর্দ্দমময় হইয়াছে; এ কাদা চহলায় বাটীর বাহির হওয়া দায়, সুতরাং ভারত কেমন করিয়া অগ্রসর হইবে? যখন বড় বড় পোতাধ্যক্ষ পত পত শব্দে নীল পতাকা, শ্বেত পতাকা, কৃষ্ণ-পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশ দেশান্তরে

বাণিজ্যার্থ গমন করিত, তখনকার ভারতের শোভাই কত! কিন্তু ভবভূতি এই বাণিজ্যের হ্রাস দেখিয়া যখন দুঃখ করিলেন ;—

"তেহি নো দিবসা গতাঃ"

তাহার পূর্ব্ব হইতেই ভারতের গৌরব লুপ্তপ্রায়। তখনকার প্রসিদ্ধ সওদাগর আম্রবণিক হনুমন্তের নাম মাত্র অবশিষ্ট।

ফলতঃ আর আমাদের দুঃখের নিশা থাকিবে না।

"স্বল্পা তিষ্ঠতি শর্ব্বরী।"

এখন প্রাচীন তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতবর্গ আমাদের শোকশেল উৎপাটনে ব্রতী হইয়াছেন ; বরাহের ন্যায় ইহাঁরা বেদোদ্ধারে কৃতসংকল্প হইয়া লেখনী-দন্তে পূর্ব্ব গৌরব অনেকটা চাগাইয়া তুলিয়াছেন। আমরা প্রস্তাব বাহুল্য না করিয়া তাঁহাদের পরিশ্রমের ফল সংগ্রহ করিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

পণ্ডিতবর্গ সপ্রমাণ করিয়াছেন যে ;—

১। ভারতের বাণিজ্য কাল্ডিয়া (Chaldea) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; প্রমাণ আজিও আমরা চাল্‌দা ফল (সংস্কৃত চালিদহ) খাইতে পাই।

২। যবদ্বীপে যবের ছাতু।

৩। বাটাবিয়াতে—বাতাবী লেবু (সংস্কৃত বাতাপীর।)

৪। মার্টাবানে—মর্ত্তমান রম্ভা।

৫। ফ্রান্সে—ধুচুনি (ফরাসি Dejeuner শব্দ হইতে)

৬। স্কটলণ্ডে—কুমড়া (Cameronদের বাগান হইতে (Job Charnock) আনয়ন করেন) হাইলণ্ডারেরা খুব কুমড়া খাইতে ভাল বাসে। প্লিনীর (Pliny) এই মত। ষ্ট্রাবো (Strabo) বলেন, কুষ্মাণ্ড—কাম্‌ৎশ্চট্‌কা (Kamatschatka) হইতে আনীত।

৭। গর্ণসীতে (Guernsey)—গাঁজা।

৮। সোগদানা (Sogdana) প্রাচীন পারস্য—সজিনা গাছ।

৯। লুচুদ্বীপে—লিচু-ফল।

১০। জামেকা (Jamaica)—জাম। স্বার্থে-ক।

শ্রীহনুমান বীর।

বঙ্গীয় ভারত-হিতৈষীর প্রতিজ্ঞা পত্র।

১ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, আমি বঙ্গদেশ-বাসী।

২ দফা। প্রাণ, দেহ এবং সুখ্যাতি অপেক্ষা অত্যল্প কম মাত্রায় ভারতবর্ষকে এবং তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম পরিমাণে বঙ্গ দেশকে আমি ভাল বাসি।

৩ দফা। আমি ভারতবর্ষের উপকারার্থে মন এবং মুখ উৎসর্গ করিতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি।

৪ দফা। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে বাঙ্গালা লিখিব না ও বাঙ্গালা পড়িব না।

৫ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, ইংরেজীতে নাই

এমন কথাই নাই; যদি কিছু থাকে, তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি না, মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করি।

৬ দফা। ইংরেজী প্রণালীতে সভা করা, সভার কার্য্যবিবরণ রীতিমত ইংরেজীতে লিখিয়া রাখা, ইংরেজীতে বক্তৃতা করা এবং ইংরেজীতে আবেদন-পত্র লেখা—এই কয়েক বস্তুর অভাব প্রযুক্তই ভারত-বর্ষের বর্ত্তমান হীনাবস্থা, অন্য কারণ বশতঃ নহে, ইহা আমি বিশ্বাস করি।

৭ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে চল্লিশ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়সের ভারতবাসী নাই।

৮ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, ভারতবর্ষে স্ত্রী-লোক নাই, চাষী প্রজা নাই, পল্লীগ্রাম নাই, গোঁড়া হিন্দু নাই, এবং বুদ্ধিমান লোক নাই।

৯ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, যে হেতু অগ্নি সংযোগ করিলে খড় জ্বলে, সেই হেতু অগ্নিসংযোগ করিলে জলও জ্বলিবে।

১০ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, কথা কহিবার সময়ে নাড়িবার জন্য এবং আহার করিবার সময়ে সহায়তা করিবার জন্যই হস্তের সৃষ্টি, ইহা ভিন্ন হস্তে অন্য প্রয়োজন নাই।

১১ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, আপনার ভার আপনি বহন করিবার চেষ্টা করা মহা পাপ, এবং সে চেষ্টার নাম স্বাধীনতা নহে।

১২ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, বোম্বাইবাসী

অপেক্ষা ভাল ইংরেজী লিখিতে পারাই চরম বীরত্ব, এবং তাহাতেই ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করিতেছ।

১৩ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে গায়ে মশা বসিলে রাজার উচিত যে মশা তাড়াইয়া দেন, না দিলে রাজা অধার্ম্মিক। নিজে মশা তাড়ান মহাপাপ। রাজা যদি আমার প্রার্থনা মতে মশা তাড়াইবার লোক নিযুক্ত করেন, করিয়া তাহার ব্যয় আমার ঘাড়ে চাপাইয়া দেন, তবে রাজার অন্যায়, এবং দিবারাত্রি সে জন্য আমার চীৎকার করা উচিত।

১৪ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে কাগজ, কলম, কালী আর ছাপার খরচ অপব্যয় নহে! *

১৫ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে রাজনীতি ভারতবাসীর একমাত্র আলোচনীয় পদার্থ, যে ব্যক্তি অন্য কথায় লিপ্ত থাকে, অন্য কথা তোলে সে আততায়ী।

১৬ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে রাজনীতির অর্থ রাজাকে গালাগালি দেওয়া।

১৭ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে সভ্যতা, ভব্যতা, কর্ম্মশীলতা, কার্য্যদক্ষতা, বিদ্যা, বুদ্ধি, এ সমস্তই পোষাকের গুণে; জর্ম্মণীর লোককে সাঁও-তালের বেশ দিলে, তাহারা ঠিক সাঁওতাল, এবং

* নহিলে পঞ্চানন্দ বাহির হইত না ;—না ?

শ্রীছাপাওয়ালা।

বানরকে ইংরেজের সাজ পরাইলে বানর ঠিক ইংরেজ হইবে, ইহা আমি বিশ্বাস করি।

১৮ দফা। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আদার দর কত, সে অনুসন্ধান কখনই করিব না; জাহাজের সমস্ত খবর রীতিমত রাখিব।

১৯ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, বহু পরিশ্রমে অল্প উপার্জ্জন করা অপেক্ষা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করা ভাল।

২০ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে শিখিবার কিছুই নাই, শিখাইবার সমস্তই আছে।

২১ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে রাত্রিকালে সূর্য্যালোক থাকে না, অতএব প্রদীপ জ্বালা অন্যায়।

২২ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, যে ব্যক্তি আমার মতের পোষকতা করে না, সে মূর্খ; যে প্রতি-বাদ করে, সে কৃতঘ্ন; যে বিরুদ্ধাচরণ করে সে আততায়ী।

২৩ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে ভারতবর্ষে জাতিভেদ নাই, মত ভেদ নাই, ভাষা ভেদ নাই এবং স্বার্থভেদ নাই।

২৪ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে শরীরের মধ্যে মস্তকই প্রয়োজনীয় অঙ্গ, অবশিষ্টাংশ অকর্ম্মণ্য ভারমাত্র।

২৫ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে বনমানুষ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জীব, এবং আমার ধর্ম্মপত্নীর বিবাহ হইয়াছে।

[আমরা ধন্যবাদ সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত ভারতহিতৈষী-সম্প্রদায়ের সূচনাপত্র এবং নিয়মাবলীর একখণ্ড পাইয়া আমরা অনুগৃহীত হইয়াছি। যাঁহারা সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে উপরি উদ্ধৃত প্রতিজ্ঞাপত্রে প্রকাশ্য সভায় স্বাক্ষর করিতে হয়। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই সম্প্রদায়ের উন্নতি কামনা করি। বারান্তরে এ সম্বন্ধে বিস্তারিতরূপে আমরা মত প্রকাশ করিব।—শ্রীপঞ্চানন্দ।]

পঞ্চানন্দের বক্তৃতা।

১।—বক্তৃতার হেতুবাদ।

শ্রীযুক্ত মিষ্টর্ লালমোহন বাবু বিলাত গিয়া ভারি এক তরঙ্গ তুলিয়া আসিয়াছেন। অনেকের বিশ্বাস হইয়াছে যে, আজি হউক, কালি হউক, আর দশ দিন পরেই হউক, ভারতবর্ষের বিলক্ষণ একটা উপকার না হইয়া যায় না। আপাততঃ বিলাতী বক্তৃতাতে ভারতবর্ষের নাম খুব বেশি বেশি হইতেছে, ইহাহ এক উপকার।

ভারতবর্ষের কথা লইয়া একটা আন্দোলন হইলে, সৌভাগ্য বলিতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। "ভারতবর্ষের জন্য ইংলণ্ড কি করিয়াছেন," এই কথাকে ধুয়া ধরিয়া হণ্টার্ সাহেব খুব বকাবকি করি-

য়াছেন; ইহার উত্তোর দিবার জন্য আর এক সাহেব —"ভারবর্ষের ঘাড়ে ইংলণ্ড কি চাপাইয়াছেন" এই প্রসঙ্গ করিয়া অনেক লেখা লেখি করিয়াছেন। ইহাই ত যথেষ্ট সৌভাগ্য বলা যাইতে পারে; কিন্তু যখন কপাল ফলে, তখন জলে প্রদীপ জ্বলে—সৌভাগ্যের শেষ ঐ খানেই না হইয়া পঞ্চানন্দের ঘাড়েও বক্তৃতার ভূত চাপিয়াছে। সেই জন্য সকল বক্তৃতার সার যে বক্তৃতা, তাহার সার নিম্নে সুবিন্যস্ত হইতেছে।—

ভারতের জন্য ইংলণ্ড কি করিয়াছেন? কি করিয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য, কেন না, বলা নিষ্প্রয়োজন। দেখিয়া হউক, ঠেকিয়া হউক, অন্যের নিকট শিখিয়াই বা হউক, কি করিয়াছেন, তাহা সকলেই টের পাইতেছেন, কিম্বা পাইয়াছেন। তবে এ প্রশ্ন কেন? ঊনবিংশ শতাব্দীর আচঁলা ভাগে, বর্ত্তমান কালের এই পুচ্ছাংশে তবে এ প্রশ্ন কেন?—বক্তৃতা করিতে হইবে, সেই জন্য। সূর্য্যের অধোদেশে সকলই পুরাতন, কিছুই নূতন নাই। ইহা পুরাতন প্রবাদ, যেহেতু কিছুই নূতন নাই। তথাপি সেই পুরাতনকে ভাঙ্‌চুর করিয়া, আবার গড়িয়া পিটিয়া, মাজিয়া ঘসিয়া, নূতনের মূর্ত্তি দিবার জন্য সমগ্র সংসার মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতেছে। সকলেই যাহা দেখিতেছে, সকলেই যাহা শুনিতেছে, সকলেই যাহা জানিতেছে, তাহাই দেখাইবার জন্য, তাহাই শুনাইবার জন্য, তাহাই জানাইবার জন্য বক্তৃতা করিতে হয়। অত-

এব—ভারতের জন্য ইংলণ্ড কি করিয়াছেন ?—এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হয় ; আপনা আপনি জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর স্বরূপ একটা বক্তৃতাও করিতে হয়। বক্তৃতাই সমাজের জীবনী-শক্তি।

বক্তৃতা যে অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা প্রতিপন্ন করা গেল। কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে কয়জন লোক কাজ করিতে প্রস্তুত হয় ? আমি দেখাইব যে, বক্তৃতা যেমন কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তেমনি লাভজনকও বটে।

মনের কথা যে খুলিয়া বলে, সে যে পাগল ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। পক্ষান্তরে মনের ভাব গোপন করিবার জন্য ভাষার সৃষ্টি, ইহাও পণ্ডিতের কথা। অতএব বুঝিয়া কথা কহিতে পারিলে অর্থাৎ যেখানে উৎপীড়ন নাই, সেখানে সত্য কথাটা না বলিয়া অন্য কিছু বলিলেই, দুই দিক রক্ষা করা হয়,—সাপ মরে, অথচ লাঠি খানি ভাঙ্গে না— নাম হয়, অথচ মিথ্যাবাদী বলিয়া বদ নাম হয় না। কে বলিবে বক্তৃতা লাভ-জনক নয় ? যে বাঙ্গালী, ইংরেজীভাষায় বক্তৃতা করে, অথচ “দেশের হিতের জন্য আমার জীবন ধারণ,” কথায় বা ব্যবহারে এই ভাব প্রকাশ করে, সেই প্রকৃত সারগ্রাহী ব্যক্তি ;—দুর্লভ মানব জন্মে, তাহার ন্যায় মানব ততোধিক সুদুর্লভ। যাহাকে বলিতেছি, সে আমার মনের ভাব জানিতে পারিল না; যাহার হইয়া বলিতেছি, সে আমার কথার বিন্দুবিসর্গ বুঝিতে পারিল না— বক্তৃতার ইহা অপেক্ষা বেশী

বুজরুকী আর কি হইতে পারে বলো? এ প্রকার বক্তা অপেক্ষা অধিকতর মর্ম্মজ্ঞ লোক কোথায় পাইবে, বলো?

অতএব হে মহিলাকুল এবং ভদ্রগণ! আমি বক্তৃতা করিতেছি। ইংরেজী ভাষা আর গোমাংস, দুই আমার উদরে আছেন; কিন্তু হিন্দুর ছেলে, হিন্দু সমাজে চলা ফেরা করি; দুই চাপিয়া রাখিতে হইবে। সেই জন্য ইংরেজীতে না হইয়া বাঙ্গালায় আমার বক্তৃতা। দোষ গ্রহণ করিবেন না, মার্জ্জনী ধরিবেন না, মার্জ্জনা করিবেন।

২।—ভারতের জন্য ইংলণ্ড কি করিয়াছেন?

ইহা অতি অন্যায় প্রশ্ন। হণ্টার্ সাহেব পছন্দ করিয়া প্রসঙ্গের এরূপ নামকরণ করায় তাঁহার রাজভক্তির অভাব অনুমান করা যাইতে পারে; তিনি যদি সাহেব না হইতেন, উপরন্তু যদি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিমক না খাইয়া থাকিতেন, এবং আরও নিমকের প্রত্যাশা না রাখিতেন, তাহা হইলে, তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেও অপরাধ হইত না, তাঁহার প্লীহা ফাটাইয়া দিলেও বিধিমতে কেহ দণ্ডার্হ হইত না। কারণ এরূপ প্রশ্নের ভঙ্গীতে ইংলণ্ড যেন ভারতের কিছু করিতে বাকি রাখিয়াছেন, এমন সংশয় স্বভাবতই হইতে পারে। বস্তুত ইংলণ্ড কি না করিয়াছেন, এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া নুনের গুণ দেখান হণ্টার সাহেবের উচিত ছিল। ভরসা যে, তাঁহার

উদ্দেশ্য তাহাই ছিল, ভাষার বাঁধুনিটা কম বলিয়াই একটা বেফাস কথা তিনি বলিয়া ফেলিয়াছেন।

ভারতের জন্য ইংলণ্ড না করিয়াছেন কি? কৃতঘ্ন ভারতবাসী ভিন্ন এমন প্রাণী কে আছে যে, ইংলণ্ডের কার্ত্তিকলাপ দেখিয়াও ইংলণ্ডের ভারত-কার্ত্তির প্রমাণ চাহিতে সাহস পায়? ধরিয়া যাও, গণনায় তোমার অঙ্গুলী ফুরাইয়া যাইবে; তথাপি ইংলণ্ডের কীর্ত্তি সংখ্যার কিছুই হইবে না। তথাপি ইংলণ্ডের আত্ম-ত্যাগ, ইংলণ্ডের উপচিকীর্ষা; ইংলণ্ডের ভালবাসা, ইংলণ্ডের ধর্ম্মজ্ঞানের ভারতে যে পরিচয় আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ করিব। নতুবা পাপিষ্ঠ ভারতবাসীর চৈতন্য সঞ্চার, জ্ঞানোদয় কিছুতেই হইতেছে না।

ইংলণ্ডের জন্য ইংলণ্ডে বসিয়া ইংলণ্ড কি করিয়াছেন, কিছু করিয়াছেন কি না, ভগবান জানেন; যে সমুদ্র ডিঙ্গাইতে পারে, সেই সে কথা বলিতে পারে; কিন্তু আমি পৈতাধারী ব্রাহ্মণতনয়, বাস্তুভিটার চৌহদ্দীর ভিতরে থাকিয়া যাহা দেখিয়াছি তাহাই বলিব, আর নিজে যাহা দেখি নাই, তাহার বিষয় বলিতে হইলে, ইংলণ্ডের নিজ মুখে যে কথা শুনি নাই, তাহা বলিব না; পাছে সত্যের অপলাপ হয়, সেই জন্য বলিব না। যাহারা মনে করে, সুখ্যাতির কথা আরোপ করিয়া বলিলে দোষ নাই, তাহারা চাটুকার, তাহারা ভ্রান্ত, তাহারা উচ্ছন্নে যাউক।

তবে দেখ, ভারতের জন্য ইংলণ্ড কি করিয়াছেন;

কি সহিয়াছেন? সুসভ্য, শাস্ত্র-বিশারদ, ধর্ম্মষণ্ড, ইংলণ্ড ভারতের উপকার করিবেন বলিয়া, সেই উপকার করিবার উপায় বিধান উদ্দেশে আত্মাবমাননা স্বীকার করিয়া বেণের পুঁটলী লইয়া, বৈদ্যের থলীবড়া লইয়া ভারতের সহিত প্রথম পরিচয় করেন। উপকার করিবেন বলিয়া কত—কত—কত-বড় বিস্তীর্ণ সাগর পারে আসিতে কিছু মাত্র সংকোচ করেন নাই। বলো ত, কৃতঘ্ন পামর, এ কলিকালে কয়জন ইহা করিয়া থাকে? হনুমান সাগর লঙ্ঘন করিয়াছিল, সত্য, হনুমান বিশল্যকরণী প্রয়োগ করিয়াছিল, সত্য; হনুমান মৃত্যুশর আনয়নার্থ দৈবজ্ঞ সাজিয়াছিল, সত্য।—কিন্তু যদি বুদ্ধি থাকে, তুলনা করিয়া দেখো, ইংলণ্ড রূপ হনুমানের সমীপে তোমার হনুমান কলিকাও পাইতে পারিবে না। তথাপি, তোমার হনুমানের স্বার্থ ছিল, দৈববল ছিল, তদ্‌ভিন্ন, সে ত্রেতাযুগের লোক, তখন অধার্ম্মিকের সংখ্যা এত অধিক ছিল না।—অহঙ্কারের সহিত বলিতেছি—যাহার সাধ্য থাকে আমার সন্তান তুলুক।—আমার হনুমানের তুলনায় তোমাদের হনুমান মাছী হইতে ক্ষুদ্র, মশা হইতে দুর্ব্বল, তেলাপোকা হইতে নির্ব্বোধ, কেন্নু হইতে ঘৃণ্য। যদি লজ্জা থাকে, ও তুলনা আর তুলিও না।

আবার দেখো, ক্লাইব, অসমসাহসী, রণপণ্ডিত, অমিততেজা, খ্রীষ্টধর্ম্মে-নাকানিচুবানি ইংলণ্ডের সন্তান।

শুদ্ধ তোমাদের উপকার, ভারতের হিত, বঙ্গের উন্নতির জন্য ইহকালকে ভ্রূকুটী করিয়া, পরকালের প্রতি অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া, আত্মাকে শয়তানের জিম্মায় রাখিয়া, জাল, মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা—কি না করিলেন, মানুষ হইয়া মানুষের জন্য কয়জন এতদূর আত্মবিসর্জ্জন দেখাইতে পারে?

ইংলণ্ড জানেন যে, জালসাজী বড় পাপের কর্ম্ম; ইংলণ্ড জানেন যে, পাপীর দণ্ড বিধান না করিলে পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হয়; ইংলণ্ড জানেন যে, ভারতের উপকার করিতে হইলে ভারতের ভ্রান্ত সন্তানকে সৎপথ দেখাইতে হইবে। জানেন বলিয়া, ভারত-বর্ষকে সুদৃষ্টান্ত দেখাইয়া গ্লানি স্বীকার করিতে হইলেও, নন্দকুমারকে ইংলণ্ড ফাঁসি দিতে ইতস্তত করিলেন না; দুর্ব্বৃত্ত নন্দকুমারের দুর্গতিতে পাপীর হৃদয় কম্পিত হইল, ধর্ম্মান্ধ ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের কৃপায় শিখিয়া লইল। এত ত্যাগ স্বীকার, এত ধর্ম্মো-পদেশ দিতে আগ্রহ যাঁহার আছে, কোন্ লজ্জায় জিজ্ঞাসা করিয়া থাকো, যে, এ হেন ইংলণ্ড ভারতের জন্য কি করিয়াছেন?

তুমি বলিতে পারো,—এ সকল গৌরবের কথা বটে, তাহা স্বীকার করি, কিন্তু বড় প্রাচীন কথা এ কথার বলে সংপ্রতি সুখ্যাতির দাবি করা চলে না, দাবিতে তামাদী দোষ ঘটিয়াছে।—মঞ্জুর! আর পুরাতন কথা বলিব না, হালের অবস্থা, হালের ব্যবস্থা,

দেখাইয়াই তোমার চক্ষে জলধারা প্রবাহিত করিতে পারি কি না, তাহা দেখো! ভক্তি তোমার অন্তরে আছে তাহা জানি; আমি বক্তৃতা করিলে, সত্যের আবৃত্তি করিলে, তোমার প্রেমাশ্রু পড়িবেই পড়িবে।—

"বাহিরায় নদী যবে পর্ব্বত উদ্দেশে,
কার সাধ্য রোধে তার গতি!"—

ভারতবর্ষ পূর্ব্ব পূর্ব্বকালে নিতান্ত অসভ্য ছিল, এ কথায় যে বিশ্বাস করে না, সে ইংরাজী ইতিহাস পড়ে নাই। ইংলণ্ড তাহাকে সভ্য করিয়াছেন, ইহাও নিঃসংশয়। এমন স্বতঃসিদ্ধ কথার সবিস্তার উল্লেখ অনাবশ্যক হইলেও আমাকে উল্লেখ করিতে হইবে। তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে, ইংলণ্ড কি করিয়াছেন।

এই যে জ্যৈষ্ঠ মাসের আমকাঠাল পাকানে গরমে তোমরা কাহাকেও আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত না দেখিলে অসভ্য বলিয়া থাকো, সে কাহার প্রসাদাৎ? এই যে কোচ কেদারা, কাচের বাসন, আর্শী ফেরেমের অভাব হইলে তোমার ঘরের শোভা হয় না বলিয়া দুঃখ করিয়া থাকো, এ শিক্ষা কাহার নিকট পাইয়াছ? এই যে তোমার ভাষা তোমার দেশের চাষায় বুঝিতে পারে না, তুমি যে গুণে দেশের সাড়ে পোনের আনা লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে পারো না, তাহাদের সংসর্গ ঘৃণাজনক মনে করো, এ গুণ কোথায় পাইলে? এই যে, পিতৃপুরুষের ধর্ম্ম কি তাহা না জানিয়াও তুমি

বিসর্জ্জন করিতে পারিয়াছ, মুষ্টিভিক্ষা উঠাইয়া দিয়া পশুশালায় চাঁদা দিতে অভ্যাস করিয়াছ, এই যে কোলাকুলি তুলিয়া দিয়া হাত ধরাধরি করিয়া সম্ভাষণের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে শিখিয়াছ,—এ বিদ্যা কে তোমাকে দান করিয়াছে? একটু ভাবিয়া দেখো, বুঝিতে পারিবে, ইংলণ্ড তোমাদের জন্য কি করিয়াছেন?

ভারতবর্ষকে ইংলণ্ড ধনশালী করিয়াছেন। আসাণ্টিতে যুদ্ধ হয় ভারতবর্ষ টাকা দেয়; পারস্যের রাজা চীন দেশে বেড়াইতে যান, ভারতবর্ষ টাকা দেয়; বিলাতের লোক বিলাতে বসিয়া চাকরী করে, ভারতবর্ষ তাহাদের মাহিনার টাকা দেয়, ইংলণ্ড ভারতের ধর্ম্মের হস্তক্ষেপ করেন না, সে কৃতজ্ঞতায় খ্রীষ্টধর্ম্মের পাদরীদিগকে ভারতবর্ষ টাকা দেয়, ভারতরক্ষার জন্য ইংলণ্ডে সৈন্য থাকে, ভারতবর্ষ টাকা দেয়; লাঙ্কাশিয়ারে দুর্ভিক্ষ হয় ভারতবর্ষ টাকা দেয়; অধিক কি, এই যে প্রায় বর্ষে বর্ষে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ হইতেছে, তাহাতে প্রতীকারের জন্যও ভারতবর্ষ অগ্রিম টাকা দিয়া রাখে; ভারতবর্ষের মত কোন্ দেশ ধনশালী? টাকা অনেকেই দিতে পারে, অথচ তাহারা কষ্ট পাইয়া দেয়; তাহা হইলে তাহাদিগকে ধনবন্ত বলা যায় না। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে সে কথাও বলিবার যো নাই। দোতালার গাঁথনি হইতেছে, নিচের তলা কাটিতে আরম্ভ করিল, এতই টাকা যে ভারতের

তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। ইন্দ্রালয় সদৃশ নূতন অট্টালিকা হইল, ঘর বড় সোঁতা; আচ্ছা, ভাঙ্গিয়া ফেলো; ভারত টাকায় কাতর নহে, ঘর বড় গরম; উত্তম কথা, নূতন ঘর করো, টাকার কমি নাই; কলিকাতায় অনেক লোকের বাস, অনেক গোলমাল, রাজকার্য্য এখানে সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করা কষ্টকর, বেস্, সবল বাহনে সিমলা যাও, পথ খরচ, খাই খরচ, খোশ খরচ কিছুরই অভাব নাই, টাকা দিতে ভারতের মুখ ম্লান হয় না। এমন ধনবান করিয়া দেওয়া সহজ কাজ নয়; তোমরা কি বলো, ইংলণ্ড এ কাজ করেন নাই?

পূর্ব্বে ভারতবর্ষ অরাজক ছিল, ভারত রাজা জানিত না, রাজ্য জানিত না, ভারতবাসী জন্মিত, খাইত, ঘুমাইত, আর বংশ রাখিয়া মরিত। এখন সে দুর্দ্দশা নাই; ভারতবাসী রাজনীতি জানে, সমাজনীতি বোঝে, ধর্ম্মনীতির বিচার করে, অথচ রাজ্যের চিন্তা তাহাকে করিতে হয় না, ইংলণ্ড স্বয়ং ভারতের হইয়া সেটা করিয়া লন; সমাজের জন্য তাহাকে ভাবিতে হয় না, ভগবান এক প্রকার চালাইয়া লন, আর ধর্ম্মের ভার লইতে হয় না, খোলা হাওয়ায়, খোলা প্রাণে দুইটা উচ্চ বাচ্য করো উত্তম, না করো, নাই। এ সুখের কর্ত্তা—ইংলণ্ড।

অশান্ত অসভ্য ভারতবর্ষে পূর্ব্বে শান্তি ছিল না, কেবল উপদ্রব ছিল; সেই জন্য বাণিজ্য ছিল না, সেই জন্য বাদসা স্বয়ং তাজমহল গাঁথিতেন; আর

বেগম রেজার কাজ করিতেন। এখন ছড়ি হাতে বেড়াইতে যাও, শ্রীঘর না দেখিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতে পাইবে না। বাণিজ্যের এমনই প্রখর স্রোত, যে, তাতিকুল একেবারে ভাসিয়া গেল। শিল্পের এমনই উন্নতি যে, সুদৃশ্য হর্ম্মো পাছে কেহ শঙ্কা ক্রমে প্রবেশ না করে, এই আশঙ্কায় হর্ম্ম্যগণ স্বীয় বক্ষ বিদার্ণ করিয়া, বাহির হইতে অভ্যন্তর দেখাইয়া থাকে। ইংলণ্ডে এরূপ উন্নতি হইয়াছে কি না জানি না; কিন্তু ভারত-বর্ষের জন্য ইংলণ্ড ইহা করিয়াছেন।

অনন্ত কথা বলিতে গেলে অনন্ত কালও ফুরাইয়া যাইবে; সুতরাং আর কত বলিব? তথাপি দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতবাসী রাজভক্তিহীন। স্বয়ং রাজ-পুরুষ ইংরেজ মহাপুরুষ এ কথা যখন তখন বলিয়া থাকেন, সুতরাং কথাট মিথ্যা হওয়া অসম্ভব, তোমরা ইংলণ্ডের আধিপত্য চিরস্থায়িত্ব কামনা করিয়া থাকো, সে বিষয় কাহারও সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা বলিয়া তোমাদের এই নিশ্বাসের পর নিশ্বাস কে সহ্য করিতে পারে? ইংলণ্ডকে তোমরা ভালো বাসো ভক্তি করো তাহাতে সব মহাপুরুষের ত কুলায় না। হুগলার জজ্ গ্রাণ্ট্ সাহেব মসলমান পেয়াদাকে দিয়া সাক্ষীর শ্রেণীতে দণ্ডায়মানা ব্রাহ্মণ কন্যার ঘোমটা জোর করিয়া খোলাইয়া দিয়া অত্যাচার করিয়াছেন; মান্দ্রাজে মাল্ট্বী সাহেব একজন মুন্সেফকে গুলি করিয়া ক্ষেপা সাজিয়াছেন—এ সব কথা তোমরা

কেন বলো ? অমুক আইনে অনিষ্ট হইবে, —অমুক টেক্‌স বসিলে উৎপীড়ন হইবে,—এ উৎপাতে তোমাদের কাজ কি ? রাজার ঘরে টাকা গেল, তাহার পর লুণের কড়ি তেলে খরচ হইল, কি হিন্দুস্থানীকে বাঁচাইবার টাকা দিয়া আফগানস্থানার মুণ্ডুপাত করা হইল—তাহাতে তোমাদের বলিবার অধিকার কি ? ইংলণ্ড যদি চাও, তবে কটা কুকুরে কামড়াইলেও তোমরা কাঁদিতে পাইবে না —ইহা রাজনীতির ভক্তি অধ্যায়ের প্রথম পাঠ, অবোধ শিশু তোমরা এ কথা কবে শিখিবে ?

সুখের বিষয় এই যে শিক্ষাদানে ইংলণ্ড এত অকাতর যে, রাজভক্তি শিখাইবার ব্যবস্থাও করিতে ক্রুটি করেন নাই ; সে ব্যবস্থার নাম মুদ্রণ-শাসনা ব্যবস্থা ওরফে ন আইন।

পঞ্চানন্দ শপথ করিতেছে তিনি রাজভক্তির মধুশূন্য অর্থাৎ মোম ; মধু নাই সে কপালের দোষ।

খাও পরো টেক্‌স দাও
গৌর প্রেমে মত্ত হও
রাজনীতি, রাজনতি গৌর রূপে কর মতি
গৌর করিবেন গতি, চরণে শরণ নাও।
পঞ্চানন্দ এই মন্ত্রের উপাসক,

আইন-স্তোত্র।

হে ৯ ন আইন! তুমি বাঙ্গালা লেখার গুরুমহাশয়, বেত্র হস্তে পাঠশালার সকল ছাত্রকে সর্ব্বদা শাসাইতেছ; তুমি ইচ্ছা করিলে আমাদের পৃষ্ঠদেশের ছিল্‌কা ছাড়াইতে পারো। তুমি ইঙ্গিত করিলেই আমাদের পাততাড়ি গুটাইতে হয়। অতএব তোমাকে গড় করি।

হে ৫ পাঁচ আইন। তুমি আমাদের ভূস্বামী রাজা, কারণ তোমার এলাকায় বাস করি। তুমি ইচ্ছা করিলে আমাদের ভিটায় ঘুঘু চরাইতে পারো, আমাদিগকে গঙ্গা পার করিয়া দিতে পারো; আমাদের পদস্খলনও হইতে পারে। বিচিত্র নহে, পাহারাওয়ালা দেখিলে তোমার পাহারাওয়ালাদের বড় প্রতাপ বৃদ্ধি হয়,—সেই জন্য তোমাকে বড় ভয়। অতএব তোমাকে গড় করি।

হে ৯+৫ ন পাঁচ চৌদ্দ আইন! আমরা তোমার ধার ধারি না—কেহই নহি, সত্য, কিন্তু আমাদের অনেক মুরুব্বীর মুরুব্বী তুমি মুরুব্বী। তুমি ইষ্ট করিতে পারো, সুতরাং অনিষ্টও করিতে পারো। অতএব তোমাকেও গড় করি।

হে ৯×৫ নয় পাঁচ পঁয়তাল্লিশ আইন! তোমার অপার মহিমা, অপরিমেয় শক্তি। যে কথা কহে, হাসে, হাঁচে, নিশ্বাস ফেলে, বিচরণ করে, চরিয়া বেড়ায়, সেই তোমার আবদ্ধ এবং অধীন। তোমার

গুণগান করিতে হইলে রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইবে। তুমি নিত্য, তুমি সৎ, তোমার কথা কি বলিব? তোমাকে গড় ত করিই; তোমার পায়ে পড়ি; তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

তোমরা যৌত রূপে এবং পৃথক্ ভাবে আমাদিগকে রক্ষা করিও। হরি হরি ওঁ।

গ্রাণ্ট-ঘোমটা সংবাদ।

পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন্দ

ঠাকুরেষু—

বিবিধ বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন

হুগলীর জজ্ গ্রাণ্ট সাহেবের কাছে দাওরার একটি মোকদ্দমা হইবার সময়ে এক ব্রাহ্মণ কন্যা সাক্ষ্য দিতে ছিলেন। যে কোন কারণেই হউক, সাহেব নাকি তাঁহার ঘোমটা (সাহেবের নয়, সেই ব্রাহ্মণ কন্যার) খুলিয়া দিবার জন্য আদেশ করেন, এবং এক জন মুসলমান প্যাদা সেই আদেশ যথাযথ প্রতিপালন করে।

সাধারণীর চরিত্র আপনার অবিদিত নাই; সাধারণী নাকি এই কথা লইয়া পাড়ায় পাড়ায়, দেশে দেশে রটনা করিয়া বেড়ায়; তাহাতে সাধারণীর সঙ্গে যাঁহাদের আলাপ আছে এমন আর দশজনেও এই

কথা লইয়া ঘোঁট করিতে থাকে। এখন নাকি শুনিতেছি যে, কথা আমাদের ছোট লাটের কর্ণ কুহরে উঠিয়াছে, আর তিনি ইহাকে অত্যাচারের কথা মনে করিয়া তদন্ত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

তদন্ত যদি সত্য সত্যই হয় তাহা হইলে বড় দুঃখের বিষয়। গ্রাণ্ট সাহেবের অনেক শত্রু; আমি বিশেষ জানি অনেক বাঙ্গালী, গ্রাণ্ট সাহেবের চাকরিটি পাইবার দুরাশায় সময়ে সময়ে তাঁহার অনেক দুর্নাম রটনা করে, এবং অনিষ্ট চেষ্টা করে। সেবার সেই বাঁকুড়ায় অমনি এক সাক্ষীকে চড় মারা না কি একটা কথা তুলিয়া অমন আমায়িক স্বভাবের সাহেবটাকে নাস্তানাবুদ করিয়াছিল।

যাহাই হউক, যদি তদন্ত হয়, সাহেবকে একটা কৈফিয়ৎ দিতেই হইবে। আমি আইন আদালত লইয়া চিরদিন কাটাইয়া আসিতেছিলাম; সংপ্রতি মোক্তারদের আইন হইয়া আমার অন্ন মারা যাইবার আশঙ্কা হইয়াছে; সুতরাং এ সময়ে গ্রাণ্ট সাহেবের একটু উপকার করিতে পারিলে, হয় ত আমারও উপকার হইতে পারে। এই জন্য তাঁহার কৈফিয়তের একটা মুসাবিদা আমি পাঠাই, অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংশোধন করিয়া সাহেবের কাছে আপনি পাঠাইয়া দিবেন।

কৈফিয়ৎ।

লিখিতং শ্রীগ্রাণ্ট সাহেব, সাহেবে জজ্ জেলা হুগলী কস্য কৈফিয়ৎ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে হুজুর আলীর পরওয়ানা অত্র আদালতে আগত হইলে অধীন সেরেস্তাদার ও সেশিয়ান মোহররকে এ বিষয়ে রেপোর্ট দিবার আদেশ করিবাতে তাহারা যে মর্ম্মে রোয়দাদ দাখিল করিয়াছে তাহার এক খণ্ড নকল পৃথক রোবকারী সহকারী সহ পাঠান এবং এ পক্ষ স্বয়ং তৎকালে বিচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় বিশেষ হাল অবগত না থাকা গতিকে তন্মর্ম্ম মতে যাহা জানিতে পারিয়াছে তাহাতে এ পক্ষের দোস প্রকাশ পায় না।

আমার হাল এই যে, বিচার কার্য্যে পক্ষপাত করিতে আইন ও ছকুর্লের মতে নিষেধ থাকায় সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করিতে হয় বাঙ্গালী পুরুষগণ মুখে ঘোমটা দেয় না এবং স্ত্রীলোকগণ ঘোমটা দেয় ইহা সত্য হইলেও হইতে পারে কিন্তু আদালতে তাহা গ্রাহ্য যোগ্য নহে সেই নিমিত্ত স্ত্রীলোকের ঘোমটার খাতির করা যাইতে পারে না এবং বিচার কার্য্যের সময়ে সহজে ঘোমটা না খোলায় তাহাতে আদালতের অবজ্ঞা বলা যাইতে পারে এ পক্ষের উকীলগণের দ্বারাও ইহা সাব্যস্থ হইবেক অধিকন্তু সাক্ষীদের মুখভঙ্গী দেখিয়া বিচার করিবার কথা আইনে স্পষ্ট প্রকাশ তাহাতে মুখ দেখা আবশ্যক হইলে কি প্রকারে ঘোমটা থাকিতে পারে।

আরও জানা যাইতেছে যে ঘোমটা খুলিবার হুকুম দেওয়া সত্য হইলেও যে পেয়াদা ঘোমটা খুলিয়া দিল সে ব্যক্তি পরপুরুষ বটে, কিন্তু তাহা এ পক্ষের দোষ বলা যাইতে পারে না পেয়াদার নিজের দোষ বলিতে হইবে এবং সে মুসলমান ইহাও তাহারই দোষ এমতাবস্থায় যদি কাহারও রুটা মারিতে হয় তাহা হইলে পেয়াদার রুটী মারাই আইন এবং বিচার সঙ্গত হয় এ পক্ষেরও সেই অভিপ্রায় তাহাতে হুজুর মালিক নিবেদন ইতি।

[পঞ্চানন্দ কেবল বানান দোরস্ত করিয়া দিলেন, অন্য সংশোধনে তিনি অশক্ত। সাহেবের নিকট পাঠাইবার সুযোগ না থাকায় ইহা মুদ্রিত করিয়া দেওয়া গেল।]

কাবুলস্থ সংবাদদাতার পত্র।

শ্রীচরণকমলেষু

ভূমিলুণ্ঠিত অশেষ প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদন মিদং। পূর্ব্ব পত্রে যুদ্ধের বিবরণ লিখিতে চাহিয়াছি; সুতরাং আপনিও সে জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়া পদদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ভর দিয়া আমার এই পত্রের প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাহার সন্দেহ নাই। আপনার কৌতূহলের পায়ে আর তুড়ুম ঠুকিয়া রাখা উচিত নয় বিবেচনায় আমিও সত্বর হইতেছি।

যুদ্ধের নাম শুনিলে সকলের মনে একটা ধারণা হয় যে,অনেক লোক সারি দিয়া দাঁড়াইয়া গোলা গুলি ছুড়িতে থাকে ও তরওযাল চালাইতে থাকে এবং সেই রূপ সম্মুখে দণ্ডায়মান আর এক দলের আক্রমণ গ্রহণ করিয়া থাকে। পরে এক দল সংখ্যাতে দুর্ব্বল হইয়া পলায়ন করে, অপর দল তাহাদের পশ্চাৎ দৌড়িয়া যায়, যাহাকে পায়, মারে, কাটে অথবা ধরিয়া আনে। আমি যে যুদ্ধ দেখিলাম, ইহা যদি সে রকমের হইত, তাহা হইলে তাহার বিবরণ লিখিয়া আমি কষ্ট পাইতাম না। এখানকার যুদ্ধ অতি আশ্চর্য্য এবং কৌশলময়। কাবুলবাসীগণ দলবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে জানে না। একাএক মল্ল যুদ্ধ করিতে ভাল বাসে বলিয়া আমার বোধ হইল।

কাবুলে যাহারা বাস করে সেই আমাদের শত্রু; যে পুরুষ কাবুলের ভিতর পদচারণা করে, সেই মল্লযুদ্ধে অগ্রসর হয়—রবার্ট সাহেব এ কথা আমাকে আগে হইতে শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন। প্রেশ কমিশনর মহোদয়ের প্রদত্ত চসমার গুণে আমি নিজেও দেখিলাম যে তাহা যথার্থ। তাহাতেই যুদ্ধের প্রক্রিয়াটা ভাল মতে উপলব্ধি করিতে পারিলাম।

লড়াই এই ভাবে হইতেছিল;—মনে করুন একজন কাবুলী আমাদের বাসার নিকট দিয়া যাইতেছে, এবং তাহার দুই হাত দুই পাশে ঝুলিতেছে বা দুলিতেছে। ইংরেজী ভাষায় বাহুর এবং অস্ত্রের একই নাম — আর্ম

সুতরাং ইংরেজী মতে সে ব্যক্তি সশস্ত্র শত্রু, যুদ্ধার্থে অগ্রসর অতএব সাধ্য পক্ষে বধ্য। আমাদের পক্ষে অর্থাৎ ইংরেজ পক্ষে এই মীমাংসা হইবামাত্র তাহাকে রণে পরাভূত করিবার উপায় স্থির করা আবশ্যক; অমনি পাঁচ সাত জন সৈনিক সেই কাবুলাটার দিকে দৌড়িল, দুই চার জন দুই একটা ধুলা ঘাস খাইল, তাহার পর কাবুলা ধরা পড়িল। রবার্ট সাহেব সেনাপতি, তথাপি অবিচারক নহেন; তাঁহার সম্মুখে পাপিষ্ঠ কাবুলা আনীত হইবামাত্র, তিনি বিচার করিয়া দেখিলেন যে,সে ব্যাক্তি কাবানিয়ারি সাহেবকে স্বহস্তে হত্যা করিয়াছে। আমিও দেখিতে পাইলাম, তাহার বিস্ময়াবিষ্ট মুখে হত্যার চিহ্ন সমস্ত দেদীপ্যমান; তখন আমার চসমা আর রবার্ট সাহেবের এক মত হওয়াতে, তিনি আমাকে বলিলেন—খুন করিলে ফাঁসি হয়, ইহা যথার্থ কি না?

আমি উত্তর দিলাম এক শ বার। তিনি বলিলেন—দয়ার সহিত বিচারকে মোলায়েম করিতে হইবে; এক শ বার ফাঁসি দেওয়া বিচার সঙ্গত হইলেও আমি দয়া করিয়া ইহাকে এক বারের বেশি ফাঁসি দিব না। তৎক্ষণাৎ কাবুলার একবার মাত্র ফাঁসি হইয়া গেল।

আমি রবার্ট সাহেবের বীরোচিত এই দয়া দেখিয়া মোহিত হইয়া গিয়াছি। কিন্তু ইহার ভিতর দুইটী দুঃখের কথা উপস্থিত হইয়াছে। প্রথম এই যে, কাবানিয়ারি সাহেবের দেহ যতই কেন প্রকাণ্ড হউক

না, তাঁহার হত্যাকারী প্রমাণে যত লোকের ফাঁসি হইতেছে, তত লোকে তাহাকে আঘাত করিতে হইলে একটা আঘাতের উপর এক শ দেড় শ আঘাত করিতে হইয়াছিল; নহিলে তাহার শরীরে কুলায় না। দ্বিতীয় কথা এই যে, কাবুলীরা এমনই অল্প প্রাণ এবং দুর্ব্বল যে, তাহাদের মধ্যে একজনও রবার্ট সাহেবের দয়ার ফলভোগ করিতে পারিতেছে না,—যেমন কেন কাবুলী হউক না, একবার মাত্র ফাঁসি দিলেই তাহার প্রাণান্ত হইয়াছে। আমার বিবেচনায় যে জাতির এই টুকু সহ্য করিবার ক্ষমতা নাই, ইংরেজের সঙ্গে তাহার যুদ্ধ করা সাজে না। বাঙ্গালীরা বুদ্ধিমান, এই জন্য এই ইংরাজ-রাজের এত ভক্ত।

অধিকন্তু দুঃখ এই যে, ফাঁসির আগে যত কাবুলীকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহাদের সকলেই আমাকে বলিল যে—দুই দিন অগ্রপশ্চাৎ মরিতেই হইবে, সুতরাং মরিতে কোনও দুঃখ নাই। কিন্তু এ ভাবে মরিতে একটু কষ্ট হয়, অস্ত্র হস্তে মরিতে পাইলে এ কষ্ট হয় না। আমার বিবেচনাতে এ কথা কত-কটা সত্য; কারণ ফাঁসিতে মরিতে হইলে দম বন্ধ হয়, তাহাতে অতিশয় কষ্ট হইবারই সম্ভাবনা।

এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া এক জন কাবুলীকে আমি এক দিন পরামর্শ দিলাম যে, এমন করিয়া মরা অপেক্ষা যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া ইংরেজের বশতা স্বীকার করাই উচিত। তাহাতে সে অসভ্য মূর্খ আমাকে

কতকগুলা কটু কাটব্য বলিয়া শেষে চীৎকার করিয়া উঠিল—কাবুল পরাধীন হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া কাবুলী কখনও হইবে না; যেমন মূর্খ তেমনি শাস্তি; পাষণ্ডের ফাঁসি হইল।

এই রূপে ফাঁসি দেখিতেছিলাম, আমোদ করিতেছিলাম এবং বিশ্রস্তালাভ করিতেছিলাম, এমন সময়ে সহসা এক দিন রবার্ট সাহেব আমাকে বলিলেন যে, আমাদিগকে ঘেরাও করিতেছে, চলো আমরা এখান হইতে পলাইয়া যাই। "যে আজ্ঞা" বলিয়া আমি আগে আগে দৌড়িলাম; তাহার পর শেরপুরে আসিয়া আবার আমরা জমায়েত বস্ত হইয়া বসিয়া রহিয়াছি। বাহিরের খবর কিছু মাত্র জানি না। রবার্ট সাহেবের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় দিন যাপন করিতেছি. সেই কথাবার্ত্তার সার মর্ম্ম লিখিয়া এ পত্রের উপসংহার করিতেছি। যদি ফিরিয়া না যাই কিম্বা আর পত্র লিখিতে না পাই, তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক গৃহিণীর হাতের শাঁকা খাড়ু আপনি খুলিয়া দিবেন, এবং আমার শালগ্রামের সেবার ভার লর্ড লিটনের উপর দিবেন, এই আমার অনুরোধ।

আমাদের শেরপুরে ঘেরাও হইবার দিন, দুঃখ প্রকাশ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া রবার্ট সাহেব আমাকে বলিলেন,—দেখো তুমি যেমন উপযুক্ত লোক অন্য কাগজের সংবাদ লেখকেরা যদি তেমনি হইত, তবে আমার ভাবনা কি? তাহারা যুদ্ধের কিছুই বোঝে

না, কিছুই জানে না। অথচ আমাকে বিব্রত করিয়া রাখিয়াছে। অর্থাৎ তাহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য আমাকে যুদ্ধ ছাড়িয়াও ব্যস্ত থাকিতে হয়। তাহারা এখানে না থাকিলে এই যে আমরা বন্দী অবস্থায় আছি বলিলেই হয়, ভারতবর্ষে অদ্যই সংবাদ যাইত যে, সমস্ত কাবুলীকে ধ্বংস করিয়া আমরা জয় লাভ করিয়াছি। এই জন্য সংবাদদাতাদের সম্বন্ধে এমন নিয়ম করা আবশ্যক, যাহাতে তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে না আসিতে পারে। আমি দেখিলাম, কথা যথার্থ।

আর এক দিন রবার্ট সাহেব বলিলেন—দেখো, কাবুলের যুদ্ধ অধর্ম্ম সম্ভূত বলিয়া অনেকে অনুযোগ করিতেছে, কিন্তু ইহা বড় অন্যায়। খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মই সত্যধর্ম্ম; সুতরাং ইহার প্রচার আবশ্যক, এ দিকে ধর্ম্মের প্রতি সহজে কাহারও অনুরাগ হয় না। এমত স্থানে যুদ্ধ ভিন্ন নিরুপদ্রবে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম কি রূপে এখানে আনা যাইতে পারে? আমি বলিলাম—তাহার আর সন্দেহ কি? বিশেষত যীশু মনুষ্যের জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন; এখন তাঁহার জন্য মনুষ্যের প্রাণ লওয়াতে কোনও দোষ হইতে পারে না; অধিকন্তু অর্থনীতির নিয়মানুসারে সুদ লওয়া পাপ নহে, সুতরাং প্রাণের শোধ প্রাণ তাহার উপর সুদ, ইহাতে দোষের ত কিছুই দেখি না। আরও এক কারণে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অনুরোধে যুদ্ধ করা আবশ্যক, মুসলমানেরা এক হাতে

কোরাণ, অন্য হাতে তরওয়াল লইয়া যায়, যাহার বেলা যেমন, সেই মত না করিলে চলিবে কেন? অন্যথা, অপরের ধর্ম্মে যে হস্তক্ষেপ করা হইবে! আমার কিছু উন্নতি করিয়া দিবেন বলিয়া এই দিন সাহেব আমাকে আশ্বাস দিলেন; কিন্তু ফাঁসি মনে পড়াতে আমার উন্নতি স্পৃহা একেবারেই লোপ পাই-য়াছে। সাহেবকে বলিলাম আপনার অনুগ্রহই যথেষ্ট, উন্নতির প্রয়োজন নাই। তবে কপালে থাকিলে আমিও বন্ধ করিতে পারিব না; আপনাকেও অত আগ্রহ করিতে হইবে না।

সাহেবকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, এ যুদ্ধে প্রয়োজন কি? সাহেব বলিলেন—লর্ড লিটন দেশে কাব্য লিখিয়া কাব্যের বিষয় ফুরাইয়া ফেলিয়াছেন; এখন একখানি বীররসাশ্রিত মহাকাব্য তাঁহার লিখিতে ইচ্ছা হইয়াছে; সেই অনুরোধেই যুদ্ধ। কবির কল্পনা এবং রাজনীতিজ্ঞের কৌশল এমন সমন্বিত দেখিয়া আমার পরমানন্দ হইল।

সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, একটী স্বাধীন জাতিকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করা অন্যায় বলিয়া যে সকলে এত গোল যোগ করিতেছে, তাহাতে তোমার মত কি? আমি বলিলাম, যাহারা এমন কথা বলে তাহারা বোকা। ইংরেজের মত স্বাধীনতা প্রিয় জাতি জগতে আর নাই; সুতরাং যেখানে স্বাধীনতা পাইবে, ছলে হউক, বলে হউক,

কৌশলে হউক, তাহা আত্মসাৎ করিবার যত্ন করিবে, ইহাতে দোষ কি? বরং তাহা না করিলে স্বাধীনতা প্রিয়তার প্রতি সন্দেহ জন্মিতে পারে।

অদ্যকার মত শ্রীচরণে নিবেদন ইতি—।

উকীল মোক্তারের আইন।

এবার ওঝার ঘাড়ে বোঝা চাপিয়াছে; যাঁহারা আইনের দোহাই দিয়া, আইন বেচিয়া, খান, পরেন, এবার তাহাদের সম্বন্ধে এক আইন জারি হওয়াতে তাঁহারা বিব্রত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মহা হুল-স্থূল পড়িয়া গিয়াছে।

প্রধান ভাবনা মোক্তারদের ভাগের কথা লইয়া। উকীল মনে করিতেছেন, ভাগ না দিলে, কাজ যুটিবে না, মোক্তার ভাবিতেছেন, ভাগ না পাইলে উকীল-দিগকে এত টাকা দেওয়া কেন? যেখানে টাকা বেশী আছে, সেখানে না হয় বিলাতী সাহেবকেই দেওয়া যাইবে।

মোক্তারেরা যদি এ পরামর্শ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাদের রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন জন্য সরকার হইতে একটা উপাধি ও খেল্লাত পাওয়া উচিত। এখন দুর্গোৎসবেও ব্রাহ্মণ ফেলিয়া সাহেব নিমন্ত্রণের প্রথা হইয়াছে, তবে ওকালতীতে না হইবে কেন? উপরে নাচে চাপ না পড়িলে, ভারতবাসীর জ্ঞান যোগ হইবে না! উকীলদের জ্ঞান যোগের

এই অবসর,—উপরে সাহেব, নীচে মোক্তার। বাছা সকল, টিপে ধর্‌বে ছাড়বে না।

কিন্তু উকীলদেরও তাদৃশ ভয়ের কারণ নাই। পঞ্চানন্দের এক বন্ধু বলিয়াছেন, উকীল তিন জাতীয়; প্রথম, ময়ূর,—ইহারা পুচ্ছবলে অর্থাৎ প্যাকাম দেখাইয়া খান; ইতর লোকে ইহাকে বলে--পসার, ক্ষমতা, সময়, অথবা কপাল। ইহাদের ভাবনার কারণ নাই, যতদিন প্যাকাম আছে, ততদিন চিড়িয়াখানায় ইহাদের মান যাইবার নহে। দ্বিতীয়, কাক—ইহারা ছেলে পুলের টোকা হইতে মুড়িটা, লাড়ুটা অথবা আঁস্তাকুড়ে এঁটোটা কাঁটাটা খুঁটিয়া খায়; ইহাঁদের কেহই যত্ন করিবে না, কাহারও প্রত্যাশাও নাই, তথাপি একরকম পেট্‌টা ভরে জীবনটা কাটে। ইহাঁদেরও ভাবনা নাই।

তৃতীয়, কোকিল,- ইহারা পরের বাসায় প্রতিপালন হয়, পরের আধার খাইয়া প্রাণ বাঁচায়, সময় পাইলে কুহু কুহু তান ধরে বসন্ত এবং বিরহীর কাছে নামে একটু খাতির পায়, কাজে পায়না বরং গালী খায়। ভাবনা উকীলদের জন্য।

নেটিব্‌ সিবিল সার্ব্বিস।

অর্থাৎ

কালা আদমিদের গৌরব প্রাপ্য বাঙ্গালা পদ।

তদীয় উৎকৃষ্টতা ঐ রাজ্য প্রতিনিধি এবং মন্ত্রী

সভার মধ্যস্থ বড়লাট সাহেব সন্তুষ্ট হইতেছেন ঘোষণা করিতে তাঁহার ভালবাসার ধন ভারতবর্ষের প্রজাগণের প্রতি যে তাহাদের দুঃখ নিশার অবসান হইল। কোন্ কালে, শ্রীশ্রীমতী মহারাজ্ঞী, অধুনা ভারতেশ্বরী, দুষ্ট লোকের কুমন্ত্রণায় এবং চক্রীদের চক্রান্তে কুহকিত হইয়া বলিয়া ফেলিয়াছেন, যে শ্বেত কৃষ্ণের প্রভেদ কিছু মাত্র থাকিবেক না, এবং ভগবতী সেবক ও গোখাদক একাকার হইয়া যাইবেক, এবং গুণ থাকিলেই কোলে,গুণ না থাকিলে পিঠে ;—সেই সকল কথা লইয়া ফেরেববাজ ও জালসাজ ভারতবর্ষের প্রিয়তম প্রজাগণ মহা এক গণ্ডগোল করিতেছিল, তাহাতে ক্রমাগত কয়েক জন লাটসাহেব প্রাণে প্রাণে লাটগিরি নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন, সত্য ; কিন্তু বর্ত্তমান লাট কিছু খোশমেজাজী ও হাঙ্গামাপ্রিয় না হওয়াতে, তদীয় উৎকৃষ্টতার নিদ্রার ব্যাঘাত হইয়াছে। সে বিবেচনায়, উক্ত তদীয় উৎকৃষ্টতা প্রাণতুল্য শ্রীমান্ প্রজাগণকে তোপে উড়াইয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু ইহাদের সংখ্যা অতিশয় অধিক, এবং উড়াইয়া দিলে পঙ্গপালের মত স্থানান্তরে পড়িয়া, ইহারা শস্য নষ্ট করিতে পারে, তাহা হইলে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা, যে জন্য সর্ব্বদা উৎকৃষ্টতা চঞ্চল আছেন, এবং যাহার উত্তম বন্দোবস্ত করাণ তিনি ক্ষমবান আছেন। অতএব চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া বড় লাট সাহেব সৃষ্টি করিতেছেন, এবং এতদ্দারা সৃষ্ট হইল এক নূতন

জাতীয় জীব, যাহা না হিন্দু না মুসলমান, নাতি শ্বেত নাতি কৃষ্ণ, কিছুই নহে অথচ সকলই বটে, নির্গুণ অথচ গুণাত্মন্। আর লাট সাহেব এতদ্দ্বারা ডাকিতেছেন, তাহাদিগকে "নেটিব সিবিল সার্বিস্" অর্থাৎ কালা আদমিদের গৌরাঙ্গ প্রাপ্তি।

৺ধর্ম্মগ্রন্থে লেখা আছে যে, পিতৃপুরুষের পাপগণ সন্তান কুলে তিন পুরুষ পর্য্যন্ত ভুক্ত হইবেক; সেই অনুশাসনের উপর নির্ভর করিয়া তদীয় উৎকৃষ্টতা এই বিধান করিতেছেন যে, যদি কোনও ব্যক্তির বাপদাদা কোনও প্রকারে সম্ভ্রম ও সম্পদ হাসিল করিয়া থাকে, এবং যদিস্যাৎ সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ইতর সাধারণের সহিত বিদ্যা শিক্ষারূপ ঘোড় দৌড়ের মাঠে হাঁপাইয়া গিয়া থাকে, অথবা চক্র কাটিয়া বহির্গত হইয়া থাকে, অথবা মোটেই বড় মানুষী রূপ আস্তাবলের বাহিরে না গিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের উক্ত কালো গৌরাঙ্গ প্রাপ্তির আশা রহিবে। ইহার প্রতি কারণ হইতেছে যে, হাটে বাজারে যে জহরাত বিক্রী হয়, তাহা ত দাম দিলেই পাওয়া যাইতেছে, এবং শস্তাও বটে, তবে যে রত্ন খনির তিমিরাবৃত গর্ভে গোপনে জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতেছে, শাস্ত্রানুসারে— "মৃগ্যতে হি তৎ"। আর বিশেষতঃ সকলেই অবগত আছে যে, কোম্পানী বাহাদুরের আমলে ছাতা ধরিয়া কত জন তিন পুরুষ পর্য্যন্ত বড় মানুষ হইয়া গিয়াছে। ইদানীং সে প্রথা বন্ধ হইয়া কেবল বর্ণমালার অক্ষর

সকল নানা রকমে সাজাইয়া, কাহাকেও দুই কাহা-কেও তিন অক্ষর দেওয়া যাইতেছিল, কিন্তু এত ব্যয়-ভূষণ করিয়া অক্ষর কিনিতে অনেকে প্রকাশতঃ না হউক, মনে মনে ইতস্ততঃ করিয়া থাকে, তদীয় উৎ-কৃষ্টতা ইহা টের পাইয়াছেন। তাহাদের প্রতি এবং তাহাদের সন্তানদের প্রতি একটা কিছু করা উক্ত উৎ-কৃষ্টতা যুক্তি সিদ্ধ এবং যোগ্য বিবেচনা করিতেছেন।

ইহাও নিয়ম করা হইতেছে যে, যে সকল ব্যক্তি কালা হইয়া গৌরাঙ্গ প্রাপ্ত হইবেক, তাহারা "নেটিব" রহিল, অতএব দরবারে কিম্বা এজলাসে কিম্বা প্রকাশ্য স্থানে জুতা পায়ে দিয়া উপস্থিত হইতে পারিবেক না; যাহাদের নিতান্ত সাধ হইবেক, তাহারা জুতা পায়ে দিয়া শয্যায় শয়ন করিতে পারিবেক, তাহাতে আপত্তি করা যাইবেক না, ইহা সওয়ায় ইহারা বিলাতি কোট গায়ে দিবেক না। অপিচ তাহারা "সিবিল," হইল, অতএব পেণ্ট্লান পরিধান করিবেক, এবং হ্যাট তদ-ভাবে বড় ধুচনিতে থানফাড়া জড়াইয়া মাথায় দিবেক; ইহাতে অন্যথা না হয়। এতদ্ভিন্ন ইহারা চাপকান্ বা চীনা কোট কিম্বা অন্য প্রকার নেটিব চলিত গাত্রাবরণ ব্যবহার করিতে পাইবেক না। অধিকন্তু এই সকল ব্যক্তি "সার্ব্বিস্" ভুক্ত হইল বিধায় ইহারা সর্ব্বদা ঘড়ির চেইন, কিম্বা অন্য কোনও প্রকারের চেইন দিন রাত্রি গলায় পরিবেক।

ইহাও নিয়ম হইতেছে যে, যে সামাজিক ব্যবহারে

ইহারা কদাচ সাহেবদের সহিত না মিশ্রিত হয় বা হইবার উপক্রম বা চেষ্টা করে ; ফলতঃ যদি ইহারা কালা আদমিদের সহিত সামাজিকতা করে, তাহা হইলে "সিবিল সার্বিস" হইতে আঁকুছর্ খারিজ করা যাইবেক।

এই ব্যক্তিগণ আসনে বসিয়া থালা পাতিয়া ভাত, ডাল, চচ্চড়ি কদাচ না খায় ; কিন্তু ইহাও নিয়ম করা যাইতেছে যে, টেবিলে বসিয়া কাঁটা চামচের সংস্রবে ইহারা না আইসে, তাহা হইলে অস্ত্র বিষয়ক আইনে দণ্ডাহ হইবেক। মাঝামাঝি এই বিধান হইতেছে যে, টেবিলের নীচে, খালি মেঝের উপর হাটু পাতিয়া বসিয়া ইহারা গুঁড়াগাঁড়ি পাইতে, ও ছিটা ফোটা খাইতে ও হাড় গোড় খানা লেহন করিতে সত্ত্ববান্ ও অধিকারী হইল।

যাহাদিগকে এই দলভুক্ত করা যাইবেক, তাহারা তুই বৎসর কাল নিয়ত হাড়ুডুডু বা কপাটা খেলিয়া বেড়াইবে, এবং সে জন্য সরকারি তহশীল হইতে ভাতা পাইবেক।

এই দলভুক্তদিগকে উদ্দেশ করিয়া কিছু বলিতে হইলে "নেটিব্ সাহেব" অথবা "সিবিল বাবু" বলিয়া সম্বোধন করিতে হইবে ; যাহারা ইংরেজী জানে না, নেহাত বাঙ্গালী, তাহারা পাঁচ পাঁচ শ টাকার মুচ্‌লেকা লিখিয়া দিলে বলিতে পাইবেক—

"কাঁটালের আমসত্ব।"

সিমলা পাহাড় তুঙ্গশৃঙ্গ, বাংত্তরে জানোয়ারী। } আদেশ ক্রমে
স্বর্গীয় সরকারি
মোক্তর জন্ম।

বেহারে বাঙ্গালী কেন ?

কোথাকার রাজা রাজড়া কলিকাতা আসিয়া সাহেব সুবোদের ভোজ দিয়া গিয়াছেন। সুখের কথা বটে।

পাঁজিতে লেখে যে কলিকালে অন্নগত প্রাণ; বেদে লেখে যে চারি যুগেই আহার গত প্রণয়; সেই জন্যেই বলা গেল এমন ভোজের খবর সুখের কথা বটে।

এই সব ভোজের আগে ইংলিশম্যান্ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—বেহারে বাঙ্গালী কেন? - এই ভোজের পরে ইংলিশম্যান্ আবার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—বেহারে বাঙ্গালা কেন? প্রশ্নের উত্তরে একজন বাঙ্গালী বলিয়াছেন—ভোজের ভেংকী বড় প্রসিদ্ধ। উত্তরের সারবত্ত্বা বোঝা যায় নাই।

যথার্থ কথা বলিতে হইলে দুঃখের বিষয় বৈ কি? —বেহারে বাঙ্গালা কেন? হাকিম বাঙ্গালা; আমলা বাঙ্গালী, ডাকঘরে বাঙ্গালা, রেলে বাঙ্গালা, —

এ দিকে [illegible]

কেবল বাঙ্গালা নাই,—

এ অত্যাচারের কথা বৈ কি? উত্তরে আর এক বাঙ্গালী বলেন—দোষ বিধাতার, বাঙ্গালা জন্মায় বেশী! এ উত্তরও মনোমত হইল না।

বেহারে বাঙ্গালী কেন? এ কথার জবাব না দিয়া অপর এক জন পাল্টা এক সওয়াল করেন—বাঙ্গালায়

বেহারী কেন? দ্বারবান বেহারা, পাখাটানে বেহারী, চাকর বেহারা বেহারা ইত্যাদি।– এ উত্তরও প্রচুর হইল না।

আর এক উত্তরও পাওয়া গিয়াছে, ভারতবর্ষ এক দেশ, এক রাজার রাজ্যভুক্ত। চাকরী দিবার অধিকার সেই রাজার, সুতরাং বেহারে বাঙ্গালা কেন, তাহা রাজাই বলিতে পারেন, রাজাকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত।—উত্তর অতি জঘন্য; এমন বাজে কথা গ্রাহ্যই নয়।

অতএব মানিতে হইবে যে, বেহারে বাঙ্গালী কেন, ইহা এক বিষম সমস্যা; পঞ্চানন্দ এ সমস্যা পূরণ করিতেছে। অবধান করে—

যে জন্য, হে ইংলিশম্যান, তুমি বঙ্গে, সেই জন্য হে ইংলিশম্যান্ বাঙ্গালা বেহারে। ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি।

পেটের দায় বড় দায়; ঘরে বসিয়া অন্ন যুটিলে বাহিরে কেহই যাইতে চাহে না। ইহার উপর নিশ্চিন্তে আহারের ব্যাবস্থা সারিতে হইলে, নিজের পেটে কুলায় না, আর দশটা পেট আপনা আপনি আসিয়া যোটে কিম্বা যোটাইয়া লইতে হয়। ভাবখানা এই যে সামাজিকতা—পেটের দায়ে; বিলাস—পেটের দায়ে; বিদ্যা—পেটের দায়ে; শাস্ত্র—পেটের দায়ে; এমন যে পরকালের ব্যাপার, ধর্ম্ম—তাহাও পেটের দায়ে। ইংলিশম্যানের পেটের দায় না

থাকিলে, এমন সার কথা বলিতে, এমন গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করিতেও তিনি বাঙ্গালার মাটিতে পা দিতেন না, বাঙ্গালীও এত আক্কেল পাইত না, এমন করিয়া বেহারে যাইত না।—কথাটা খুব সামান্য, ইংলিশ-ম্যানের খাতায় বোধ হয় ইহা টোকা আছে ; পঞ্চা-নন্দের অনুরোধ তিনি একবার খাতার পাতা কয়টা উল্টাইয়া দেখিবেন।

আরও কথা আছে। এই প্রকাণ্ড ভারতবর্ষ যুড়িয়া—মূর্খ, পাগল আর শিশু বাদ দিলে—এমন প্রাণী কে আছে যে ইংরেজের রাজ্য স্থায়ী হউক, এ কামনা না করে? তাহা যদি হইল এ রাজ্য চালাইবার উপকরণ সংগ্রহ করাও আবশ্যক। ইংলিশ-ম্যান্ এই নিমিত্ত স্বদেশের মায়া ত্যাগ করিয়া, সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়া এখানে আসিয়াছেন। বাঙ্গালীও না কি বড় রাজভক্ত জাতি, সেই হেতু বাঙ্গা-লীও বঙ্গের মায়া কাটাইয়া রাজ সেবা দ্বারা রাজাকে তুষ্ট করিবার মানসে বেহারে গিয়া উপস্থিত হই-য়াছে। অতএব বেহারে বাঙ্গালী—দুঃখের বিষয় হইলেও শ্লাঘার কথা ;—সে শ্লাঘা রাজার

আর একটু বলিলেই মীমাংসাটা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়। ইংলিশম্যান্ যেমন পণ্ডিত, ভারতবাসী তেমন নহে। পণ্ডিতের দ্বারা যেমন কাজ হয়, মূর্খে তেমন হয় না ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, পণ্ডিতের দর কিছু বেশী। এই সকল আলোচনা করিয়া, তাহার উপর যথাযোগ্য

বিবেচনা করিয়া কাজ চালাইবার মত গোটা কতক হাতগড়া পণ্ডিত ইংরেজরাজ ভারতবর্ষে তৈয়ার করিয়া লইয়াছেন; বাঙ্গালার প্রকৃতি বড় নরম, হাত-গড়ার সুবিধাও এই খানে। সেই জন্য বাজে কাজে বরাত হইলেই বাঙ্গালা পাওয়া যায়, ইংলিশম্যান্ পাওয়া যায় না। কেরাণী চাই—বাঙ্গালায় প্রস্তুত; ডিপুটি চাই—বাঙ্গালায় প্রস্তুত ইংলিশম্যানের হুকুম, বাঙ্গালার হাত পা। বেহারী দিয়া বেহারের কাজ নির্ব্বাহ হয় না, তত উচ্চ হাতে ইংলিশম্যানের খরচা পোষায় না—কাজে কাজেই বেহারে বাঙ্গালী।

দুঃখের বিষয় বটে, কিন্তু তুমি যদি রাগ করিয়া দেশ ত্যাগী হও, বেহারী ঠেঙ্গাইয়া বাঙ্গালীকে দেশ ত্যাগী অর্থাৎ বেহার ছাড়া করাবে। ইংলিশম্যানের কল্যাণেই বেহারে বাঙ্গালা।

কাবুলের সংবাদদাতার পত্র।

শ্রীপাদপদ্মেষু।—

সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক নিবেদন মিদং। অনুমতি পাইলে এইবার স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করি। বাঙ্গালার ছেলে, এত দূরদেশে থাকা সহজেই কষ্টকর, তাহাতে এই যবন দেশে আসিয়া এই বিষম সময়ে বাস করিতে আমার যাহা হইতেছে, আপনি অন্তর্যামী, আপনার কথনই অবিদিত নাই।

শেরপুর হইতে আমরা বাহির হইয়াছি সত্য, কিন্তু

তাহাতে চিন্তাবেগ বাড়িয়াছে বৈ কমে নাই। কে যে কাহাকে মারিতেছে, কে কেন মরিতেছে, তাহার কিছুই আর বুঝিতে পারিতেছি না। কেবল নিত্য নিত্য নূতন ভয়ের কথা কর্ণগোচর হইতেছে। আজ শুনিলাম মীর বাচ্ছা আমাদের মাথা কাটিতে সজ্জা করিতেছে, কাল্ শুনিলাম মহম্মদ জান কোথা হইতে উপস্থিত হইয়া লোক সংগ্রহ করিতেছে। ভাবিয়া দেখুন আফগান্ স্থানের বাচ্ছা কাচ্ছা সকলেই যদি লাগে তবে ইংরেজের ভাগ্যে যাহাই হউক, আমার প্রাণে প্রাণে ফিরিয়া যাওয়া দুর্ঘট হইবে।

অধিকন্তু কাবুলে যে সকল হিন্দু কয়েক পুরুষ ধরিয়া বাস করিয়া আসিতেছে, তাহারা পর্য্যন্ত পলায়ণ পরায়ন হইয়াছে। ব্যাপারটা ইহাতেই বুঝিতে পারিবেন। তবে আমি শুধু এক ধুতি গামছার অনুরোধে বসিয়া প্রাণটার উপর হাতা দিই কেন, বলুন। আফগানস্থান জয় করার কার্য্য সমাধা হউক, এখানে ইংরেজের আধিপত্য দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত হউক, তখন না হয় আমাকে একটা বড় চাকরি দিয়া একবার এইখানে পাঠাইয়া দিবেন।

আরও এক ভাবনা আমার হইয়াছে। আমি যে এই সকল পত্র লিখি, যথেষ্ট বিশ্বাস থাকার দরুণ রবার্ট সাহেব সব গুলি খুলিয়া দেখেন না। এ দিকে বিলাতে ও ভারতবর্ষে অনেক মিথ্যাবাদী লোক আছে; তাহারা রবার্ট সাহেব এখানে অনেক অত্যাচার করি-

য়াছেন বলিয়া কলরব করিতেছে ; সেই জন্য সে দিন রবার্ট সাহেব এক লম্বা চৌড়া চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, যে দরকার না হইলে অত্যাচার করা হয় না এবং যতটুকু দরকার তাহার বেশী অত্যাচারও করা হয় না। আমার অক্ষর এবং এবারকার দুই ভালো বলিয়া রবার্ট সাহেব আমাকে দিয়াই ঐ পত্রখানি লেখাইয়াছেন, সেই জন্য এত সবিশেষ জানিতে পারিয়াছি। এই পত্রের মধ্যে অনেকে মনে করিতে পারে, অল্প হউক, অধিক হউক, আবশ্যক হউক, অনাবশ্যক হউক, রবার্ট সাহেবের কিছু অন্যায় আছে। অথচ আমি ইতঃপূর্ব্বে যে সকল পত্র আপনাকে লিখিয়াছি তাহাতে সাহেবের দয়া, গুণ, ধর্ম্মজ্ঞান এবং সদাশয়তার উচিত সুখ্যাতি করিয়াই লিখিয়াছি। এখন ভাবনা এই যে, যদি ভবিষ্যতে এই সব কথার আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং সাহেবের কবুল জবাবের বিপরীত আমার পত্র লেখা হইয়াছে বলিয়া, আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া একটা দণ্ড বিধান করে তবে সর্ব্বনাশ হইবে। আর সৈনিক দণ্ড বিধানে তোপে উড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা আছে, তাহা আপনার অবিদিত নাই। উড়িতে আমি অক্ষম, তাহা ডানাকেই কি আর তোপেই কি? বাঙ্গালীরা উড়িতে জানে না, তাহাও আপনি জানেন; অনেক ভদ্রলোক ছাদ হইতে, বারাণ্ডা হইতে উড়িবার চেষ্টা করিয়া শেষে প্রাণটা উড়াইয়া দিয়াছে।

এই হইয়াছে যে, আমীরের বাটী দখল করিবার সময়ে রুষিয়ার যে সকল পত্র পাওয়া যায়, কবিকল্পনা কুশল, দ্বিতীয় বিশ্বামিত্র, রাজনীতি বিশারদ পণ্ডিতগণ তাহা হইতে এক ভয়ানক অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহাতে লেখা আছে যে আমীরের সাহায্য লইয়া রুষীয়া পঞ্জাব পর্য্যন্ত দখল করিবে, এবং ইংরেজ সেনাপতি, পঞ্জাবের অধিবাসী, ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গ, প্রজাবৃন্দ, সকলেই তৎকালে কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় অভিভূত থাকিবে; এবং উত্তর পশ্চিম প্রান্তে যে সকল দুর্গাদি আছে, সে সমস্ত রুষায় মধুর বংশীধ্বনি শ্রবণ মাত্রে ধরাশায়া হইবে।

এ কথায় যে আশঙ্কার বিষয় আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই আশঙ্কা বশতই বেয়াকুব খাঁকে কৌশল করিয়া বিশ্বাস জন্মাইয়া বন্দী করা হয়, এবং দেশান্তরিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শুনিয়া থাকিবেন এখনও এক একজন আফগান বাসীকে 'গবণর' ইত্যাদি পদ দিয়া বিশ্বাসভাজন করা হইতেছে। শুনিলাম ইহাদিগের রপ্তানি কার্য্যে আফ্‌গানস্থানে লোক সংখ্যা কমাইবার কল্পনা আছে; রবার্ট সাহেবকেও আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তখন ব্যস্ত ছিলেন, বিড়্ বিড়্ করিয়া কি বলিতে বলিতে সরিয়া গেলেন, আমি তাঁহার কথা ভালো বুঝিতে পারিলাম না। তবে রুষীয় পত্র বাহির হইবার পরে এ সকল হইতেছে; তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই সকল কারণে আমি বিদায়ের অনুমতি প্রার্থনা করি।

সংপ্রতি ভাবনার চোটে এক অভিধান প্রস্তুত করিতে আমি মনোযোগ করিয়াছি। তাহার কিয়-দংশ আপনার নিকট পাঠাই; উৎসাহ পাইলেই সম্পূর্ণ করিব।

আঙ্গো। আস্‌গান অভিধান।

শব্দ — অর্থ।

রুষ-শঙ্কা — ভারতবর্ষকে অবিশ্বাস।

বৈজ্ঞানিক সীমা — রক্তের নদী এবং হাড়ের পাহাড়।

দুর্ভিক্ষ — যুদ্ধ।

শত্রু — স্বদেশ এবং স্বধর্ম্মের মায়ায় যে প্রাণপণ করে।

সন্ধি — বন্দী।

দেশাধিকার — দাঁড়াইতে যত টুকু স্থানের প্রয়ো-জন, মৃত্যু পর্য্যন্ত সেই পরিমাণ স্থান পদতলস্থ রাখা।

সেনাপতিত্ব — এরূপ ভাবে সৈন্য সংস্থাপন করা, যাহাতে বিপদ্‌কালে এক দল অন্য দলের সাহায্য করিতে না পারে।

অসভ্য জাতি — যাহাদের সহিত ব্যবহারে সভ্য-তার নিয়ম এবং ধর্ম্মের শাসন মানিবার প্রয়োজন থাকে না, এবং যাহাদের শিল্প মহিমার অপূর্ব্ব চিহ্নস্বরূপ অট্টালিকাদি ভগ্ন ও গৃহাদি ভূমিসাৎ করিলে কলঙ্ক নাই।

পঞ্চানন্দের উপদেশ লহরী।

বোম্বাই প্রদেশের গবর্ণর সাহেব বিলাতের মহা-সভার সভ্য হইবার আকাঙ্ক্ষায় জাহাজে চড়িয়া যাত্রা করিয়াছেন; ভারতবর্ষে তিনি অনেক কাল কাটাইয়া গিয়াছেন, ভারতবর্ষের সকল দলকেই তিনি সন্তুষ্ট করিতে বরাবর প্রয়াস পাইয়াছেন; এবং চিরকালই এরূপ চেষ্টার ফল যাহা হইয়া থাকে, তাঁহার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছে;—তিনি কোনও পক্ষেরই মন রাখিতে পারেন নাই, কেহই তাঁহার উপর রাজি নাই। অধিকন্তু বিলাতের রাজনীতি অনুসারে "গোঁড়া" এবং "পাতি" নামক যে দুই জাতি বা দল আছে, তাহার মধ্যে তিনি গোঁড়াদের দলভুক্ত। সেই জন্য ভারতবাসীর কামনা যে তাঁহার মনোবাঞ্ছা যেন পূর্ণ না হয়, কারণ সংপ্রতি ভারত প্রতিনিধি কলি-কাতায় সভা করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে "গোঁড়াকে বিশ্বাস করিও না; গোঁড়ার হাতে সদ্গতির আশা নাই।" বিলাতের বিধাতা পুরুষেরা বলিতেছেন, বোম্বায়ের গবর্ণরের কামনা নিশ্চিত সিদ্ধ হইবে। অতএব ভারতবর্ষে আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ আছে বলিতে হইবে।

ভারতবর্ষের প্রতিনিধি ঘোষজ মহাশয়ও বিলাত রওয়ানা হইয়াছেন; তিনি স্বয়ং সভ্য হইতে পারি-বেন না, কারণ বিলাতের মহাসভার শাস্ত্র অনুসারে ভারতবর্ষ অসভ্য। তবে প্রতিনিধির উপর এই ভার

দেওয়া হইয়াছে যে, তিনি "পাতি" সম্প্রদায়ের পোষ-কতা করিয়া যেন প্রকারান্তরে ভারতের উপকার করেন। ভারতবর্ষের প্রত্যাশা আছে যে, তাঁহার কথায় কাজ হইবে; সেই জন্য সকলেই তাঁহার জয় প্রার্থনা, এবং সিদ্ধি কামনা করিতেছে। পঞ্চানন্দের আশঙ্কা এই যে, কাঠবিড়ালীর সাগর বন্ধন ত্রেতাযুগে সম্ভব এবং সত্য হইলেও কলিকালে বুঝি তাহা খাটে না। এ আশঙ্কা যদি ভ্রমূলক না হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের ভাবনার কথা বটে।

কিন্তু শুধ্ আশঙ্কার কথা বলিয়া ভয় দেখান ভালো নয়; একটা প্রতীকারের পন্থাও দেখাইয়া দেওয়া উচিত। পঞ্চানন্দের উপদেশ মত কাজ করিলে ভারতে প্রতিনিধি মান বাঁচাইয়া মান লইয়া ফিরিয়া আসিতে পারেন।

সভ্য ভব্য হইবার চেষ্টা করা বৃথা; আর পরকে সভ্য করিয়া তাহার দ্বারা কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টাও তদ্রূপ। অতএব সে সব উৎপাত ছাড়িয়া দিয়া যাহাতে ভারতবর্ষের সঙ্গে বিলাতের একটা নূতন সম্বন্ধ পত্তন হয়, তাহারই উপায় অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ কল্প। নূতন সম্বন্ধ নানা রকমের হইতে পারে।

প্রথমতঃ। প্রতিনিধি চেষ্টা করুন, যাহাতে ভারত-বর্ষের পত্তনি কি তদ্রূপ অন্য একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়া সকল গোলযোগ জন্মের মত চুকিয়া যায়। ভারতবর্ষের শাসন প্রণালী স্বহস্তে রাখিয়া ইংলণ্ড যে

স্বার্থ সাধনের অভিপ্রায় করেন ইহা কেহই বিশ্বাস করিবে না; ছাঁকা ভারতের উপকার করাই—ইংলণ্ডের উদ্দেশ্য; এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বহুতর ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় বলিয়া কিঞ্চিৎ পারিশ্রমিক স্বরূপ ইংলণ্ড অল্পস্বল্প অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন মাত্র। ইহা যদি অবিসম্বাদিত সত্য হইল তাহা হইলে একটা পাকা লেখা পড়া করিয়া বৎসর বৎসর ইংলণ্ডকে মালিকানার টাকা কয়টা পাঠাইয়া দিবার নিয়ম করিতে পারিলে প্রতিনিধি সকল জ্বালা চুকাইয়া আসিতে পারেন। ইংলণ্ডের ইহাতে আপত্তি না করিবারই সম্ভাবনা; এ দিকে প্রতিনিধিকে এই বন্দোবস্তের পুরস্কার স্বরূপ ভারতবর্ষের শাসন কর্ত্তৃত্ব পদ এবং যাবজ্জীবন "খুব বাহাদুর" উপাধি দিয়া পুরস্কৃত করা যাইতে পারে।

এক আফগান যুদ্ধের ব্যাপারটা ইহার ভিতর আসিতেছে না বলিয়া গোঁড়ারা পঞ্চানন্দের প্রস্তাবে বাধা দিতে পারেন। ফলতঃ আফগান যুদ্ধের সাধটা যদি এতই প্রবল হয় তাহা হইলে পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের দখলে থাকিবার একটা সর্ত্ত লেখা পড়ার ভিতর রাখিয়া দিয়া সে বাধার অপসার করিলেই হইতে পারিবে; এবং শেষ মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিলেও ভারতবর্ষের এবং তাহার উত্তরাধিকারীগণের ও স্থলাভিষিক্তগণের তাহাতে কোনও আপত্তি থাকিবেক না; আপত্তি করিলে তাহা বাতিল ও

নামঞ্জুর হইবে এই মর্ম্মে একটা অঙ্গীকার রাখিয়া দিলেই চলিবে। নিতান্তই যদি এরূপ বন্দোবস্ত না হয়, তাহা হইলে

দ্বিতীয়তঃ। ভারতবর্ষকে উন্নত করা, স্বনীতি পরায়ণ করা, সভ্য করা, জ্ঞানী করা এবং ধার্ম্মিক করাই ইংলণ্ডের অভিপ্রায় এবং সঙ্কল্প। এমত অবস্থায় খাস দখল ছাড়িয়া দিলে ইংলণ্ডের কার্য্যকারিতার প্রতি ব্যাঘাত পড়িতে পারে। এ কথাই যদি প্রতিনিধির সম্মুখে উপস্থাপিত হয়, তাহা হইলে তিনি ইংলণ্ডের খাস দখল ছাড়িয়া দিতে পারিবেন। সভ্য হইতে বা উন্নত হইতে ভারতবর্ষের কোনও আপত্তি নাই; বরং সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। যাহা কিছু আপত্তি, দক্ষিণা দিতে। ইহাই যদি হইল, আদায় তহশীলের ভার, ব্যয় বিধানের ভার এবং জমা খরচ রাখিবার ভার প্রতিনিধি স্বহস্তে রাখিতে পারিবেন, এবং অন্য যাবদীয় ভার ইংলণ্ডকে প্রদান করিতে পারিবেন। বোধ হয় এরূপ করিলে উভয় পক্ষের মনস্তুষ্টি হইবার সম্ভাবনা। নিঃস্বার্থ পরহিতৈষিতার পরিচয় দিবার সুযোগ পাইবেন বলিয়া ইংলণ্ড এ প্রস্তাবে সম্মত হইবেন, এরূপ বিশ্বাস করা যাইতে পারে, এদিকে নিজের ক্ষতি না করিয়াও অপরের উপচিকীর্ষা বৃত্তি পরিচালনের ক্ষেত্র দেওয়া হইবে জানিয়া ভারত প্রতিনিধিও ইহা স্বীকার করিতে পারিবেন। ফলে, ঘরের কড়ি দিয়া বনের মহিষ তাড়াইতে ইংলণ্ডে যদি কেহ ক্ষুদ্রাশয়ের ন্যায় আপত্তি উত্থাপন করেন, তাহা হইলে

তৃতীয়তঃ। আয় ব্যয় প্রভৃতি রাজস্ব সম্পর্কীয় যাবদীয় ক্ষমতা ইংলণ্ডকে প্রদান করিয়া ভারত প্রতিনিধি সমস্ত আইন ব্যবস্থার অধিকারটা স্বহস্তে রাখিবেন; এবং ইংলণ্ড আইন বিরুদ্ধ কোনও কর্ম্ম করিলে বা করিবার উদ্যোগ বা উপক্রম করিলে ভারত প্রতিনিধির নিকট প্রত্যেক উদ্যোগ বা উপক্রমের নিমিত্ত খেশারৎ ও খরচার দায়ী হইবেন, এই রূপ নিয়ম করিতে হইবে। এই রূপে উভয়ে উভয়ের হস্তগত থাকিলে কোনও পক্ষই কাহারও আনিষ্টজনক কার্দ্দানি দেখাইতে পারিবেন না, অথচ উভয়েরই কাজ হইতে থাকিবে। তবে কোনও কোনও বিষয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সরল ভাবের মত ভেদ উপস্থিত হইতে পারে এবং তাহা হইলেও কাজের বেলায় একটা বিভ্রাট ঘটিবার আশঙ্কাও কেহ কেহ করিতে পারেন। এমত ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, মধ্য এসিয়াতে রুষিয়ার যে সকল কর্ম্মচারী উপস্থিত থাকিবেন, তাহাদিগকেই মধ্যস্থ মানিবার নিয়ম করিয়া রাখিলেই এ আপত্তির খণ্ডন হইয়া যাইবে। রুষিয়া মধ্যস্থতা করিলে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ বেতন সময়ে সময়ে দেওয়া হইবে অথবা একটা নির্দ্দিষ্ট বার্ষিক বৃত্তির নিয়ম করিয়া রাখিলেও সুবিধা হইতে পারিবে। রুষিয়ার সহিত ইংলণ্ডের যে শত্রুভাবের আশঙ্কা আছে, এরূপ নিয়ম করিলে সে আশঙ্কা দূরীভূত হইবার কথা এবং চিরসখ্যতা বন্ধনেরও উপায় হইতে পারিবে। কাল কেহ কেহ বলিতে পারেন,

যে যাহার সহিত সম্পূর্ণ সদ্ভাব নাই, তাহাকে বিশ্বাস করিয়া মধ্যস্থ করা যাইতে পারে না। এ প্রকার আপত্তি প্রবল হইয়া দাঁড়াইলে

চতুর্থতঃ। এই নিয়ম করা পরামর্শ সিদ্ধ, যে সং প্রতি ভারতবর্ষের সহিত কোনও প্রকার সম্বন্ধ না রাখিয়া ইংলণ্ড বিবাদ করিয়াই হউক বা আপোশ বন্দোবস্ত করিয়াই হউক, রুষিয়ার সঙ্গে একটা এধার ওধার করিয়া ফেলুন; এবং যত দিন তাহা না হয়, তত দিন পর্যন্ত ভারতবর্ষ নিতান্ত অরাজক থাকুক, এমন কি বিদেশবাসী বা বিধর্ম্মাবলম্বী এক প্রাণীও ভারতবর্ষের ভূমিতে পদার্পণ না করিতে পারে, এমন নিয়ম থাকুক। পশ্চাৎ বিবাদ ভঞ্জন হইয়া গেলে পূর্ব্বপ্রস্তাবিত মত আচরণ হইবে, অথবা ভারতবর্ষ উচ্ছন্নে গেলেও ইংলণ্ড কস্মিন্‌কালে এক কপর্দ্দকের কাজও ভারতের জন্য করিবেন না। এই দণ্ডের ব্যবস্থা থাকিতে পারিবে। তবে এ যুক্তি অস্পষ্ট এবং অনিশ্চিত বলিয়া যদি কেহ আপত্তি করেন তাহা হইলে

পঞ্চমতঃ। এখন যে ভাবে চলিতেছে, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে এই ভাব চিরদিন চলুক তাহার পর—যা থাকে কপালে। প্রতিনিধি মহাশয় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক অন্ন চেষ্টা করিতে থাকুন, এবং ভারতবর্ষের একটা সাধের গলগ্রহ ঘুচিয়া যাউক। তবে ভারতবর্ষের নাম করিয়া বক্তৃতা করান যে নিতান্তই আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে

একটা দৈনিক বেতন বন্দোবস্ত করিয়া এক জন বিলাতী কৌঁসুলীকে ওকালত নামা দিয়া রাখিলেই বোধ হয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারিবে।

যে সকল প্রস্তাব করা গেল তাহাতে প্রতিনিধি স্বাধীন ভাবে স্বীয় বিবেচনা শক্তি পরিচালন পূর্ব্বক সকল গুলা অথবা যেটা ইচ্ছা লইয়া আন্দোলন করিতে পারিবেন; এবং ইহার মধ্যে একটা না একটা প্রস্তাব যে বিলাতে গ্রাহ্য হইবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

যদি এই কয়েকটী প্রস্তাবে প্রতিনিধি মহাশয়ের মন না উঠে তাহা হইলে তিনি অকুতোভয়ে ইংলণ্ডস্থ "গোঁড়া" এবং "পাতি" উভয় দলকেই বলিতে পারিবেন যে, মহাসভার ভগ্ন দশায়, গুরুতর আহার ধৌত করণ কালে এবং বিষয়াভাব হইলে সংবাদ পত্রের কলেবরে তাঁহারা ভারতবর্ষের নাম গ্রহণ করিলে ভারতবাসী কুণ্ঠিত হইবে না, বরং সাধুবাদ দিতে শশব্যস্ত থাকিবে; এবং ঐ দুই দলের মধ্যে যাহার যখন প্রাধান্য এবং প্রবলতা থাকিবে, তাহাকে গালাগালি দিবার জন্য অপর দল ভারতবর্ষের নাম করিয়া ভারতের বন্ধুত্ব করিবেন তাহাতেও তাহাদের মঙ্গল হইবে। ভারতবর্ষের শাস্ত্রে লেখে "শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠাত স বান্ধবঃ।" অর্থাৎ ভারতবর্ষের অগ্নি সংস্কার কার্য্যে অর্থাৎ ভারতকে পোড়াইতে যিনি যত সহায়তা করেন তিনিই ততই উৎকৃষ্ট বন্ধু।

প্রতিনিধির মঙ্গল হউক, মাঞ্চেষ্টরের বাণিজ্য অপ্রতিহত হউক, আর ভারতবাসী গোল্লায় যাউক, পঞ্চানন্দ মুক্তকণ্ঠে এই আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। ইহাতে কেহ অরসিক বলে সেও ভালো।

পঞ্চানন্দের পত্র।

পরম কল্যাণীয়

শ্রীমান্ জারজ্ ফ্রেডরিক সামুয়েল রবিন্‌সন্ মার্কিস্, রিপন্, রেস্তের আরলগ্রে, রিপনের আরল, নক্টনের বৈকুণ্ঠ গোদরিক, গ্রন্থামের বারণ গ্রন্থাম, বারনেট *

দীর্ঘায়ু নিরাপদেষু।

বৎস,

ভারতবর্ষ দুরন্ত দেশ, তুমি শান্ত স্বভাব। এখানে যে কেমন করিয়া কি করিবে ভাবিয়া আমার প্রাণ আকুল হইতেছে।

ভারতবাসী লঙ্কার প্রতিবেশী, কত মায়া জানে, কত কুহক জানে। ভয় দেখাইয়া, মিষ্ট কথা বলিয়া

---

* বাঙ্গালী হইলেই যে বাঙ্গলা বুঝিতে পারিবে, এমন কোনও শাস্ত্রে নাই, বরং বুঝিবে না এমন ব্যবস্থা পাওয়া যায়। অতএব এই প্রকার অবোধ বাঙ্গালীর উপকারার্থ এই কয়েক পংক্তির সরল ইংরাজী অনুবাদ দেওয়া যাইতেছে। - George Frederick Samuel Robinson Marquess of Ripon Earl de Grey of Wrest Earl of Ripon, Viscount Goderic of Nocton, Baron Grantham of Grantham and Baronet.

অহরহ তোমাকে ভুলাইয়া ইহারা স্বার্থ সাধনের চেষ্টা করিবে। তুমি নূতন লোক, পাছে ভয় পাও, পাছে চক্ষু লজ্জা করো, সেই জন্য তোমাকে কিঞ্চিৎ রাজনীতি শিখাইতে ইচ্ছা করি। উপদেশ অবহেলা করিও না; করিলে মারা যাইবে।

ভারতবর্ষে এক হিন্দুর মধ্যেই ছত্রিশ জাতি মনুষ্য আছে; ফিরিঙ্গী আছে আরও কত আছে। সকলেরই মন যোগাইতে পারিবে না, কারণ তাহা অসম্ভব। অতএব কাহারও মন যোগাইও না। সকলকে বরং অসন্তুষ্ট করিও। তাহাতে অন্ততঃ এই লাভ হইবে যে,পক্ষপাত রূপ মহাপাতকে তোমাকে পতিত হইতে হইবে না।

বৎস, এখানে যোজনান্তরে ভাষা ইহা জানিয়াও যখন অধ্যাপক মোক্ষ মূলরকে না পাঠাইয়া উদারনীতি মহাপুরুষগণ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ জন্য তোমাকে পাঠাই· য়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে যে এখানকার কোনও ভাষার সঙ্গে সংস্রব রাখিলেই তোমার মহাপাপ। এমন অবস্থায় তোমার উচিত যাহাতে এই ভাষা বাহুল্যের লোপ হয় তৎপক্ষে যত্নপর হও। কথার শাসন করিতে নিতান্ত যদি না পারো ছাপার শাসন অবশ্য করিবে!

হাতে পয়সা হইলে পুত্র পিতাকে মানে না, উচ্ছৃ-ঙ্খল হয়, উচ্ছন্নে যায়। অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব কসিয়া টেক্স

বসাইবে। ছেলে কাঁদুক, কিন্তু আখেরে তাহারই মঙ্গল।

রাজনীতি ঘটিত বিষয়ে ভারতবাসী এখনও শিশু। শিশুগণ অতিশয় অব্যবস্থিত হইয়া থাকে। অতএব যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবস্থা করিবে। ব্যবস্থাপক সভা যাহাতে নিত্য নিত্য নূতন আইন প্রসব করিতে পারেন, তাহার উপায় করিবে। ছেলের শাসন চাই, কারণ শিক্ষার মূল শাসন।

ভারতবাসী জানে ছত্রদণ্ডই রাজচিহ্ন ; যে দিকে দেখিবে অসন্তোষের রৌদ্র চিন্ চিন্ করিয়া উঠিতেছে কিম্বা নয়নজলের বৃষ্টি পড়িতেছে, সেই দিকে বিলাতী বিক্রমের ছত্র ধরিবে। আর, দণ্ড চুচোখো, সম্মুখে যাহাকে পাইবে তাহাকেই বসাইবে। ভারতবাসী জানে বসাইলে শাসন হয় সম্মানও হয়।

রাজার দয়া চাই। দুই বেলা কিছু দয়ার ক্ষেত্র পাওয়া যায় না। অতএব মধ্যে মধ্যে যাহাতে দুর্ভিক্ষ হয় তাহার চেষ্টা করিবে। দয়া দেখান হইবে, রাজ কর্ম্মচারীদের কার্য্যতৎপরতার পরীক্ষা হইবে, দরিদ্রের সংখ্যা কমিলে দারিদ্রের হ্রাস হইবে—এক গুলিতে হাজার কাক মরিবে।

চারিদিকে নজর রাখিবে, যেন দৃষ্টি বিভ্রম না হয়, শ্বেত কৃষ্ণ একাকার হইয়া না যায়।

কাশ্মীরে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, অতি অন্যায় কথা। সেখানকার দুর্ভিক্ষে এক প্রকার বন্দোবস্ত এখানকার

দুর্ভিক্ষে অন্য প্রকার; ইহাতে লোকের মনে দুঃখ হয়। কাশ্মীরকে এলাকাভুক্ত করিয়া লইবে, সকল জ্বালা চুকিয়া যাইবে।

যেখানে উদ্দেশ্য মহৎ সেখানে উপায়ের জন্য মনে কোরকাপ্ করিবে না; অর্থাৎ দুর্ভিক্ষে না কুলায় নাই। বাগানটা হাত ছাড়া না হয়।

তোমার পূর্ব্বপুরুষ লিটন বাহাদুর তোমাকে ধারে ডুবাইয়া গেলেন। তুমি পাতাল না দেখিয়া ছাড়িও না; তিনি মুক্তি পাইয়াছেন, তুমি মুক্তা পাইবে।

বৎস, বদান্যতা দেখাইতে ক্রটি করিও না। দুই হাতে নক্ষত্র বৃষ্টি করিবে লোকে যদি সরিষার ফুল দেখে দরবারে ডাকিয়া মিষ্ট কথায় তাহাদের ভ্রম বুঝাইয়া দিবে। ভারতবর্ষ জাতিভেদের দেশ, এখানে উপাধির বড় সম্মান, কারণ, ইহাতে বিধাতার ভুল সংশোধিত হইবে। যাহারা বিধাতা মানে না, তাহারা ধাত্রীর ভুল মানে। ফল সমান।*

বৎস, তুমি গুণবান, ধনবান শ্রীমান; আমার উপদেশ গ্রহণ করিবে। আমি নিতান্ত ভরসা করি যে, তুমি মনে রাখিবে ভারতবর্ষ তোমার বিলাস ভূমি। তুমি পেটের দায়ে এখানে আইস নাই, তোমার গুণের

---

* "ধাই মাগী কি ভুল করেছে,
নাড়ী কাটতে লেজ কেটেছে।"
তাই নাকি?

ছাপাখানার নন্দী

পুরস্কার জন্য এ পদ তুমি পাইয়াছ; তোমারই দোষে যেন তোমার শ্রীর লীলায় বিঘ্ন বাধা উপস্থিত না হয়, সখের রাজ্যে রং তামাসা ছাড়িবে না। ভারতের রাজত্ব প্রকাণ্ড তামাসা, ইহা যেন অনুক্ষণ তোমার মনে জাগরূক থাকে।

আশীর্ব্বাদ করি, তুমি আমার উপদেশ প্রতিপালনে সক্ষম হও; তোমার সোণার দোয়াত কলম হউক; ধনে পুত্রে লক্ষেশ্বর হইয়া সুস্থ শরীরে স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া অপরকে সখ মিঠাইতে পাঠাইয়া দেও, আপনি সুখী হও। ইতি,

পুনশ্চ।—মাঝে মাঝে যদি এরূপ উপদেশের আবশ্যকতা হয়, তাহা হইলে পত্র পাঠ পত্র লিখিবে, পাঁচ টাকা দক্ষিণা পাঠাইবে, তোমাকে শিষ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইব।

পুলিশ আদালত।

শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট উপস্থিত।

গত কল্য উপাস্য শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব বিচারাসন অবলম্বন করিবামাত্র শ্রীযুক্ত কৌশঁলী সুতার সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া প্রার্থনা করিলেন, যে

"বিচারক হোয়াইট সাহেবের বিরুদ্ধে শমন প্রেরণের আজ্ঞা হয়! উক্ত বিচারক হোয়াইটের উপর আমি দুই অভিযোগ করিতে উপদিষ্ট হইয়াছি;

প্রথমতঃ নেয়ারণ্ নামক এক জাহাজী গোরার ফাঁসির হুকুম দিয়া উক্ত বিচারক হোয়াইট্ পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারিণী সভার নিয়ম বহির্ভূত অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন ; দ্বিতীয়তঃ দ্বাদশটী দয়াশীল সাহেবের তিনি অপবাদ করিয়াছেন

হুজুরে অবিদিত নাই যে, অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতবর ডার্বিন সাহেব সপ্রমাণ করিয়াছেন, যে আমরা বানরকুলসম্ভূত। আমি ভরসা করি যে এ বিষয়ে কেহ সংশয় করিবেন না।

এখন প্রশ্ন এই, যে যাহারা দ্বিপদ এবং কথা কহিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহারা সকলেই মানুস কি না ? আমি বলি তাহা কখনই নহে। বানরগণ ক্রমশঃ সভ্য হইয়া মনুষ্য বলিয়া আত্ম পরিচয় দিয়া থাকে ইহা আমি অস্বীকার করি না। আমি মনুষ্য, হুজুর মনুষ্য, তদ্বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ নাই ;, কারণ আমরা গাছে উঠি না, গাছের ডাল কাটিয়া আসন প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর উপবেশন করি। কিন্তু তাহার সম্বন্ধে কি বলা যাইবে—হাঁ, তাহার সম্বন্ধে—যে গাছের অভাবে দীর্ঘ দীর্ঘ জাহাজের মাস্তুলে অবলীলাক্রমে, নির্ভয়ে সদা সর্ব্বদা উঠিয়া থাকে ? তাহাকে কি মনে করিতে হইবে, যে অতি সামান্য মানুষ, নিতান্ত ছোট লোক কালো পাহারাওলার কথা বার্ত্তা, এমন কি ইঙ্গিত ইসারা পর্য্যন্ত বুঝিতে, পারে না ? সে দ্বিপদ হইতে

পারে, সে সোজা হাঁটিয়া—(যখন সজ্ঞানে থাকে)—যাইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়াই যে, সে মানুষ হইবে ইহা কদাচই নহে। সেবানর, অবশ্যই বানর, দশ হাজারবার বানর!

মনে রাখিতে হইবে—যে হেতু ইহা আমার তর্ক সোপানের এক প্রধান ধাপ—মনে রাখিতে হইবে যে, বানর শব্দের অর্থই কখনও নর, কখনও বা নর নহে। আমি বলি,—আর এ বিষয়ে আমি হুজুরের সবিশেষ মনোযোগ আমন্ত্রণ করিতে ভিক্ষা করি,—আমি বলি যে, নেয়ারণ যখন সঙ্গীদের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করিত, মদ্যপান করিত, তখন সে নর; নেয়ারণ যখন আমোদ নিরত একতম সঙ্গীকে ফাঁফরে ফেলিয়া চলিয়া গেল, তখন সে বানর। আবার নেয়ারণ যখন জাহাজে আসিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিল, যখন এক জনের নিকট ছুরী চাহিয়া লইল, তখন সে নর; কিন্তু আবার যখন একটা কালো কদাকার মনুষ্য পাহারাওয়ালা দেখিয়া তাহার স্কন্ধে আঘাত করিল, তাহার গলদেশ ব্যবচ্ছেদ করিয়া দিল, তখন সে কখনই নর নহে, অবশ্যই বানর।

বানর, বিকল্পে নর। যখন ইচ্ছা তখন নর। স্বদেশীয় বা স্বজাতীয়ের সহিত নেয়ারণের কেমন সদ্ভাব! কত উত্তম কত প্রশংসনীয় ব্যবহার! কি উদার চরিত্র! তখন নেয়ারণ ইচ্ছা করিয়াছিল, অতএব নর; কিন্তু যখন তাহার নরত্ব রাখিতে ইচ্ছা নাই

তখনও কি তাহাকে নর হইতেই হইবে? মুহূর্ত্তের নিমিত্ত এরূপ অভিমতির ফলাফলটা চিন্তা করিয়া দেখুন, তাহার পরে বলুন, তখন ও কি সে নর? কখনই না! তখন সে অবশ্যই বানর। যাহার যাহাতে ইচ্ছা নাই, তাহাকে তাহা বলপূর্ব্বক করাইলে ও সে কার্য্যের জন্য সে দায়ী হইতে পারে না। সে হিসাবেও সে বানর। নতুবা কি ভয়ঙ্কর অনিষ্ট, কি ঘোরতর অত্যাচারই হইয়া উঠিবে?

ইহা ভাবিতেও আমার হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিতেছে, আমার লোমগণ প্রান্তোপরি দণ্ডায়মান হইতেছে। অতএব আমি বিনয় সহকারে, অথচ দৃঢ়তার সহিত বলি, যে নেয়ারণ বানর; মনুষ্য, কদাচই নহে। আমি ভরসা করি, এ পক্ষে হজুরকে আমি সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছি।

তবে এখন দেখিতে হইবে যে, বানর পশু কি না? আমার বোধ হয়, এতৎসম্বন্ধে তর্ক করা বাহুল্য মাত্র। বানর যদি পশু না হয়, তাহা হইলে আমি নাচার, নেহাত মারা যাই। বানর অবশ্যই পশু। সুতরাং নেয়ারণ যে পশু, ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

হউক স্বতঃসিদ্ধ, তথাপি ইহার প্রমাণ আছে। দ্বাদশটী ভদ্রলোক অকাতরে অকপটে, ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া ঐ বিচারক হোয়াইটের মুখের উপর বলিয়াছিলেন যে, নেয়ারণ বুঝিয়া সুঝিয়া, মতলব আঁটিয়া, দোষ ভাবিয়া পাহারাওলাকে মারে নাই। তবে আর

চাই কি? যে জীব এ প্রকারে কাজ করে, সে কি পশু নহে? এই আমি দণ্ডায়মান হইলাম; কে বলিবে বলুক, যে পশু নয়, অন্য কোনও জীব? হুজুর! বারংবার কি বলিব, নেয়ারণ যদি পশু না হয়, তাহা হইলে আমরা সকলেই পশু।

এ হেন নেয়ারণের ফাঁসির হুকুম! গলদেশে রজ্জু বন্ধন পূর্ব্বক লম্বিত করিবার আদেশ! যতক্ষণ প্রাণান্ত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঝোলাইয়া রাখিবার হুকুম! ইহা যদি পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা না হয়, তাহা হইলে নিষ্ঠুরতা কাহাকে বলে, আমি জানি না। নিষ্ঠুরতা? এত নিষ্ঠুরতার বাপান্ত! হৃদয়, বিদীর্ণ হও। শিরা, ছিন্ন হও! ধমনী, ফাটিয়া যাও! অনর্গল রক্ত পড়ুক, আমার মনের জ্বালা যাউক! নেয়ারণের ফাঁসি!! পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা! ডার্বিন আমাদের কুলাচার্য্য, ডার্বিন্‌কে আমরা মান্য করি কালো ভারতবাসীর পৃথক্ কুলাচার্য্য আছে, ডার্বিনের কথা ভারতবাসী গ্রাহ্য করে না; তবে কি এই ভারতবাসীর চক্ষের উপর আমাদের কুলাচার্য্যের কথা আমরাই মিথ্যা বলিয়া রটনা করিব? আপনি কি ইহাতে সায় দিবেন? কখনই না! যদি স্বজাতির প্রতি অনুরাগ থাকে, যদি স্বদেশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে বাসনা থাকে, যদি দয়া, সরলতা, সত্যনিষ্ঠার মানবর্দ্ধনের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে ঐ উচ্চাসন হইতে হুজুর ঘোষণা করুন যে, বিচারক হোয়াইট্ কুলাঙ্গার, বিচারক হোয়াইট্ নিজ নামে

কলঙ্ক দিয়াছে, সে হোয়াইট্ নহে, ব্লাকস্য ব্লাক্ ! শমন ভিন্ন তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।

অতঃপর সংক্ষেপে আমার দ্বিতীয় অভিযোগের উল্লেখ করা আবশ্যক। একটী আধটী নয়, দ্বাদশটী ভদ্রলোক ; দয়াশীল, ন্যায়পরায়ণ, সাধু! এই দ্বাদশটী সমবেত স্বরে বলিলেন, যে নেয়ারণ নিষ্ঠুরতার পাত্র নহে, দয়ার পাত্র বিচারক হোয়াইট সে কথা অগ্রাহ্য করিলেন ; শুধু তাহাই নহে, তিনি বলিলেন যে নেয়ারণ পশু হউক আর না হউক, এই দ্বাদশটী ভদ্রলোক স্বজাতি পক্ষপাতী হইয়া দয়ার জন্য উপরোধ করিয়াছেন।

এখন, হজুর বিচার করুন, হোয়াইট্ ইহাঁদের অপবাদ করিলেন কি না ? যদি তাঁহার এইরূপ অভিপ্রায় হয়, যে নেয়ারণ মনুষ্য, অতএব দয়ার পাত্র নহে, তাহা হইলে দ্বাদশটী ভদ্রলোককে মিথ্যাবাদী বলা হয়। মিথ্যাবাদী বলা ভয়ানক অপবাদ ! আর যদি বলেন, নেয়ারণ পশু হইলেও দয়ার পাত্র নহে, দ্বাদশের স্বজাতি পক্ষপাতের জন্য দয়ার কথা উত্থাপন করা হইয়াছে, তাহা হইলে এ দ্বাদশটীকে পশু বলা হইয়াছে। সে দিকেও অপবাদ।

এই আমার দুই শিঙ্ ; যেটা ইচ্ছা হোয়াইট্ অবলম্বন করিতে পারেন ; কিন্তু অপবাদের দায় এড়াইতে পারিতেছেন না।

আমি জিজ্ঞাসা করি হোয়াইট্ স্পষ্ট বলুন, এই

দ্বাদশটী মিথ্যাবাদী না পশু? উত্তরের জন্য আমি অপেক্ষা করিতেছি।

উপসংহারে আমার প্রার্থনার পুনরুক্তি করিয়া, হোয়াইটের উপর শমন প্রেরণের আদেশ ভিক্ষা করিয়া আমার কাষ্টাসন আশ্রয় করিতেছি। আশা আছে, ভরসা আছে, সাহস আছে, যে আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে।”

মাজিষ্ট্রেট সাহেব অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া ও স্বীয় ক্রোড়কুক্কুরের সহিত বিস্তর পরামর্শ করিয়া এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, যে বিবেচনা পূর্ব্বক আগামী এজলাশে উচিত আদেশ করিবেন।

আদালতে এ প্রকার জনতা হইয়াছিল, যে তিল-ধারণের স্থান ও ছিলই না; ঠেলাঠেলিতে তিনটা কালা-আদমির প্লীহা ফাটিয়া স্থানটা নিতান্ত অপরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছিল। মিউনিসিপেল সিমানার ভিতর এরূপ ময়লা করার নিমিত্ত প্লীহা ফাটাদের আত্মীয়-গণের উপর গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির হইবার হুকুম হইবার পর, আদালত অন্যান্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন।

বৈঠকী আলাপ।

(পঞ্চানন্দের বৈঠকখানায় বাবুদের প্রবেশ।)

পঞ্চা। আসুন, আসুন। বড় সৌভাগ্য, ভালো করে’ বসুন না?

বাবু। থাক্, আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমরা বেস বসেছি।

পঞ্চা। কি মনে করে' আসা হয়েছে?

বাবু। কিছুঁ ভিক্ষা কর্তে আসি নি, অমনি দেখা সাক্ষাৎ কর্তে আসা।

পঞ্চা। ভালো ভালো। আপনার নাম?

১ম বা। কার্ড্ তো পাঠিয়ে দিয়েছি।

পঞ্চা। সে কেমন? বুঝ্তে পার'লাম না যে?

১ম বা। বুঝ্তে পার্'লেন না? হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ—

পঞ্চা। ভয় কি বাবু, এখানে কোনও বেটা আস্তে পার্বে না, আপনি নির্ভয়ে নাম বলুন।

১ম বা। ভালো গ্রহতে পড়্'লুম এসে, দেখ্ছি। আমার নাম সুদর্শন ঘোষাল এম্, এ,।

পঞ্চা। শ্রীহীন কর্লেন যে? যাক্ আপনার পিতার নাম?

১ম বা। মাফ্ কর্'বেন ভদ্রলোক মনে করে' দেখা কর্'তে এসেছি, কুলজী আওড়াতে আসিনি।

[বিজাতীয় ভাষায় বাবুদের কিঞ্চিৎ কথোপকথন।]

১ম বা। গ্লাড্ষ্টোন্ এবার খুব আড়ে হাতে লেগেছে, বোধ হয় মিনিষ্ট্রী বদল না হয়ে' যায় না। আপনি কি বিবেচনা করেন?

পঞ্চা। সে আবার কি?

১ম বা। চমৎকার! সে আবার কি, বল্‌লেন? সেই ত সর্ব্বস্ব।—আমাদের রাজা কে জানেন?

পঞ্চা। কেন, ইংরেজ।

১ম বা। তবু ভালো! আচ্ছা, কেমন করে' ইংলণ্ডে রাজ্য চলে, তা' জানেন?

পঞ্চা। দরকার?

১ম বা। আশ্চর্য্য! এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে, এই সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর সমাজে থেকে, এ কথা জানেন না? আর জেনে কি দরকার তাও জানেন না?—শুনুন তবে; মিনিষ্ট্রী যদি বদল হয়, আমাদের অনেক দুঃখের লাঘব হ'বে।

পঞ্চা। সে কি? ইংরেজদের রাজ্য থাকবে না?

১ম বা। আমোদ মন্দ নয়।—তা' থাক্‌'বে বৈ কি? কেবল মন্ত্রী আর কর্ম্মচারী—এই সব নূতন হ'বে।

পঞ্চা। নূতন যা'রা হ'বে, তা'রা বুঝি ইংরেজ নয়?

১ম বা। হোপ্‌লেস্‌!

(পুনশ্চ বাবুদের অবোধ্য কথোপকথন।)

পঞ্চা। আপনারা দেখ্‌ছি অনেক খবর রাখেন, বিস্তর জানেন শোনেন, আপনাদের একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—বাঙ্গালায় কত লোকের বাস?

১ম বা। ৬৬ মিলিয়ন্‌, কি এই রকম কত হ'বে।

পঞ্চা। সে কত? (বাবুর ওষ্ঠাধর কম্পিত) আচ্ছা, এদের মধ্যে ইংরেজী লেখা পড়া জানে কত লোক? বাঙ্গালা লেখা পড়াই বা কত লোকে জানে? (বাবু নীরব) আমাদের একটু বড় গোছের চাষ কর্’-বার ইচ্ছা আছে, খুব বেশী পরিমাণে পতিত জমি কোন্ জেলায় পাওয়া যেতে পারে, বল্‌তে পারেন? (বাবু নীরব) ধানী জমীর আবাদ বাড়ছে, কম্‌ছে, না সমান আছে? (নীরব) গত পাঁচ বছরের মধ্যে কোন্‌বার কত ধান জন্মেছে, বল্‌তে পারেন?

১ম বা। এ সব সামান্য কথা বোধ হয় রিপোর্ট দেখ্’লেই জান্‌তে পার্‌বেন।

পঞ্চা। বাঙ্গালায় পাওয়া যায়?

১ম বা। কৈ তা’ বল্‌তে পারি নে; বোধ হয় বাঙ্গালায় পাওয়া যায় না। পড়্‌বে কে?

পঞ্চা। বাঙ্গালায় হ’লে সকলেই পড়্‌তে পারে, আপনারা পারেন, আমরা পারি—

১ম বা (ঈষৎ হাসিয়া) বাঙ্গালা কি ভদ্র লোকে পড়ে?

পঞ্চা। অপরাধ?

১ম বা। সময় নষ্ট; বাঙ্গালায় আছে কি, যে পড়্‌বে?

পঞ্চা। তবে লেখেন না কেন?

১ম বা। (ঘড়ি খুলিয়া) আজ্‌কে একটু বরাত আছে। আবার দেখা হ’বে।

পঞ্চা। আপনাদের, সঙ্গে আলাপ করে' সুখী হ'লাম। অনুগ্রহ করে' মধ্যে মধ্যে বেড়াতে আস্‌বেন।

(নিষ্ক্রান্ত)

কাবুলস্থ সংবাদদাতার পত্র।

শ্রীচরণ কমলেষু,

দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য পূর্ব্ব পত্রে অনুমতি চাহিয়াছিলাম। কিন্তু আজ্ঞাপত্র বা তাড়িতবার্ত্তা কিছুই না পাইয়া মন বড় উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। কাবুলারা যে রকম অধার্ম্মিক এবং দুষ্টপ্রকৃতি, তাহাতে অনুমান হয় যে তাহারা ডাক মারিয়াছে এবং তার কাটিয়া দিয়াছে; নহিলে আপনার মত দয়াশীল লোকে কখনও খাড়ুনাড়া হাতের ভাত ব্যঞ্জন খাইবার সাধে বাধা দিবেন ইহা কিছুতেই সম্ভব নহে। ফলে স্পষ্ট কথা বলাই ভালো, আপনি নিষেধ করিলেও আর আমি কাবুলে থাকিতাম না। কেন থাকিতাম না, তাহা বলিতেছি।

প্রথমতঃ কাবুলাদের মত মূর্খ লোক পৃথিবীতে আর নাই। মূর্খ লোকে নিজের ভালো বোঝে না, কাবুলারাও বোঝে না; সেই জন্য ইহাদের সঙ্গে বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না, দেখুন বলি রাজা মূর্খেরই ভয়ে স্বর্গের বাসনা ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইংরেজ অতি সুসভ্য সুপণ্ডিত এবং সদাচারী জাতি, বাঙ্গালায়

আসিয়া, ভারতবর্ষে আসিয়া ইহারা যে যে উপকার করিয়াছে—ইংরেজের উপকারের কথা বলিতেছি না, আমাদের উপকার যাহা করিয়াছেন—তাহা প্রাণ থাকিতে কেহ ভুলিবে না। কাবুলীরা উপকারের কথায় আমল দেয় না; কেবল বলে, যে ভিন্ন জাতি ভিন্ন দেশ হইতে আসিয়া আমাদের উপকার করিলেও আমরা লইতে চাহি না, সাধ্যপক্ষে অপকার করিতেও দিব না। দিবে না—তবে মরো! যেমন দুর্ব্বুদ্ধি, শাস্তিও হইতেছে। আর, ভিন্ন জাতি, ভিন্ন দেশী—এসব কথার মানেই ত আমি বুঝিতে পারি না। পরম কারুণিক পরমেশ্বর সকলই সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং মনুষ্য মাত্রেই এক জাতি; ইহার আবার ভিন্ন জাতি কি? কাবুলীরা এমনই মূর্খ যে 'চারুপাঠ' পর্য্যন্ত ইহাদের পড়া নাই, চারুপাঠে মানব জাতির কথা অনেক বার লেখা আছে। তদ্ভিন্ন পৃথিবী সমস্তই এক; এক মাটী, এক জল, এক সকলই। তবে আবার ভিন্ন দেশ কি? হায়! ইহাদের ইহকাল ত গেলই, পরকালে পরিণামে ইহাদের কি হইবে, তাহাই ভাবিয়া আমার হৃদয় শোক-সাগরে নিমগ্ন হইতেছে। কাবুলবাসীগণ! এখনও তোমরা অনুতাপ করো, এখনও পাপচিন্তা হইতে বিরত হও, এখনও ক্ষমা-প্রার্থনা কর, অবশ্যই মঙ্গল হইবে। যে হেতু অনু-তাপই প্রায়শ্চিত্ত, প্রায়শ্চিত্তই স্বর্গের দ্বার। বাস্তবিক, আর আমি কাবুলে আসিতে ইচ্ছা করি না; তবে যদি

যীশুর ছোট ভাই, সিদ্ধার্থের হাড়ি-ফেলা-জ্ঞাতি, চৈতন্যের খুড়া সেনজা মহাশয় কাবুলে পদার্পণ করিয়া, কাবুলীদিগকে স্বার্থপরতা, বিষয়ীর ভাব, এবং ভ্রান্ত স্বদেশ আদির বোধ ভুলাইতে পারেন, আমারও সঙ্কল্প তাহা হইলে টলিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ কাবুলের সমস্ত ব্যাপার এখন এক ঘেয়ে গোছ হইয়া পড়িয়াছে, রকমওয়ারি না থাকিলে মজা নাই, বিবরণ লিখিয়াও সুখ নাই। ঐ রুষিয়া এল,—ঐ আমীর তাহার সঙ্গে পরামর্শ করিল,—ঐ যুদ্ধের আয়োজন করিল—ঐ আজ মারামারি—ঐ ওখানে কাটাকাটি—ইহা ছাড়া নূতন কথা কিছুই নাই। তা একটা কথা ভাঙ্গচূর করিয়া বাড়ী বসিয়াই লেখা যায়; তবে আর বাসা খরচ করিয়া, রাম রাবণ উভয়ের ভয়ে সশঙ্কিত হইয়া, প্রাণ হাতে করিয়া বসিয়া থাকিবার প্রয়োজন টা কি? তাহার উপর আগাগোড়া কথার ঠিক রাখিয়া পত্র লেখা খুব সহজ ব্যাপার মনে করিবেন না; কারণ নানা মুনির নানা মত। কাবুলীদের উপর অত্যাচারের কথা লইয়া যে প্রকার বাদ বিসম্বাদ হইতেছে তাহাতে না হাঁ যাহাই বলিব তাহাতেই সর্ব্বনাশ। দোহাই ধর্ম্মের আমি ইহার কিছুই জানি না, সাতাশী জন লোককে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে বলিলেও আমার স্বস্তি, সাত শ ফাঁসি হইয়াছে, তাহাতেও স্বস্তি, মোটে হয় নাই, তাও স্বস্তি। ভগবান্ রক্ষা করিয়াছেন যে কোনও পত্রেই আঁদ্‌রোঁকের কথা

লিখিয়া ফেলি নাই। তবে বুক ঠুকিয়া এই ফাঁসির সম্বন্ধে এক কথা আমি বলিতে পারি ; যাহাদের ফাঁসি হইয়াছে, ইংরেজ যদি এ যাত্রা কাবুলে শুভাগমন না করিতেন, তাহা হইলেও সে লোক কটার ফাঁসি হইত। নিতান্ত পক্ষে ফাঁসি না হইলেও তাহারা গলায় দড়ি দিয়াও মরিত। যাহার যা হা কপালে লেখা আছে, তাহা ঘটিবেই ঘটিবে ; মানুষ কেবল নিমিত্তের ভাগী। সমস্ত নিয়ত্ আর কিছুই নয়. নিয়ত্। তবে আর অত্যাচারের কথা ওঠে কিসে, তাই ত বুঝিতে পারি না। যুদ্ধ হইতেছে, সে নিয়তের লেখা, টাকা খরচ হইতেছে নিয়তের লেখা, লোক মরিতেছে, নিয়তের লেখা, ইহা যে না মানে, সে নেহাত অব্রাহ্মণ—সে খিরিষ্টান !

তৃতীয়তঃ শর্করকন্দ—(রাঙ্গা আলুকেও শর্করকন্দ বলে, এ তাহা নয়, জায়গার নাম)— রেলওয়ে প্রস্তুত ; সুতরাং এখন আর কাবুলে থাকিবার প্রয়োজন নাই, থাকাটা যুক্তিসিদ্ধও নয়। প্রয়োজন নাই, কেন না, আপনার যখন ইচ্ছা হইবে, তখনই এই রেলওয়ের কল্যাণে লোক গাড়ীতে হউক, মাল গাড়ীতে হউক, ডাক গাড়ীতে হউক, আমাকে বস্তাবন্ধী করিয়া আবার চালান দিতে পারিবেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে ফেরত গাড়ীতে খবর পাঠাইতে পারিব। কাবুলে থাকা যুক্তিসিদ্ধ নয়, কারণ লিটন বাহাদুর পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিয়াছেন যে

রুষিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেছে; তিনি রুষিয়ার নাম করেন নাই বটে, কিন্তু বলিয়াছেন "That despotic and aggressive military Power which has for years been steadily advancing to her (i. e. that of the Indian Empire) gates" "বহু বৎসর ব্যাপিয়া রোক করিয়া যে অত্যাচারপরায়ণ এবং আক্রমরত সৈনিকশক্তি ভারতসাম্রাজ্যের দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।" আমি ক্ষীণজীবী বাঙ্গালী, বলুন দেখি আমার কি পশ্চাৎসর হওয়া উচিত নহে। আর লিটন বাহাদুরের কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কাবুলে না আসিয়াও হয় ত কাণ্ড কারখানা অনেক দেখা যাইবে। হা ভগবান! আবার কি "চর্চ্চ চর্চ্চ উডেন্ চর্চ্চ" শিখিয়া টাকা রোজকার করিতে হইবে!

চতুর্থতঃ আমার মনে বড় দুঃখ হইয়াছে; সংবাদ পাইয়াছি যে কেহ কেহ আমার পত্রে যে সকল কথা লেখা থাকে তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে না, এমন কি কেহ কেহ আমার কাবুলে আসা পর্য্যন্ত বিশ্বাস করে না। এ দুঃখে আর কি কাবুলে থাকিতে ইচ্ছা করে, তবে জিজ্ঞাসা করি, যাহারা এ কথা বলে, তাহারা কি কাবুলে আসিয়া আমাকে না দেখিতে পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে? তবে বাপু কেন? সংবাদ পত্রের নীতি, রাজত্বের নীতি এ সকল বোঝো না অথচ গোল কর কেন?

বিদেশে অনেকেই যায়, আবার দেশেও ফিরিয়া

আইসে; কিন্তু শুদ্ধ সেই কথা বলিবার জন্য লম্বা চৌড়া একখানা পত্র লেখা ভালো দেখায় না। অন্ততঃ কেবল সেই কথা লিখিয়া ক্ষান্ত হওয়াটা কখনই ভালো নয়। সেই জন্য পথে যাহা দেখিয়াছি কি শুনিয়াছি, তাহার মধ্যে এক জায়গার বৃত্তান্ত এবার লেখা যাইতেছে। জায়গাটার নাম বৈদ্যনাথ ওরফে দেওঘর।

বেলা ৯ টার সময়ে বৈদ্যনাথের ষ্টেশনে ভ্রমণ ভঙ্গ করিলাম অর্থাৎ রেলের গাড়ী থেকে নামিলাম। মাটীতে পা দিতে না দিতে একজন আসিয়া আমাকে বাঁকা বাঁকা বাঙ্গালা কথা কহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'বাবু আপনি কি বৈদ্যনাথ দর্শন করিতে যাবেন?" আমি বলিলাম হাঁ; তৎক্ষণাৎ আর এক ব্যক্তি আসিয়া আবার ঐ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, তাহাকেও বলিলাম হাঁ; আরও লোক আসিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, সেই এক উত্তর পাইল। সকলেই আমাকে পাইবার জন্য ব্যগ্র। তখন আমার মনে হইল যে আমি যে পঞ্চানন্দের কাবুলস্থ সংবাদদাতা তাহা ইহারা জানিতে পারিয়াছে, নহিলে এত আদর যত্ন কেন? আবার মনে করিলাম তাহাই বা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে. তবে আমি যে একজন প্রতিভা-শালী ব্যক্তি তাহা নাকি আমার চেহারা দেখিলেই জানা যায় (আমি অনেক বার আর্শীতে আমার মুখ দেখিয়া এটা টের পাইয়াছি), তাই ইহারা বুঝিতে

পারিয়া এ প্রকার করিতেছে। তখন একটু চিত্তপ্রসাদ আপনা আপনি হইল, মনে হইল, যে ধরাতলে আমার জন্মগ্রহণ সার্থক, দুর্লভ মানব জন্মে আমার মত ব্যক্তি আরও দুর্লভ। আহ্লাদের সঙ্গে অহঙ্কার, সেই সঙ্গে একটু অভিমান মিশিয়া আমার হৃদয়-জলধি ওতপ্রোত হইতেছে, চক্ষুদ্বয়ের কোণ দিয়া জ্যোতিষ্কণা নির্গত হইতেছে, গ্রীবা একটু স্ফীত, একটু বঙ্কিম, হইয়াছে—এমন সময়ে এই ভাবে একবারে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখি—ও মা! গাড়ী হইতে যে নামিতেছে, তাহারই এত সম্মান, এইরূপ অভ্যর্থনা—কাহারই আদর কম নয়! কি অধঃপাত! কি দর্পহরণ! দুঃখ ত হইলই, লজ্জা হইল, একটু রাগও হইল। আর সেখানে না দাঁড়াইয়া ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া এক-খানি একা লইয়া দেওঘর যাত্রা করিলাম। পাল্কি পাওয়া যায়, রাগে লইলাম না; গরুর গাড়া পাওয়া যায় লজ্জায় লইতে পারিলাম না। মনের দুঃখে একায় চড়িয়া শরীরের সব কয় খানি হাড় কেন এক ঠাঁই হইবে না ইহাই ভাবিতে ভাবিতে যাইতে লাগিলাম।

মানুষের দুর্গতি আরম্ভ হইলে পদে পদে অপমান ঘটে; আমার অহঙ্কার, তাহার পরে লজ্জা হইয়াছে, এটা বোধ হয় সকলেই টের পাইয়াছিল; নতুবা একটা লোক আমার পাছে পাছে ঢাক বাজাইতে বাজাইতে দৌড়িবে কেন। তামাসা করিতেছি না, সত্য সত্যই ঢাক বাজাইতে বাজাইতে একজন

দৌড়িতেছিল। এই দুঃখের অবস্থায় একার গাড়োয়ান আমার কোলে বসিয়া রাধাশ্যামের প্রণয় সংগীত ধরিয়া দিল। লোকটা রসিক বটে, কিন্তু তাহার রসিকতায় আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। অথচ তাহার সঙ্গ ছাড়িবারও উপায় ছিল না। তখন এমনই ঘৃণা হইল যে সেখানে যদি দাঁড়াইতে আমার প্রবৃত্তি হইত, তাহা হইলে একা হইতে নামিয়া পৃথিবীকে দ্বিধা বিদীর্ণ হইতে বলিতাম, এবং বিদীর্ণ হইলে ধরণীগর্ভে প্রবেশ করিতাম। যাহা হউক নিরুপায় হইয়া সেই বিট্‌লে ঢাকীকে কিঞ্চিৎ ঘুস্‌ দিয়া ক্ষান্ত করিলাম এবং ফিরাইয়া দিলাম। অহঙ্কার অন্যায়, ইহা স্বীকার করি, কিন্তু এত লঘু পাপে এরূপ গুরুদণ্ডও অন্যায়, তাহার আর সন্দেহ নাই। এইরূপ বিতর্ক করিতে করিতে দেখিতে পাইলাম যে আমার চতুর্দ্দিকেই পাহাড়গুলা ঘাড় উঁচু করিয়া আমার দিকে রুক্ষ দৃষ্টি করিতেছে। পরে বুঝিয়াছি যে সেটা পাহাড়ের স্বভাব, আমার জন্য বিশেষ করিয়া কিছু করে নাই। কিন্তু তাহা বলিলে কি হয়, দুঃখের দশায় মানুষের স্বভাবতই এইরূপ মনে হয় যে সকলই বুঝি তাহাকে টিটকারা করিবার জন্য চলা ফেরা করিতেছে, তদ্ভিন্ন অন্য কোনও কর্ম্ম তাহার নাই।

দেওঘরে পৌঁছিলে তবে আমার দুঃখের অবসান হইল; আবার সুখ হইল। রবার্ট সাহেবই হউন,

প্রেশ কমিশনরই হউন আর লাট সাহেবই হউন, বোধ হয় কেহ আমার জন্য তারে খবর পাঠাইয়া থাকিবেন; কারণ দেওঘরের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী—ডিপুটী মেজেষ্টর, ডাক্তর, স্কুলের মাষ্টার প্রভৃতি—এবং যে সকল বাঙ্গালী সেখানে ভ্রমণ বা আব হাওয়া পরিবর্ত্তন করিতে আসিয়াছেন, সকলেই খুব ধুমধামের সহিত আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন; এবং আমার সুখ স্বচ্ছন্দতা সংসাধন বিষয়ে তৎপর হইলেন। বাস্তবিক মান্য ব্যক্তির উপযুক্ত সমাদর করা সকলেরই কর্ত্তব্য, বরং না করিলে প্রত্যবায় আছে। আমি এই সকল ব্যক্তির ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়াছি। যদিও ইঁহারা কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছিলেন মাত্র, তথাপি ইহাঁদের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিতে আমার দ্বিধা হইতেছে না।

দেওঘর অতি ক্ষুদ্র স্থান, কিন্তু দেখিলাম এই ছুধের বাটীতেই এক তুফান হইতেছে। তাহার বিবরণটা লিখি।

দেওঘরে কিঞ্চিৎ শিবমূর্ত্তি আছে; কিঞ্চিৎ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, শিবমূর্ত্তি বড় জোর আট আঙ্গুলের বেশী উঁচু নহে। কিন্তু এই আট আঙ্গুল শিবের পসার হাইকোর্টের বড় বড় কৌঁসুলী হইতে বেশী। শিবের মক্কেলদের কর্ম্মার্থী এবং যাত্রী বলে।

এখন গত শ্রীপঞ্চমীর সময়ে এখানে বিস্তর যাত্রী আসিয়াছিল; চিরদিনই আসিয়া থাকে, এবারও আসিয়াছিল। তবে অন্যান্য বৎসর থাকিবার স্থানের

ভাবনা থাকে না, এবারে থাকিবার স্থান পায় নাই। সরকার বাহাদুর হুকুম দিয়াছেন যে কাহার বাড়িতে কত যাত্রী থাকিতে পাইবে, সরকার হইতে তাহার নিয়ম করিয়া দেওয়া হইবে। আর কষ্ট স্বীকার করিয়া এই নিয়ম করিতে হইবে বলিয়া বাড়ীওয়ালাদের কাছে কিছু কিছু দাক্ষিণা পাইবেন বা লইবেন।

এরূপ নিয়ম করা অতি সঙ্গতই বলিতে হইবে; কারণ আইন বিরুদ্ধ জনতা নিবারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাত্রীদের সকলেরই উদ্দেশ্য এক, সুতরাং তাহাদের সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি না রাখিলেই শান্তি ভঙ্গ, এমন কি রাজ বিপ্লব পর্য্যন্ত হওয়া অসম্ভব নয়। কয়-জন লোক একত্র থাকিতে পারিবে, ইহার নিয়ম করিয়া দিলে এ আশঙ্কার অনেকটা প্রতীকার হইতে পারে। মনে করুন, যেন একটা স্থানে ৬ জন লোক থাকিবার অনুমতি আছে; এক দল যাত্রীর মধ্যে এক-জন পিতামহী, একজন মাতামহী, দুই মাসী, এক পিস্-তুতো ভগিনী, আর এক বৌ, আর সেই বৌয়ের কোলে আড়াই বৎসরের এক মেয়ে। এখন এই মেয়েটী নিয়মিত সংখ্যার উপর হওয়াতে তাহাকে স্থানান্তরে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেই এ দলের দ্বারা কোনও অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না কারণ তাহারা শিশুর চিন্তায় অন্যমনস্ক থাকিলেই রাজ্যের অনিষ্ট চেষ্টা করিবার অবকাশ পাইবে না।

দুঃখের বিষয় এই যে বৈদ্যনাথের রাজদ্রোহী

লোকগুলা এ নিয়মের বশীভূত হইতে স্বীকার করে নাই; এবং অনুমতি লইয়া বাসা দেওয়া দূরে থাকুক, অনুমতিও লয় নাই, বাসাও দেয় নাই। এখন শ্রীপঞ্চমীর সময়ে খুব বৃষ্টি হইয়াছিল, শীতও কিছু ভয়ানক গোছের হইয়াছিল। দুষ্ট প্রকৃতি লোক সকল এই সুযোগ পাইয়া সরকার বাহাদুরের আইনের জন্যও এ সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে এই বলিয়া তারে খবর, দরখাস্ত, ইত্যাদি নানারকমে এক হুল স্থূল আরম্ভ করিয়া দিল। ইহারা রটনা করিয়া দিল যে বিস্তর লোক শীত বৃষ্টিতে মারা গিয়াছে, সরকার বাহাদুর আইন করাতে এবং আশ্রয় না দেওয়াতে এইটী হইল।

সরকারের পক্ষ হইতে ডিপুটী বাবু বলেন যে যাত্রীদের আশ্রয় দেওয়া হইয়াছিল এবং কেহই মরে নাই। এখন এই মরা না মরার তদন্ত হইতেছে, এ দিকে আইনেতে কতকটা অপরাধী বিবেচনা করিয়া সরকার বাহাদুর আইনকে আপাততঃ সম্পণ্ড করিয়াছেন বলিয়া শোনা যাইতেছে।

তদন্তের ফল যাহাই হউক আমার বিবেচনায় যাত্রী মরা না মরা সম্বন্ধে উভয় পক্ষের কথাই প্রকৃত। এক জন লোকও ষোল আনা মরে নাই, ইহা হইতে পারে কিন্তু মনে করুন পাঁচশ লোক যদি আদমরা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আড়াইশ লোক মরিয়াছে বলিলে দোষ কি? তবে আইনের দোষ কিছুতেই দেওয়া যাইতে পারে না; কারণ শীত বৃষ্টি দৈবাধীন কার্য্য,

আইনের দ্বারা কিছু শীত বৃষ্টির সৃষ্টি হয় নাই, বরং আইনের উদ্দেশ্য অনুসারে কাজ হইলে বরং শীত বৃষ্টি নিবারণ হওয়াই উচিত ছিল।

যাহাই হউক আমার মত বাসা দেওয়াও আইন জারী থাকাই উচিত, এবং অনুমতির দক্ষিণায় যে টাকা উঠিবে তাহাতে কলিকাতায় একজন পাদ্রি বাড়াইয়া দিলেও হইবে কিম্বা ফিরিঙ্গীদের জন্য একটা বেখরচা পড়িবার স্কুল করিয়া দিলেও চলিবে।

আপনি এই প্রস্তাবের পোষকতা করিলেই আমি সুখী হইব; ইহা শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম ইতি।

কাবুলের সংবাদদাতার পত্র।

শ্রীচরণকমলেষু—

সেবকস্য দণ্ডবৎ প্রণামা নিবেদনঞ্চাদৌ প্রভুর শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এ ভৃত্যের ঐহিক পারত্রিক সকল মঙ্গল বিশেষ। পরে শ্রীচরণ সমীপ হইতে বিদায় হইয়া আসিয়া নির্ব্বিঘ্নে শ্রীযুক্ত প্রেস কমিশনর মহাশয়ের বাটীতে পৌঁছিলাম।

দরজায় অনেক ধাক্কা ধাক্কির পর তাঁহার ঝী আসিয়া খুলিয়া দিল; আমি তখন আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইয়া ক্ষণবিলম্বে শ্রীযুতের হজুরে হাজির হইলাম। ঝী আমাকে দেখাইয়া দিয়া কাপড় কাচিতে গেল। আপনি না কি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকল কথাই লিখিতে আদেশ করিয়াছিলেন, সেইজন্য এত বিস্তার।

হাইড্রোফোবিয়ার রোগী জল দেখিলে যেমন আঁতকিয়া উঠে, শ্রীযুক্ত আমাকে দেখিয়া প্রথমতঃ সেই রূপ শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; এবং আমি না বসা পর্য্যন্ত শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতে রহিলেন। তাহার পর আমাকে বসাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কি হেতু আগমন?

তখন তদীয় উপহার জন্য যে মর্ত্তমান ছড়াটী লইয়া গিয়াছিলাম তাহা দিয়া বলিলাম হে জন্ বুলের গৌরব, আমি কাবুলে যাইব। আমার অভিসন্ধি বুঝিবার জন্য শ্রীযুক্ত বলিলেন এই যে কাবুলে এত কারখানা করা যাইতেছে, ইহাতে তোমার মত কি? আমি বলিলাম,—চূড়ান্ত!

শ্রীযুক্ত। পত্রপ্রেরকদের সম্বন্ধে যে নিয়ম করা হইয়াছিল, তাহাতে তোমার মত কি?—সেই চূড়ান্ত।

শ্রীযুক্ত। লর্ড লিটন সম্বন্ধে তোমার মত কি?—চূড়ান্ত!

ভাঙ্গিয়া বলিতে আদেশ করিলে আমি নিবেদন করিলাম—কাবুলের কারখানা বিষয়ে লোকে বলে যে গবর্ণমেণ্ট অন্যায় অর্থ ব্যয় করিতেছেন, বিশেষতঃ দুর্ভিক্ষ নিবারণের টাকা দিয়া যুদ্ধ করাটা ভাল হয় নাই। আমার মতে তাহা নহে। ভারতবাসী নেমকহারাম; কেবল টাকার কথাই বোঝে, আরে বাপু, আগে অর্থাৎ ইংরেজের আমলের আগে চোর ডাকাইতে সর্ব্বস্ব লইত, তখন ত খবরের কাগজে হাঙ্গামা

কর নাই! টাকা কার? টাকা ত গবর্ণমেণ্টের। তদ্ভিন্ন দুর্ভিক্ষ নিবারণের টাকা দুর্ভিক্ষ নিবারণের কার্য্যেই ব্যয় হইতেছে। মধ্যে হইতে মাছের তেলে মাছ ভাজিয়া লওয়ার মত একটা চোহদ্দীর যদি পাকা বন্দোবস্ত হয়, তাহা হইলে সুখের বিষয় বলিতে হইবে। দুর্ভিক্ষ নিবারণও বন্ধ নাই, কারণ এই দুরন্ত শীতে যে সকল বেহারা ও কুলী, ও দেশীয় সৈন্য ইহলোক পরিত্যাগ করিতেছে—যুদ্ধে কেহ মরে নাই, মরিবে না, মরিলেও সে মরা, মরাই নয়—তাহাদের অভাব হেতু (কারণ যে মরে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে পেট এবং মুখ নিশ্চিত মরে ; এবং সে আনিয়া টানিয়া যে বাচ্ছা টাচ্ছাদের আহার যোগাইত তাহারাও মরে) চাউল এবং গোধূম অবশ্য শস্তা হইবে। তাহা হইলে বিলাতে রপ্তানি করিবার সুযোগ হইল। এ দিকে দুর্ভিক্ষও হইল না।

দ্বিতীয়তঃ পত্রপ্রেরকদের সম্বন্ধে নিয়ম গুলির ত কথাই নাই। যুদ্ধের সময়ে সত্য কথা প্রকাশ হইলে অনেক দোষ তাহা আমি অবগত আছি। বাঙ্গালা সংবাদপত্রে লিখিলে ইংরেজীতে তাহার অনুবাদ হয়, সেই অনুবাদ ডাকে ইউরোপে যায় ; সেখানে রুষিয়ার চক্ষে পড়িলে রুষীয় ভাষায় তাহার তর্জ্জমা হইতে পারে ; সেই তর্জ্জমা আসিয়ার মধ্যস্থলবর্ত্তী রুষিয়ার কর্ম্মচারিরা কাবুলের ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া অনায়াসে কাবুলাদিগকে জানাইতে পারে, তাহা হইলেই

ঝিজ্রাট। বিশেষতঃ সত্য কথা কোনও সময়েই ভাল বস্তু নহে। আমি ত প্রাণান্তেও বলি না।

তৃতীয়তঃ এই সমুদয় কার্য্য বা অন্য কোন কার্য্য সম্বন্ধেই লর্ড লিটনের দোষ নাই এবং হইতে পারে না; কারণ লর্ড লিটন এ সকলের বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানেন না, ইহা আমি বিশ্বাস করি। কেনই বা তিনি এ সকল জানিয়া মাথা ধরাইতে যাইবেন। ভারতবর্ষে নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা রকম আচার ব্যবহার। এ নকলের কিছুই লিটন বাহাদুরের জানিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তিনি এখানে আসিয়া যাহা করিবেন, বিলাতে বসিয়াও তাহাই করিতে পারিতেন, এ সহজ কথা যে পরকাল বোঝে না, তাহার ইহকাল পরকাল দুই নষ্ট। লিটন বাহাদুর কবি, বড় লোকের ছেলে, সৌখীন, তাই অভাগাদের দেখা দিয়া ভারতভূমি পবিত্র করিবার জন্য কষ্টকে কষ্ট, দূরদেশকে দূরদেশ না মনে করিয়া, কালাপানি পার হইয়া, লালপানি গণ্ডূষবৎ করিয়া ত্রিপ্রান্তর মাঠে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা কি আমি জানি না?

আমি আরও বলিয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু শ্রীযুক্ত বলিলেন—যথেষ্ট হইয়াছে, তোমার মত সারগ্রাহী লোক ভারতবর্ষে অল্প আছে, নহিলে, এত দুর্দ্দশা কেন?

তাহার পর আমি বলিলাম যে তবে অনুমতি দেন ত বিদায় হই, বেলা অনেক হইয়াছে, স্নানাহ্নিক করিতে হইবে।

সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীযুক্ত আমাকে এক খানি ছাড় চিঠি, এক খানি গলায় ঝুলাইবার তক্তি, এক যোড়া বুলু রঙের চসমা দিয়া বলিলেন, ইহা কদাচ ভুলিও না, কদাচ ফেলিও না। আমি বলিলাম, শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, ধ্যানে, ভোজনে, পানে, ইত্যাদি এই আমার সম্বল, এই আমার কম্বল, এই আমার অম্বল।

তথা হইতে গত কল্য কাবুলে পৌঁছিয়াছি। এখানে অতিশয় শীত, নীলবর্ণের বরফ পড়িতেছে, এবং লোকগুলা নীল বাঁদরের মত দেখাইতেছে। রবার্ট সাহেব আমাকে খুব ভাল বাসেন। অদ্য সকালে কাহন টাক ফাঁসি আমাকে দেখাইয়া বলিলেন যে, এই গুলি তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছি; গলা পাই, উত্তম; না পাই তাহাতে কিছু ফাঁসির অপমান হইবে না।

এই বলিয়া আমার হাতে ধরিয়া তাঁবুতে লইয়া গেলেন। সেখানে দেখি সাহেবদের খোরাক ফুরাইয়াছে; অন্য খোরাক না আসা পর্য্যন্ত ছোলার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে সাহেবদের কষ্ট হইতেছে। বাজে অর্থাৎ দেশী লোকদের নিমিত্ত ছোলায় কুলায় না বলিয়া অন্য প্রকার ব্যবস্থা হইয়াছে; তাহাদের এক প্রকার বর্দ্দাস্ত আছে বলিয়া কেহ দ্বিরুক্তি করিতেছে না।

এখানকার আর আর সমস্ত মঙ্গল। লড়াই যে প্রকার হইতেছে; কল্য তাহা সবিশেষ লিখিব।

শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

বিচার সংক্রান্ত কথা।

ভারতবর্ষে বিচারের দোকান আছে; এই সকল দোকানের প্রচলিত নাম আদালত। যে যেমন খরিদ-দার অর্থাৎ যে যেমন দর দেয়, সে তেমনি আদালত পায়। সেই জন্য আদালতের শ্রেণীবিভাগ আছে।

যাহার যৎসামান্য পুঁজি, অল্প গেলেই যাহার সর্ব্ব-নাশ হয়, সেই অতি অল্প বিচার পায়; যাহা পায় তাহারও এত দাম পড়ে যে, আসল গণ্ডা কিছুতেই পোষায় না।

বিচারের মহাজন রাজা; যাহাদের জিম্মায় বিচা-রের দোকান আছে, তাহাদের সম্বন্ধে রাজা এই নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, যে যেখানে বিচারের কাটতি বেশী সেই খানেই দোকানদারের যোগ্যতা অল্প, মজুরী অল্প; ঝোঁক অধিক। তাহাদের সুখের মধ্যে মাল বিক্রয় দেখাইতে পারিলেই, আর কোনও বিঘ্ন নাই। সেই জন্য তাহাদের মধ্যে যাহারা কার্য্যদক্ষ তাহারা এক ধার হইতে বিচার মাপিয়া যায়, তাহাতে যাহার ভাগ্যে যত পড়ুক, বিচার মাপিয়া দেওয়ার নাম ফয়সল্ করা।

বিচারে পক্ষপাতের নিষেধ আছে; সেই জন্য যাহার যেমন পয়সাখরচ এবং যোগাড়, তাহার তেমনি সুবিধা। যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে ওজন সূক্ষ্ম হইতে পারে, সেই সকল উপায় বাদ দিবার

ব্যবস্থা আছে। সে ব্যবস্থার নাম প্রমাণ বিষয়ক আইন।

যাহারা খুব বড় বিচারপতি, তাহারা ছোট বিচারের কেহ নহেন, ছোট অবিচারেরও কেহ নহেন।

ক্ষুদ্র বিচারক নানা রকম আছে; কিন্তু অধিকাংশই অপদার্থ; ইহারা ভাবিয়াই আকুল। কার্য্যকুশল বিচারক দুই চারি জন আছে; ইহাদের একটীর নমুনা অঙ্কিত করা যাইতেছে—

"আমাদের বিচক্ষণ মুন্সেফ বাবু,

বিদ্যাশিক্ষা সাঙ্গ করিবার পর এবং মুন্সেফি পদ পাইবার আগে, আমাদের বিচক্ষণ বাবু ওকালতীর চেষ্টা করিয়াছিলেন। ছয় মাসে নগদ সাত সিকা তাঁহার উপার্জ্জন হইয়াছিল, অথচ সেই ছয় মাসের মধ্যেই অন্য উকীলে মাসে মাসে হাজার টাকা পাইতেছে, বিচক্ষণ বাবু স্বচক্ষে ইহা দেখিয়াছিলেন। সেই অবধি উকীল জাতির উপর বিচক্ষণ বাবুর বিলক্ষণ ঘৃণা, উকীল দেখিলেই ইহাঁর কম্পজ্বরের জ্বালা অনুভব করিতে হয়। এখন যে ইনি পাকা, হাকিম ষোল আনা হজুর, তবু উকীল আসিলে বিচারাসন টলমল করিতে থাকে।

বিচক্ষণ বাবু ফয়সলে মূর্ত্তিমান। যে মকদ্দমার বাদী প্রতিবাদী, সাক্ষী সাবুদ উপস্থিত, তাহার দিন পরিবর্ত্তন করিয়া দেন; ফিরাইয়া ফিরাইয়া যে পর্য্যন্ত অনুপস্থিতি, অভাব বা ত্রুটী না ঘটে, সে পর্য্যন্ত তাঁহার

বিচার প্রত্যাশা করিবার অধিকার কাহারও নাই। সে অবস্থা ঘটিলেই সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম বিচারের সরু ধারে দাঁড়ি কাটিয়া, বিচক্ষণ বাবু কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দিয়া থাকেন।

বিচক্ষণ বাবুর বিশ্বাস যে বিদ্যায় তিনি অদ্বিতীয়, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির অগ্রজ; দৃঢ়সঙ্কল্প তাঁহার ভূষণ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে লোকে ইহা না বুঝিয়া তাঁহার এই গুণকে শুয়ারের গোঁ বলিয়া ব্যাখ্যা করে।

বিচক্ষণ বাবুর বিলক্ষণ উন্নতি; কারণ এ হাটে এমনি ব্যাপারীই দরকারি।

রাজস্ব সভার বিশেষ অধিবেশন।

উপস্থিত;—গ্রহাধিপতি মার্ত্তণ্ড—সভাপতি।

অষ্টগ্রহ গলগ্রহ—সভ্যগণ।

অতিরিক্ত মান্যবর পঞ্চানন্দ—

ধূমকেতুঃ।

তদনন্তর মান্যবর পঞ্চানন্দ, "কর-সংগ্রহের সদুপায়" বিষয়ক ব্যবস্থার পাণ্ডুলেখ্য উপস্থাপিত করিবার অনুমতি পাইবার জন্য গা তুলিলেন। তিনি বলিলেন যে, ভারতবর্ষ ব্রাহ্মণশাসিত দেশ; এখন যে এত হোটেল হইয়াছে, এত সা কোম্পানী একসায় একসা করিয়া তুলিয়াছে, তথাপি একথা বলা যায় না

যে, মূল হিন্দুয়ানির কোনও রকম ব্যাঘাত হইয়াছে। মূল কথা এই যে, হিন্দুধর্ম্ম ইস্পাতের মত,—ঢালো, পেটো, যাহা ইচ্ছা করিয়া লও, আদত জিনিস বজায় থাকিবেই থাকিবে। অনেকের মুখে মান্যবর সভ্যগণ শুনিয়া থাকিবেন যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য ধর্ম্মের সহিত ভারতবর্ষের সভ্যতা এবং ভারতবর্ষের ধর্ম্মের সংঘর্ষণ হইয়া এক তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে। তিনি (মান্যবর পঞ্চানন্দ) স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন যে, তুমুল কাণ্ড হইয়াছে, তিনি ইহাও স্বীকার করিতে বিমুখ নহেন যে, এক বিকট সংঘর্ষণ হইয়াছে! কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসা করেন, সে সংঘর্ষণের ফল কি? হিন্দুর ধর্ম্ম তিনি ইস্পাতের সহিত তুলনা করিয়াছেন, এখানেও সে উপমা খাটিতেছে—ঘর্ষণে ইস্পাতের চাকচিক্য বাড়িয়াছে, ধার বাড়িয়াছে, অতএব যিনিই যত করুন, হিন্দুর মনে হিন্দুর ধর্ম্মের যে এক অপূর্ব্ব দ্রাঢ়িমা আছে, তাহা কিছুতেই বিলুপ্ত হইবার নহে।

যদি তাহা হইল, তিনি (মান্যবর পঞ্চানন্দ) এই ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের একটা ফলের প্রতি, মান্যবর সভ্যগণের বিশেষ মনোযোগ আমন্ত্রণ করিতে যাচ্ঞা করেন। সে ফল এই যে, কর্ত্তৃত্ব থাকিলেই কুঁড়েমির টানটা স্বভাবতই বেশী বেশী হইয়া ওঠে; কুঁড়েমি হইলেই বিনাশ্রমে বাবুগিরি করিবার প্রবৃত্তিটাও আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই প্রবৃত্তির বলে

ব্রাহ্মণদিগের এত ব্রহ্মোত্তর জমী। মান্যবর সভ্যগণ অবগত থাকিতে পারেন যে, ব্রহ্মোত্তর জমীর জন্য কাহাকেও সিকি পয়সা কর দিতে হয় না, এবং এই কুদৃষ্টান্তের ফলে, যাহাদের ব্রহ্মোত্তর নাই, তাহারাও কোনও না কোনও প্রকারে, নিষ্কর ভূমির মালিক হইবার চেষ্টা করে, বা উপায় বিধান করে। তিনি (মান্যবর পঞ্চানন্দ) যে কথার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছিলেন, তাহা এই;—নিষ্করের দিকে ভারতবাসীর অতিশয় টান। জ্বর বিকারের রোগীর জল-টানের মত ইহা অস্বাভাবিক এবং দুষ্ট হইলেও ইহার দমন করা দুঃসাধ্য। কিন্তু বিজ্ঞ চিকিৎসক এ প্রকার অবস্থায় কি উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন? কেন, তিনি পিপাসা শান্তি হয়, সঙ্গে সঙ্গে রোগের প্রতীকারও হয়, এই রূপ শীতল সেব্য শীতলগুণ-বিশিষ্ট ঔষধই প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

অতএব ভারতবাসী যখন কর দিতে কাতর, অথচ পক্ষান্তরে কর না পাইলে রাজত্ব করা না করা তুল্য, তখন করসংগ্রহ বিষয়ে উপরিউক্ত বিজ্ঞ চিকিৎসকের পন্থা অবলম্বন করাই যে শ্রেয়ঃকল্প, ইহা কোন মান্যবর সভ্য অস্বীকার করিবেন? ভারতবর্ষে সাক্ষাৎ করের প্রবর্ত্তনা না করিয়া পাকত যাহাতে কার্য্যোদ্ধার হয়, তাহাই করা যে যুক্তি সঙ্গত, তদ্বিষয়ে কে না একমত হইবেন?

এই তত্ত্ব কথার প্রতি আস্থা প্রদর্শন না করা

গতিকেই, এপর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যত কর বসান বা চালান হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকেই এবং সকল গুলিতেই অসন্তোষ, এবং ফুঁফিয়ে ক্রন্দন করা পর্য্যন্ত পরিমাণে উদ্‌ভূত হইয়াছে ইহা অবিসম্বাদিত সত্য। তিনি (মান্যবর পঞ্চানন্দ) এক জন নম্র স্বভাবের পরামর্শ-দাতা, সামান্য উপগ্রহ হইলেও অদ্য কর-সংগ্রহের এক সদুপায় উপন্যস্ত করিতে মনঃস্থ করিয়াছেন। তাহার ভরসা আছে যে, তিনি এত কাল মনে মনে তোলপাড় করিয়া যে প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, মান্যবর সভ্যগণ তাহার প্রতি অবহেলা করিবেন না, সম্যক্ বিচার না করিয়া তাহা তাকে, তুলিয়া রাখিবেন না।

এই সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া তিনি প্রস্তাব করিতেছেন যে, "রাজনৈতিক আন্দোলন-কর" নামে এক কর-সংগ্রহ বিষয়ে তিনি যে পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা এক নির্ব্বাচিত সমিতিতে বিবেচিত এবং কৃতমন্তব্য হইবার জন্য অর্পিত হউক। যাঁহারা রাজনৈতিক বিষয় আশয়ের জন্য সভা করেন, বক্তৃতা করেন, সময় নাই অসময় নাই বৃহৎ বৃহৎ আবেদন করেন এবং স্থানাস্থানের বিচার না করিয়া পাঠাইয়া দেন, তাঁহাদেরই জন্য এই করের সৃষ্টি। ইহার সুবিধা এই যে, কোন ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়ের এ কর দিতে হইবে না—সভা সকল এই কর দিবে। যে সামান্য ব্যক্তি নিজ যৎসামান্য অথচ যথাসর্ব্বস্ব

দুষ্টের হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য রাজদ্বারে দণ্ডায়মান হয়, সে কর দিয়া থাকে ;—দেশের উপকারের জন্য দশটা বড় বড় লোক, হাজার হাজার মধ্যবিত্ত লোকের সহিত একত্র হইয়া কিছু ভিক্ষা করিলে বা প্রাপ্য আদায় করিতে ইচ্ছা করিলে, কর দিতে কুণ্ঠিত হইবে, একথা অগ্রাহ্য। বরং এই সকল সভা, আবেদনকারীর নিকট কর না লওয়াতেই পক্ষপাত জাজ্বল্যমান ; তাহার উপর মান্যবর সভ্যগণ যদি ভাবিয়া দেখেন যে, যাহার নিকট ইহা প্রার্থী সে শঠ নয় বঞ্চক নয়—রাজ্যেশ্বর রাজা—তাহা হইলে এই পক্ষপাতের আয়তন কিরূপ বিভীষণ হইয়া উঠে!

সামান্য বিচারপ্রার্থীর নিকট যে কর লওয়া যায় তাহার উদ্দেশ্য এই যে, অমূলক অভিযোগ দ্বারা সমাজ উপপ্লুত না হয়। প্রসঙ্গাধীন প্রস্তাবে যাহার উপলক্ষে সমাজ ওতপ্রোত হইয়া যাইতেছে—সেই উদ্দেশ্য কি দশগুণ বলের সহিত কার্য্য করিতেছে না ?

সর্ব্বোপরি এই প্রকার কর সংস্থাপিত হইলে বৃথা বাগাড়ম্বর দ্বারা কল্পিত অভাব প্রদর্শন করিয়া যে অসন্তোষের সূত্রপাত এবং পরিপোষণ হইতেছে, তাহাও নিবারিত হইবে। যদি বাঙ্গালা মুদ্রণের শাসন করা প্রয়োজনীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে—এবং মান্যবর সভ্যগণ অবগত আছেন যে, তাহা হইয়াছে—তাহা হইলে ইহার যে কেবল শাসন আবশ্যক তাহা নহে, প্রত্যুত অনুমতি-মূল্যও আদায় করা অবশ্য

কর্ত্তব্য। তিনি (মান্যবর পঞ্চানন্দ) ইচ্ছা করেন যে, এই অবস্থা বিধিবদ্ধ হইলে মুদ্রণশাসনের ব্যবস্থার এক অংশ স্বরূপ পঠিত হউক।

কাহাকে কি অবস্থায় কি নিয়মে কত পরিমাণে কর দিতে হইবে, পাণ্ডুলেখ্যে তাহার সবিস্তার উল্লেখ করা হইয়াছে। পরিশেষে তিনি (মান্যবর পঞ্চানন্দ) আশা করেন যে, এই কর সংস্থাপিত হইলে অন্য লাইসেন, এমন কি আবকারি লইসেন পর্য্যন্ত উঠাইয়া দেওয়া চলিবে, অথচ তাহাতে রাজকোষের সঙ্কোচ হইবে না।

শ্রীমান ভক্তবৃন্দ কল্যানবরেষু।

বৎসগণ, তোমরা নরলোক, অল্পেই ব্যাকুল হইয়া ওঠো। দেবচরিত্র বুঝিতে পারো না, দেবতার লীলা তোমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির আয়ত্ত নয়, সেই জন্য 'সবুরে মেওয়া ফলে'—এই স্বর্গীয় বাক্যের সম্মান ইহলোকে তোমরা রক্ষা করিতে পারো না। তবে আমার দুর্ম্মতি; নহিলে এখানে সাধে সাধে আবির্ভূত হইলাম কেন?—সেই দুর্ম্মতির ফলভোগ স্বরূপ তোমাদের কাছে আমিও কৈফিয়ত দিতেছি।

আমি কিছুদিন অবধি তোমাদিগকে দেখা দিতে যে, এত শৈথিল্য করিতেছি, তাহার অনেক কারণ আছে। যখন আমি প্রথম অবতীর্ণ হই, তখন আমার স্বর্গীয় বুদ্ধিতে এই ধারণা ছিল, যে নর-

লোকেও বুঝি প্রকৃতি দেবলোকেরই মত। কিন্তু অল্পদিনেই বুঝিতে পারিলাম যে, দেবচিত্তেও ভ্রমের স্থান হইয়া থাকে। অতএব নরলোক ভালো মত চিনিবার জন্য এত দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে-ছিলাম, তাই এত বিলম্ব। দুঃখিত হইও না, বিলম্বে তোমাদের ক্ষতি নাই, লাভই আছে। এতদিন কি দেখিলাম, এত বিলম্বে তোমাদের কি লাভ, সবিশেষ জানাইতেছি, অবধান করো।

সাধারণত একটা কথা জানা গিয়াছে যে, এ পাপ পৃথিবীতে অনেক পাষণ্ডের দোষে অনেক ভক্ত মারা পড়ে। তুমি আমার পরম ভক্ত, সেবক যথা সময়ে ভক্তিপূর্ব্বক ষোড়শোপচারে আমার পূজা দিয়া, হা দেব হা দেব, করিয়া আমাকে ডাকাডাকি করিতেছ ; এ দিকে তখন আমি এক পাষণ্ডের ছলনায়, স্তোক স্তবে আত্মবিস্মৃত হইয়া, সেই পাষণ্ডের আড্ডায় ত্বরিতানন্দের আশ্বাসে বসিয়া আছি। তাহার দোষে তুমি ফাঁকি পড়িলে ; শিরে করাঘাত করিয়া আমাকে ভোলানাথ ভাবিয়া, মনে মনে গালি দিতে লাগিলে। বৎস, দোষ আমার নহে, দোষ তোমাদের কপালের, আর দোষ এই দুষ্ট সংসর্গের। সকলে যদি ন্যায্য সময়ে ন্যায্য গণ্ডা ফেলিয়া দেয়, তাহা হইলে তোমাদিগকে কষ্ট পাইতে হয় না, আমাকেও কথা সহিতে হয় না। আমি ত করিবই, তোমরাও পাষণ্ড দলনের চেষ্টায় বদ্ধ পরিকর হও।

আর একটা সাধারণ কথা টের পাইয়াছি। নর-লোক যে বানর লোকের সাক্ষাৎ বংশধর এটা অনেকেরই এখন বিশ্বাস হওয়াতে, ব্যবহারটা তদনুরূপ হইয়া উঠিয়াছে। তোমাদের মধ্যে যিনি কথক, তিনি উচ্চ কাষ্ঠাসনে তোমাদের অবোধগম্য কিচির মিচিরে তোমাদিগকে উপদেশাদি দিয়া থাকেন, তোমরাও দাঁত দেখিয়াই পরম তুষ্ট। লাভে হইতে এই দাঁড়াইয়াছে যে, আমারদের ভাষার অনেকটাও তোমাদের বুদ্ধির ও জ্ঞানের অতীত হইয়া পড়িয়াছে। প্রমাণ তোমাদের সাধারণী, তোমাদের সঞ্জীবনী। আর সাধারণীর কথা, আজি কাল তোমাদের বেদ। বৎসগণ, ভ্রান্তি পরিহার করো, ধৈর্য্য শিক্ষা করো, ব্যস্ত হইও না। তোমাদেরই পূর্ব্বপুরুষেরা সাত শ বৎসর পাষাণে বুক বাঁধিয়া ধৈর্য্য দেখাইয়া আসিতে-ছেন, তোমরা আর মাসেক দুমাস পারিবে না? ধিক্ তোমাদিগকে!

সাধারণ কথা আর একটা বলিয়াই বিশেষ কথার অবতারণা করা যাইতেছে। যাহারা ভাবুক, তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে যে, পঞ্চানন্দের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। বাস্তবিক বাঙ্গালা কথার ইজ্জত নাই, বাঙ্গালীর সময় জ্ঞান নাই, বঙ্গে প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা নাই, এই সকল তত্ত্বের প্রমাণ দেওয়াই পঞ্চানন্দের উদ্দেশ্য। তাহা সফল হইয়াছে। পঞ্চানন্দ সকলে আদর করিয়া পড়িতে চাহে না, পঞ্চ পড়ে, চারইয়ারি পড়ে, বাঁদরামি

করে,—কিন্তু বাঙ্গালা কথার তিনকুলে কেহ নাই, পঞ্চানন্দের আদর নাই। সুতরাং বাঙ্গালীর সময় জ্ঞান নাই, ইংলিসম্যানের দাম অগ্রিম সকলেই দেয়, কিন্তু বঙ্গদর্শন, বান্ধবের কথা কাহারও মনে থাকে না, কাজে কাজেই আষাঢ়ীয় দর্শন ভাদ্রে মাসেও তাহা পড়িতে পারেন না। আর প্রতিজ্ঞায় যে দৃঢ়তা নাই, তাহা বলিতে হইবে কেন? যে দিন স্বয়ং পঞ্চানন্দ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, সময়ে সময়ে নিয়মিতরূপে তিনি দেখা দিবেন, সেই দিনই লোকের দিব্য জ্ঞান হওয়া উচিত ছিল। বৎসগণ অদ্য হম্বা রবে রোদন করিলে কি হইবে?

যাহা হউক, বিশেষ কথা এখন বলা যাউক; আমি এত দিন কি দেখিলাম, কি শুনিলাম, কি বুঝিলাম, একে একে সে সব বলা যাউক। তোমরা ফল ধরিয়া উপবিষ্ট হও।

বিশেষ কথা।

১। রাজদর্শন।

যখন সংসার দেখিতে আমার বাসনা হইল, তখন উপর হইতে তলা পর্য্যন্ত দেখাই কর্ত্তব্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলাম। নরলোকে রাজ এবং রাজপদই সর্ব্বোচ্চ জানিয়া আগে রাজদর্শনটাই উচিত বিবেচনা করিলাম।

কিন্তু গোড়াতেই গোল বাধিল;—ভারতে রাজা কে? যাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে যাই, সেই এত

মহারাজ, রাজা, রাজড়ার খবর দেয়, যে ভাবনায় দেব-প্লীহাও চমকিয়া ওঠে। ভূমিশূন্য মহারাজ, হিন্দু বিধবা অপেক্ষা হীনতর, কারণ জীবনের কিয়ৎকালের নিমিত্ত বেতনভোগী রাজা—এসব এত অধিক যে, আমি অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম, মনে হইল তবে বুঝি ভূভারতে সত্য রাজা নাই, সমস্তই অরাজক।

শেষে অনেক অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিলাম যে, আমার ধারণাটা নিতান্ত অমূলক নয়; এ মুলুকে আসল রাজা নাই, রাজপ্রতিনিধি মাত্র আছে। তথাস্তু! আমি সেই প্রতিনিধি হইতেই আরম্ভ করিয়া দিলাম।

প্রতিনিধি দেখিতে কলিকাতায় গেলাম। প্রকাণ্ড অট্টালিকা, ততোধিক প্রকাণ্ড ফটক, যেন হা করিয়া জগৎ সংসার গ্রাস করিতে উদ্যত; আর সেই ফটকে ব্রহ্মাস্ত্র সজ্জিত যমদূত-স্বরূপ প্রহরী! দেখিয়া একটু ভয় হইল, ভাবনাও হইল। এ প্রহরী কেন? তবে কি রাজায় প্রজায় মৈত্রভাব নাই?

সাহস করিয়া প্রহরী পুরুষের সম্মুখবর্ত্তী হইলাম, সেই প্রান্তর প্রতিম প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলাম। প্রহরী বোধ হয় কোন আত্মীয়ের প্রতীক্ষা করিতেছিল; আমাকে তদবস্থ দেখিয়া শ্বশুর-কুল-সম্ভূত কুটুম্ব বিশ্বাসে সম্বোধন করিল। আমি অবাক্! প্রহরী নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিল, স্বীয় দক্ষিণ হস্ত আমার গলদেশে সুবিন্যস্ত করিয়া ভক্তিভাবে 'যাও'

বলিয়া আমাকে বহির্দেশের পথ দেখাইয়া দিল। আমি ভাবগতিক না বুঝিতে পারিয়া, তাহার ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়া প্রবেশবাঞ্ছা পরিত্যাগ করিলাম। পরে জানিতে পারিয়াছি, যে প্রতিনিধি তৎকালে তথায় উপস্থিত ছিলেন না। প্রহরীর চিত্তটা খুব ভক্তিশীল বটে! কিন্তু নীচ বৃত্তি অবলম্বন করাতে তাহার হস্ত কিঞ্চিৎ কঠোরতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার জন্য আমার দুঃখ হইল।

যাহা হউক, একবার সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকা কাণ্ডের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করা আবশ্যক বোধ হওয়াতে দেখা গেল যে, আলয়ের বাসযোগ্যতা যত হউক, না হউক, বংশ বাহুল্য কিঞ্চিৎ ভীতিজনক! সরল, সরুঞ্চী, স্থূল, সূক্ষ্ম, প্রভৃতি বিবিধ প্রকার বাঁশ প্রতিনিধিকে নিয়ত যেন—

"মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর" স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য নিয়ত বিরাজ করিতেছে। প্রতিনিধিত্ব বড় সুখের চাকরি বলিয়া আমার বোধ হইল না।

বুঝিয়া সুঝিয়া স্থির করিলাম যে, এমন অসুখী প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা না করাই ভাল; জিজ্ঞাসাবাদে টের পাইয়াছি যে, প্রতিনিধির ভাবনা চিন্তা ত আছেই, তাহার উপর তিনি দশচক্রে নিপতিত পুতুল, নিজে হাত পা নাড়িয়া কাজ করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই, আর নিরেট অজ্ঞতা নিবন্ধন মুখফোঁড় হইয়া কিছু করিতে তাঁহার প্রবৃত্তিও হয় না। যাহার পরমায়ু

পাঁচ বৎসর মাত্র, সে বেচারা করিবে কি? দেখিতে দেখিতে, হৃদয়ের তরঙ্গ উঠিতে না উঠিতে, তাঁহার হিন্দু রমণীর বাল্যবৈধব্য উপস্থিত হয়।

অতএব এখন প্রতিনিধির সঙ্গে আমার আলাপ করাই হইল না।

ADRESS TO THE JURY.

অর্থাৎ

জুরি সম্বোধন।

জুরীমহাশয়গণ,

একটা লোক গুরুতর অপরাধ করিয়াছে কি না, এই কথার বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিবার জন্য আপনারা এখানে আসিয়াছেন। আপনাদের বিদ্যার জোরে কিম্বা বুদ্ধির ফেরে যে, এই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, তাহা নয়; জজ সাহেব আইন বুঝাইয়া দিবেন, সাক্ষীরা ঘটনার কথা বলিবে, উকীলেরা সাক্ষীদের পেটের কথা টানিয়া বাহির করিবেন, কি সম্ভব কি অসম্ভব তাহা প্রাণপণ করিয়া দেখাইয়া দিবেন, তারপর আপনারা বলিবেন, হাঁ এ লোকটা দোষী বটে, কিম্বা বলিবেন, না এ দোষী নয়।

কাজটা সহজ, কিন্তু যত সহজ মনে করিয়া, জুরিপতি মহাশয়! এই আদালতের কড়ি বরগাগুলি বারংবার গনণা করিতে আপনার গোটা মনটা সংলগ্ন করিয়াছেন, তত সহজ নহে। অনুগ্রহ করিয়া আমার কথা কয়টা শুনুন, একবার আমা পানে চাহিয়া দেখুন।

আইনকর্ত্তারা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া দিয়াছেন যে, আপনাদিগকে ডাকিয়া, আপনাদের অভিপ্রায় জানিয়া তবে জজ সাহেব এক ব্যক্তিকে দোষী বা নির্দ্দোষ ঠিক করিবেন। আইনে লেখা আছে বলিয়াই জজ সাহেব আপনাদিগকে ডাকিয়াছেন। আর, আপনারা না কি দেশের অবস্থা জানেন, লোকের ব্যবহার জানেন, কেন লোকে মিথ্যা বলে, কি হইলেই বা সত্য বলে, এ সকল জানেন; সেই জন্যই আইনকর্ত্তারা বলিয়াছেন যে, অপরাধের বিচার করিতে আপনাদের থাকা চাই।

তা, জুরী মহাশয়! টানা পাখার বাতাস ঠাণ্ডা লাগে কি না, মিষ্ট লাগে কি না, এ বাতাস গায়ে লাগাইয়া চক্ষু বুজিয়া থাকিলে ঘুম আসে কি না, ইহা দেখিবার জন্য ত আপনাকে এখানে আনা হয় নাই; তবে কোন্ বিবেচনায়, ও জুরী মহাশয়!—জুরী মহাশয়! বলুন দেখি, তবে কোন বিবেচনায় চক্ষু লজ্জার মাথা খাইয়া আপনি নাসিকা ধ্বনি করিতেছেন?

সাক্ষীরা বলিয়াছে, যে আসামী ফরিয়াদীর গাঁয়ে দলাদলি আছে। এ দেশে, দলাদলি থাকিলে, এক দলের লোক অন্য দলের লোককে জব্দ করিবার জন্য হুঁকা বারণ, নাপিত বন্ধ, কুৎসা রটনা, মিথ্যা প্রবঞ্চনা, মারামারি—কত কি যে করে, তাহা আপনারা জানেন। এই মোকদ্দমায় সাক্ষীদের কথা শুনিয়া, সেই দলাদলির ব্যাপারটা মনে করিয়া, আপনাদিগকে স্থির করিতে হইবে যে আসামী সত্য সত্যই দোষ করিয়াছে, না কি

সেই দলাদলির দরুন, মিছামিছি ইহার নাম করিয়া দিয়া সাক্ষীরা আপন দলের বাহাদুরি বজায় রাখিতে আসিয়াছে ?

না জুরী মহাশয় ! আপনি যদি দাদার বোলে মোর বোল, জুরীপতির যে অভিপ্রায় হইবে, আমি তাহাতেই সায় দিব, কিম্বা জজ সাহেব যে দিকে চলাইয়া দিবেন আমি সেই দিকে চলিব, এইরূপ মনে করিয়া ঘরকন্নার কথা ভাবেন, আমার কথায় মন না দেন, তাহা হইলে চলিবে না। আপনাদের প্রত্যেককে নিজের মত স্থির করিতে হইবে। সঙের মতন বসিয়া থাকিবার জন্য আপনি এখানে আইসেন নাই, আদালতে তামাসা দেখিবার জন্যও আইসেন নাই। কোথায় কে হাঁচিল, ঐ লোকটা কেন হাসিয়া উঠিল, বাহিরে ঠক ঠক করিয়া কিসের শব্দ হইতেছে—এ সব কথা মনে করিলে চলিবে না। এ মোকদ্দমাটা হইয়া যাউক, তাহার পর দশ দিন উপরি উপরি আদালতে আসিয়া আপনি মজা দেখিয়া যাইবেন, আমি তাহাতে কিছুই বলিব না। কিন্তু আজি অমন হাঁ করিয়া থাকিলে আমি মারা যাই। একটা লোকের ধন, প্রাণ মানের কথায় অমন করিয়া তুড়ি দিয়া হাই তুলিলে অধর্ম্ম হয়। অধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা ত জানেন ?

প্রথমত, যখন আসামীকে মেজেষ্টরের কাছে ধরিয়া আনা হয়,তখন সে কবুল করিয়াছিল , এখন বলিতেছে যে, পুলীশের মারের চোটে সে কবুল করিয়াছিল, কিন্তু

দোহাই ধর্ম্ম, সে এ, পাপে ছিল না। একবার কবুল করিয়ালিছল বলিয়াই যদি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন, তাহা হইলে সে কাগজ আপনাদিগকে এখানে না আনিলেও ক্ষতি হইত না তবু যে আপনাদিগকে বসাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহাতেই বুঝিতে পারিবেন, যে একবার করিলেই সব গোল চুকিয়া যায না।

একটা ঘটনা হইলে তাহার কিনারা করিতে না পারিলে পুলিশের বদনাম হয়, তাহা আপনারা জানেন; কাজে কাজেই এক প্রকার দায়গ্রস্ত হইয়া কখনও কখনও পুলিশ যে হাড়িকাঠে যেটা সেটা একটাকে টানিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে ইহা অসম্ভব নয়; আর সে রকমে টানিয়া ফেলিতে হইলেই, হয় ভুটো ফাঁকি ফুঁকি দিয়া ভুলাইতে হইবে, নয় যেখানে মন্ত্র তন্ত্র ছিটা ফোটায় কাজ না হইল, সেখানে গুঁতো গাতাটা বসাইতে হইবে। এখন আপনাদিগকে বলিতে হইবে যে, এ লোকটার একবার কি গুঁতোর দরুন, না কি লোকটা বড় ধাম্মিক, পাপ করিয়া আর স্থির থাকিতে পারে নাই, সব বলিয়া ফেলিয়াছে, সেই দরুন?

বেলা যাইতেছে, তাহা আমি জানি, এই তিন দিন আপনার দোকান বন্ধ, আর আপনার তাঁত কামাই, তাহাও আমি জানি। কিন্তু যখন আসিয়াছেন, হলফ করিয়া বিচার করিতে বসিয়াছেন, তখন বিরক্ত হইলে চলিবে কেন? হলফের অর্থ আপনি জানেন না, দেখা

পড়ার মধ্যে আপনি চেরা সই করিয়া দুইখান তমঃসুক লিখিয়া দিয়াছিলেন, এ সকল কথা আমি জানিলেই বা কি হইবে? এখন যে আপনারা বিচারক; যেমন করিয়াই হউক, আপনাদিগকে বিচার করিতেই হইবে। আমি ব্রাহ্মণ, লেখা পড়া জানি, বড় লোক,—যথার্থ; আমি আপনাকে আপনি আপনি বলিলে আপনার মন ধড় ফড় করে, প্রাণে কষ্ট হয়, তাহাও জানি। কিন্তু আপনি এখানে দোনা ময়রা নহেন, আপনিও গুপে মুদী নহেন, এখন আপনাদের আসনকে আমিও সম্মান করিতে পারি, তাহাতে দোষ হয় না। আপনারা বোকা, মূর্খ, কাণ্ডজ্ঞান রহিত হইলেও এখন দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। অতএব যথাসাধ্য আমার কথা কয়টা শুনিয়া, মন দিয়া বুঝিয়া,আপনারা সকলে বলুন, এ ব্যক্তি দোষী কি নির্দ্দোষ? ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেই আপনারা ধর্ম্মে খালাশ; তাহাতে যদি অবিচার হয়, সে পাপের ফল ভুগিবেন—যিনি আপনাদের ডাকেন, তিনি।

না, আপনাদের কাছে বকাবকি করা, কেবল ঝকমারি। আপনাদের কর্ম্মভোগ, তাই এখানে আসিতে হয়; আর, আমারও পোড়া কপাল, তাই কথা কহিতে হয়। আমি ক্ষান্ত হইলাম, আপনারাও বাড়ী যান।

শিবপুরের ব্যাপার।

"দোষ কারুর নয় গো মা,
আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা" !

১। ওকালতিতে আর সুখ নাই, দুবেলা দুমুটো অন্ন যোটা ভার হইয়াছে, চাকরির উমেদার এত বেশি যে, একটা কর্ম্মের শুধু প্রত্যাশাতেই তিন পুরুষ কাটাইয়া দেওয়া যায়, ঘরেঘরে ব্যারাম হইতেছে বটে, কিন্তু চিকিৎসক পায়ে পায়ে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, প্রাণের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া কতকগুলি ভদ্র-সন্তান শিবপুরের কালেজ কারখানায় মিস্ত্রীর কাজ শিখিতে গিয়াছে; চাকরি যোটে, উত্তম, না যোটে, গতর খাটিয়ে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারিবে, ভদ্র সন্তানদের এই আশ্বাস! কিন্তু কপাল এমনি, যে কাজ শিখিতে গিয়া বেচারাদের দুর্গতির আর বাকী রহিল না; জেলের কয়েদীও খাইতে শুইতে স্থান পায়, কুলী মজুরও উহারই মধ্যে একটু স্বাধীন ভাবে আপনার শরীরের ভাব, মনের গতি বুঝিয়া চলিতে পায়! কিন্তু এই ভাল মানুষের ছেলেদের কষ্টের আর পরিসীমা ছিল না। বাস করিতে হইবে, তা এমনি ঘর যে, "ডিঃ গুপ্ত" সঙ্গে না লইলে প্রবেশ করিবার যো নাই, রাঁধিয়া বাড়িয়া পোড়া পেটে চারটি দিতে হইবে, তা উনন পাতিবার স্থান নাই, কোদাল

ধরিয়া অষ্টাঙ্গ ঘামাইয়া একটু খেলা ধূলার জায়গা করিবে, তা সেই দিকেই তার উপর দিয়াই বোঝাই গাড়ি যাইবার হুকুম হইবে ; স্নান পানের জল লইবে, তা ফিরিঙ্গি ছেলেরা ঘাটে নামিতে দিবে না।

বড় কষ্টের সময়েও লোকে অন্যমনস্ক হইয়া একটু আমোদের কাজ করে ; পুত্রশোকবিহ্বলা রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে একটী তৃণ কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করে, সে এক প্রকার আমোদ বৈ কি ? শ্রীশচন্দ্র ভদ্রসন্তান—এ দুঃখের সময়ে আনমনে একটু আমোদ করিতে গেল; কারখানার এক খানা ছেনির কল নাড়া চাড়া করিতে লাগিল। একে অন্যমনস্ক, তায় কপাল মন্দ, শ্রীশ-চন্দ্রের হাতে সেই ছেনিটা ভাঙ্গিয়া গেল।

ফল কি হইল সকলেই জানে। কারখানার ছোট কর্ত্তা ফোরেকর্স সাহেব ভদ্রলোকের ছেলের ঘাড়ে ধরিয়া ধাক্কাধাক্কি, বেঞ্চের উপর যষ্টিতাড়না, এক মহাব্যাপার আরম্ভ করিয়া দিলেন। মানুষে কত সয় বলো ? সমস্ত ভদ্রসন্তান যুটিয়া একপরামর্শ হইয়া শিক্ষাবিভাগের সর্ব্বেসর্ব্বা সাহেব বাহাদুরের কাছে দরখাস্ত করিল ; কাঁদিয়া জানাইল যে, এ অপমান, এত অত্যাচার ভদ্রলোকের প্রাণে কিছুতেই সহ্য হয় না। ফোরেকর্স সাহেবকে না তাড়াইলে ভদ্রসন্তান আর মান লইয়া, আস্ত হাড় রাখিয়া আর তিষ্ঠিতে পারে না।

বাস্তবিক, এত দুঃখ সংসারে কাহারও হয় নাই ;

ভদ্রসন্তানের উপর এত অত্যাচার কুত্রাপি হয় নাই। দরখাস্ত করা অতি চমৎকার কাজ হইয়াছিল।

* * *

২। ছেলে পিলে পড়িতে আইসে, শিখিতে আইসে। তাহারা যদি বাবু হয়, উদ্ধত হয়, উচ্ছৃঙ্খল হয়, তাহা হইলে তাহাদেরই পরকাল নষ্ট। শিক্ষার স্থানে পদগৌরব, বংশগৌরব, মান মর্য্যাদার কথা লইয়া ব্যস্ত থাকিতে গেলে, শিক্ষা ত হয়ই না, শিক্ষকের পক্ষে আপন মান বাঁচাইয়া চলা ভার হয়।

শিবপুরে যাহারা শিখিতে গিয়াছিল, তাহারা গরবেই অধীর—আমরা ভদ্রসন্তান। আপনি ভদ্র কি না সেদিকে দৃষ্টি নাই, শুধুই ভদ্রসন্তান। তা ভদ্রসন্তান হইলেই কি রান্না ঘরে আঁস্তাকুড় করিতে হয়? সাহেব ফিরিঙ্গির ছেলেরা কি খায়, কেমন শোয়, দিবা রাত্রি তাই ভাবিতে হয়? আর শেখা গেল, পড়া গেল, কেবল তাদের হিংসাই করিতে হয়? তাহার উপর ভদ্রসন্তান হইলেই কি আপন কাজ ফেলিয়া, যেখানে সেখানে গিয়া, কল ভাঙ্গিয়া, জিনিশ পত্র নষ্ট করিয়া অশিষ্টতা, অবাধ্যতা দেখাইতে হয়? শিক্ষার মূল গুরুভক্তি, তা গেল চুলোয়। কেবল বাবুয়ানা হইল না, শিক্ষক কেন রুক্ষ কথা বলিল কিম্বা গায়ে হাত তুলিল, কেবল এই জপ তপ ধ্যান জ্ঞান। এমন ছেলেদের কি বিদ্যা হয়? অত বড় মানুষ, অত ভদ্রলোকের ছেলে বলিয়া গুমর করিতে গেলে এখানে

চলে না। এমন অশান্ত দুর্দ্দান্ত ছেলেদের ঘাড়ে ধরিয়া বাহির করিয়া দেওয়াই উচিত। ফোরেকর্স সাহেব রীতিমত কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা এবং দৃঢ়মতির প্রশংসা করা উচিত।

* * *

৩। এই কাণ্ডে যদি কাহারও কষ্ট হইয়া থাকে, কি অপমান হইয়া থাকে, তাহা হইলে একা শ্রীশচন্দ্রেরই হইয়াছিল। কিন্তু সব ছেলে যোট পাট করিয়া—এ শিক্ষক থাকিলে শিখিব না, এ দোষের প্রায়শ্চিত্ত না হইলে কারখানায় থাকিব না—এ সব কোন্ দেশী কথা? বিদ্যালয় ত গুরুমারা বিদ্যার জন্য হয় নাই। কিসে মান, কিসে অপমান, কি ভালো, কি মন্দ, এই সমস্ত শিখাইবার জন্যই হইয়াছে। ছেলেরা যদি এত লায়েকই হইয়া থাকে, কর্ত্তার উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার কি কলম চালাইবার অধিকারই যদি তাহাদের জন্মিয়া থাকে, তবে আর বিদ্যালয়ে কেন? অবশ্য মুনিরও ভ্রম হয়, গুরুরও দোষ হয়, কিন্তু যার ক্ষতি, সেই কেন বিনয় করিয়া দুঃখ প্রকাশ করুক না? সব কজনে জমাতবস্ত হইয়া বর্গীর দলের মত হাঙ্গামা করা কেন? এ যে বড় কুশিক্ষা, ভয়ানক কুদৃষ্টান্ত। এখন থেকে ষড়যন্ত্র করা অভ্যাস করিলে কালে এ সকল ছেলে যে কি ভয়ানকই হইয়া উঠিবে, তাহা বলিবার কথা নয়, অনুমান করা যাইতে পারে।

কিন্তু শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ মহামনা ক্রফট

সাহেব যেমন সদ্বিবেচক, তেমনি দয়ালু, যেমন দৃঢ় শাসক, তেমনি সুনীতির পোষক। ছেলেদের এক-বারে দূর করিয়া দেওয়া সঙ্গত হইলেও, তাহাদিগকে নিজ দোষ দেখিবার সময় দিলেন। আপন আপন ভ্রম বুঝিয়া যৎসামান্য অর্থ দণ্ড দিয়া তাহারা পুনর্ব্বার স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, এই তাঁহার সদয় ইচ্ছা। ইহা-তেও দুর্ম্মতিদের চৈতন্য হইল না। না হইল, ত মরো। শিখিলে নিজের উপকার, না শিখিলে নিজে-রই অপকার। শিক্ষা ফলে বড় মানুষ হইয়া কেহ ত অধ্যক্ষ-প্রবরকে সম্পত্তির অংশ দিবে না। সুতরাং ক্রফ্‌ট সাহেবের বিবেচনার গুণবাদ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহার দয়াগুণের কথা সহস্র মুখে বর্ণিতব্য!

* * *

৪। যিনি যাহা বলুন, আমাদের গবর্ণমেণ্টের মত রাজ্যপ্রণালী, এত প্রজানুরাগ, এরূপ সমদর্শিতা বড় একটা সুলভ পদার্থ নহে। রাজ্য-বিপ্লব নয়, শাসন সম্বন্ধীয় কোনও প্রকাণ্ড সমস্যা নয়, এই বিশাল রাজ্য মধ্যে কোথায় এক গুরুমহাশয়ের সঙ্গে ছাত্রদের বিরোধ হইয়াছে, বিভাগের কর্ত্তা তাহার একটা যেমন হউক নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন, তথাপি এই সামান্য উপলক্ষে রাজপ্রতিনিধি বঙ্গের ছোট লাট ইডেন সাহেব মধ্যস্থতা করিতে অগ্রসর হইলেন। এ ব্যাপারে রাজ্যের একটা সামান্য মশাও স্থান ভ্রষ্ট হয় নাই,

অথচ রাজ্যেশ্বর স্বীয় সর্ব্বতোদর্শন দেখাইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন! এমন কোনও কথা নাই যে, সকল বিষয়েই লাট সাহেবকে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে, এমন কাহারও সাধ্য নাই যে, লাট বাহাদুর অমুক প্রসঙ্গে নিজ মত প্রকাশ করিলেন না বলিয়া কেহ তাঁহার কেশস্পর্শ করিতে পারে। কিন্তু তথাপি এই সামান্য বিষয়ের জন্য লাট সাহেবের মাথাব্যথা। তাই যে যা হউক একটা করিয়া দেওয়া, তাহা নয়। প্রকাশ্য গেজেটে, প্রকাশ্য ভাবে উভয় পক্ষের দোষ গুণের সমালোচনা করিয়া লাট সাহেব যেন সাধারণ প্রজাবর্গ সমীপে নিজের কৈফিয়ৎ দিতে, সাফাই করিতে বসিয়াছেন। কি সাহস! কি সদাশয়তা! কি লোকানুরাগ! কি সার্ব্বজনীনতা! যিনি ইঙ্গিত করিলে মাথার পর মাথা গড়াগড়ি যায়, যিনি নিশ্বাস ফেলিলে ফাঁসির আসামী খালাস পায়,—তাঁহার এই সৌজন্য। এমন সুখের কথা, এত আনন্দের কথা আর কি হইতে পারে? রাম রাজ্যের যদি কোনও অর্থ থাকে, তাহা হইলে এই সেই রাম রাজ্য; রাজপদে বসিয়া কেহ যদি গৌরব করিতে পারে, তাহা হইলে ইডেন সাহেবের গৌরব অপরিসীম এবং অপরিমেয়।

* * *

৫। পঞ্চানন্দ দেখাইলেন যে, সকলেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম যথাবিহিতরূপে প্রশংসার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। এত হুলস্থূল হইয়া গেল, অথচ কাহারই

তিল মাত্র দোষ নাই। তবু যে এত গোলযোগ, এত মনোভঙ্গ, এত দীর্ঘ নিশ্বাস, এত দন্তনিপীড়ন এই এক ব্যাপার লইয়া হইল, সেই জন্য মনের আনন্দে সচ্চিদানন্দ পঞ্চানন্দ বলিতেছেন

"দোষ কারু নয় গো মা,
কেবল স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।"

* * *

দুষ্টের দমন বিধি।

[ফৌজদারি কার্য্যবিধির প্রস্তাবিত সংশোধনে পর্য্যাপ্ত প্রতীকার হইবে না বিবেচনায় পঞ্চানন্দের পাণ্ডুলিপি]

আইন হইবার কথা।

যেহেতু নানা রকম চেষ্টা করিয়াও ইংরেজ বাহাদুর দুরাত্মা, পাপিষ্ঠ ভারতবাসীর দমন ও শাসন করিয়া উঠিতে অক্ষম হওয়ায়, অপরাধের বিচারপ্রণালী সংশোধন না করিলে, রাজত্ব অচল এবং প্রজাত্ব প্রবল হইতেছে, এমতে নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।

অনুষ্ঠান, রদ, ব্যাপ্তি এবং পরিভাষার কথা।

১ দফা। সংক্ষেপ নামের কথা।

এই আইন দফা রফার আইন নামে অভিহিত হইতে পারিবে।

বাপ্তির কথা।

এ আইন যেখানে চলিবে না, সেখানে নিত্য অরাজক হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

আরম্ভের কথা।

এবং এ আইন জারি হইবার পূর্ব্বেই চলিতে থাকিবে।

২ দফা। রদের কথা।

যে সকল আইন এবং বিধান হাকিমানের মনোমত নহে বা হইবে না, তাহা এতদ্দ্বারা রদ করা গেল।

৩ দফা। দায়ের মোকদ্দমার কথা।

যে সকল মোকদ্দমা দায়ের আছে, তাহার নিষ্পত্তি এই আইন মতে হইবে।

৪ দফা। পরিভাষার কথা।

এই আইনে নিম্নলিখিত শব্দ এবং ভাষার নিম্নলিখিত মত অর্থ হইবে, অন্যথা হইবে না।

তদারকের কথা।

লোককে ধরিয়া চালান দিবার জন্য পুলিশ যে কোনও কার্য্য করিবে, তাহার নাম তদারক। তদারক শব্দে হাতকড়ি দেওয়াও বুঝাইবে।

বিচারের কথা।

লোককে সাজা দিবার জন্য আদালতে যে সকল অনুবন্ধ হইবে, তাহার নাম বিচার। বিচার শব্দে খালাস বুঝাইবে না।

ফৌজদারি আদালতের কথা।

জজ, মেজেষ্টর প্রভৃতি যে কেহ সাজা দিবে, আদালত শব্দে তাহাকেই বুঝাইবে।

হাইকোর্টের কথা।

যে আদালতে আসামীর উকীল, কৌন্সুলি চড়টা, চাপড়টা অভাবে মুখ থাবড়া খাইবে, হাইকোর্ট শব্দে তাহাকেই বুঝাইবে।

ফৌজদারি আদালতের কথা।

৫ দফা। আদালতের রকমারির কথা।

হাইকোর্ট ছাড়া, আরও দুই প্রকার আদালত থাকিবে, যথা ;—

(ক) মেজেষ্টরি ;

(খ) সেশন।

৬ দফা। যে আদালতে বিচার হইবে তাহার কথা।

মেজেষ্টর ইচ্ছা করিলে সকল মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন। মেজেষ্টরের অপ্রবৃত্তি বা আলস্য হইলে, কোনও কোনও মোকদ্দমার বিচার সেশনে হইতে পারিবে।

গৌরাঙ্গের মোকদ্দমার কথা।

৭ দফা। গৌরাঙ্গের কথা।

গৌরাঙ্গ শব্দে নেটিব নহে, এরূপ কোট পেণ্টুলান পরা ব্যক্তিকে বুঝাইবে। এরূপ ব্যক্তির উপরের সাত পুরুষ এবং নীচের সাত পুরুষের মধ্যে কেহ

কস্মিন কালে সমুদ্র না দেখিয়া থাকিলেও তাহারা সকলেই গৌরাঙ্গ হইবে।

৮ দফা। গৌরাঙ্গের মোকদ্দমা করিবার অধিকারের কথা।

স্বয়ং গৌরাঙ্গ না হইলে কেহ গৌরাঙ্গের মোকদ্দমা করিতে পারিবে না।

৯ দফা। গৌরাঙ্গ তলব করিবার কথা।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি স্বয়ং অভিযোগ করিলে গৌরাঙ্গের নামে ভদ্রোচিত নিমন্ত্রণ পত্র বাহির হইতে পারিবে। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি মরা কিম্বা অক্ষম হওয়া কি অন্য কোনও ওজর করিয়া কোনও ব্যক্তির প্রতিনিধি স্বরূপে গৌরাঙ্গের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারিবে না, এবং তদ্রূপ অভিযোগ গ্রাহ্য বা তন্মূলে নিমন্ত্রণ পত্র বাহির হইবে না।

১০ দফা। গৌরাঙ্গের বিচারের কথা।

গৌরাঙ্গের অনভিপ্রায়ে কেহ তাহাকে সাজা দিতে পারিবে না।

পুলিশের কথা।

১১ দফা। পুলিশকে সাহায্য করিবার কথা।

মনুষ্য মাত্রেই ধর্ম্ম, অর্থ, লোকবল এবং বাহুবল দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়ে পুলিশের সাহায্য করিতে বাধ্য, যথা,

(ক) শান্তিভঙ্গ করণ বিষয়ে।

(খ) একরার এবং চোরামাল বাহির করা বিষয়ে।

(গ) সাধারণত তদারক বিষয়ে।

১২ দফা। বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করিবার কথা।

পুলিশ যেখানে খুশি, যাকে খুশি, বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করিতে পারিবে।

১৩ দফা। গৃহ প্রবেশের কথা।

আসামী থাকা জানিতে পারিলে, কিম্বা থাকা সন্দেহ হইলে, কিম্বা থাকিবার সম্ভাবনা থাকিলে, কিম্বা থাকিলেও থাকিতে পারে এরূপ অনুমান হইলে, কিম্বা যদিই ভুল ভ্রান্তি ক্রমে থাকিয়া যায়, এরূপ বোধ হইলে ঘর ভাঙ্গিতে, দুয়ার ভাঙ্গিতে, জানালা ভাঙ্গিতে, আসবাব ভাঙ্গিতে, মান ভাঙ্গিতে, সম্ভ্রম ভাঙ্গিতে, বৈঠকখানায়, সেৎখানায়, ঠাকুর ঘরে কিম্বা অন্দরে অবারিত দ্বারে প্রবেশ করিতে পুলিশ ইচ্ছামত পারিবে।

১৪ দফা। অন্দরের বিশেষ কথা।

অন্দরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে বাড়ীর এবং পাড়ার বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষবর্গকে হাতকড়ি দিয়া, কিম্বা অন্য প্রকারে বন্ধন করিয়া পাহারায় পুলিশ রাখিতে পারিবে, এবং আবশ্যক বোধ করিলে জোরপূর্ব্বক কুলকামিনীকে বাহির করিতে পারিবে।

১৫ দফা। তদারকের কথা।

তদারক করিবার সময়ে পুলিশ শ্যামচাঁদের সাহায্যে আসামীকে একরার করাইতে এবং চোরা মালের কিনারা করিতে পারিবে।

১৬ দফা। পুলিশের তদারকি কাগজের কথা।

তদারকের প্রণালী সম্বন্ধে পুলিস কোনও কথা লিখিয়া রাখিতে পারিবে না, এবং লিখিয়া রাখিলেও তাহা পুলিশের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারিবে না।

বিচারের পূর্ব্বানুষ্ঠানের কথা।

১৭ দফা। উকীল মোক্তারের কথা।

আদালতের অনুমতি ব্যতীত আসামী উকীল মোক্তার দিতে বা দিবার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে পারিবে না। তদ্রূপ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে, তাহা অপরাধ স্বীকারের তুল্য গণ্য হইবে।

১৮ দফা। উকীল মোক্তারের অধিকারের কথা।

কোনও উকীল মোক্তার আসামীর পক্ষ হইতে সাক্ষীর জেরা কিম্বা সওয়াল জবাব করিতে পারিবে না। হাকিমানের অনুমতি লইয়া সাক্ষীগোপালের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে।

মেজেষ্টরের বিচারের কথা।

১৯ দফা। ধরাধরি বিচারের কথা।

মেজেষ্টরের ইচ্ছা হইলে ধীরে সুস্থে, লিখিত পঠিত পূর্ব্বক ধরাধরি বিচার হইতে পারিবে।

২০। সরাসরি বিচারের কথা।

ঘোঁড়দৌড় করিতে করিতে কিম্বা পথে ঘাটে বেড়াইতে বেড়াইতে তাড়াতাড়ি করিয়া বিনা লেখা

পড়ায় মেজেষ্টর স্বেচ্ছাক্রমে আসামীর সরাসরি বিচার করিতে পারিবেন।

সেশনে বিচারের কথা।

২১ দফা। জুরি ও আসেসরের কথা।

সেশনে প্রত্যেক মোকদ্দমার জুরি অথবা আসেসরের সাহায্যে আসামীর বিচার হইবে।

জুরি হইলে, অন্যূন তিন জন এবং আসেসর অন্যূন এক জন নির্ব্বাচিত হইবে।

উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী, বাহিরের মুটে মজুর, ঘোড়ার গাড়ীর কোচমান কিম্বা গোরুর গাড়ীর গাড়োয়ান হইতে জুরি অথবা আসেসর মনোনীত হইতে পারিবে। তাহাতেও পরিমিত সংখ্যা পূর্ণ না হইলে, বলদ ধরিয়া বসান চলিবে।

২২ দফা। আসেসর ও জুরির সাহায্যে বিচারের কথা।

জুরি অথবা আসেসরের সহিত এক মত হইয়া সেশনের হাকিম আসামীকে সাজা দিতে পারিবেন। জুরি অথবা আসেসর বা তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ আসামীকে নির্দ্দোষ প্রকাশ করিলে, তাহাদিগকে অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ব্বক সেশনের হাকিম একাএক আসামীকে সাজা দিতে পারিবেন।

আপীলের কথা।

২৩ দফা। আসামীর আপীলের কথা।

সরাসরি ভিন্ন ধরাধরি এবং সেশনের বিচারের অসম্মতিতে আসামী আপীল করিতে পারিবে।

২৪ দফা। আসামীর আপীলের ফলের কথা।

আসামী আপীল করিলে জরিমানার স্থলে মেয়াদ এবং মেয়াদের স্থলে ফাঁসি এবং সকল স্থলেই সাজা বৃদ্ধি হইতে পারিবে।

২৫ দফা। সরকারের আপীলের কথা।

আসামীর প্রতি অবিচার অর্থাৎ আসামী খালাস পাইলে সরকার হইতে আসামীর মৃত্যুর পূর্ব্বে যে সময়ে হউক আপীল হইতে পারিবে।

২৬ দফা। সরকারের আপীলের ফলের কথা।

সরকারের আপীলে আসামীর সাজা হইতে পারিবে এবং লঘু পাপে গুরু দণ্ড হইতে পারিবে, এবং আসামীর আপীলের যে ফল তাহাও ফলিতে পারিবে।

হাইকোর্টের কথা।

২৭ দফা। পুনরালোচনার কথা।

অবিচার অর্থাৎ আসামী খালাস হইলে হাইকোর্ট খোদ এক্তেয়ারে অথবা পরের কথায় সমস্ত মোকদ্দমার নথি তলব দিয়া দেখিতে পারিবেন, এবং খালাস দিলে অরাজক হইতে পারে বলিয়া সুবিচার করিতে পারিবেন।

সরকারের কথা।

২৮ দফা। আইন স্থগিত করিবার কথা।

এই আইনের বিধান মতে কার্য্য হইলেও দুষ্টের যথোচিত শাসন হইতেছে না, এমত বোধ করিলে

সরকার বাহাদুর কিছু কাল বা চিরকালের জন্য আইন স্থগিত করিতে পারিবেন।

২৯ দফা। আইন স্থগিত হইলে উচিত কথা।

তদ্রূপ আইন স্থগিত করিয়া দেশের চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক দেশবাসীগণকে জাঙ্গিয়া পরাইয়া সরকার বাহাদুর তৈল নিষ্পেষণে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

সরকারের ব্যয় সংক্ষেপ।

মহকুমার ডিপুটী মাজিষ্ট্রেরের নাজির সরকারি লেফাফা বন্ধ করিতে গিয়া দেখিলেন, গালাবাতি ফুরাইয়াছে। এক পয়সার গালাবাতি বাজার থেকে কিনে আনিবার জন্য ডিপুটী বাবুর অনুমতি চাহিলেন।

ডিপুটী বাবু আশ্চর্য্য বোধ করিলেন; সংবৎসরের জন্য যাহা কিছু দরকার গত ১লা এপ্রেল হিসাব করিয়া আনান হইয়াছিল; অদ্য ৩০শে মার্চ্চ গালাবাতির অভাব হইল, ইহা অন্যায় কথা। ডিপুটী বাবু নাজিরের কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। লেফাফা বন্ধ হইল না, পড়িয়া রহিল।

নাজিরের কৈফিয়তে প্রকাশ যে আফিশের কাগজ কলম, ছুরী কাঁচি, গালা বাতি, ফিতে কালি প্রভৃতি সরঞ্জামের বরাদ্দ কেরাণীখানা হইতে হইয়া থাকে; কমি বেশীর কথা কেরাণীখানার আমলারাই বলিতে পারেন। নাজির যাহা পায়, তাহার হিসাব প্রস্তুত

আছে, সে হিসাব সমঝাইয়া দিতে নাজিরও প্রস্তুত আছে। কৈফিয়তের উপর হুকুম হইল, হেড কেরাণী তিন দিবসের মধ্যে গালাবাতির জবাবদিহি করে। লেফাফা রওয়ানা করা বন্ধ রহিল।

হেড কেরাণীর রিপোর্ট পাঠে ডিপুটী বাবু অবগত হইলেন যে, গত বারের বরাদ্দ করিবার সময়ে যিনি কেরাণী ছিলেন, তিনি পেন্সন লইয়া বিদায় পাইয়াছেন; হাল কেরাণী বিশেষ হাল অবগত নহেন। অগত্যা ডিপুটী বাবু এক দিনের খরচের আন্দাজ গালাবাতির জন্য জেলার মাজিষ্ট্রের কাছে রুবকারি পাঠাইলেন। মূল লেফাফা বন্ধ করা সংপ্রতি বন্ধ রহিল।

জেলার মেজেষ্টরের সেরেস্তাদার খুব হুঁশিয়ার, পাকা আমলা। রুবকারি পৌঁছিবা মাত্র, মেজেষ্টরকে দেখাইয়া দিলেন, গালাবাতির ইণ্ডেণ্ট ফারম্ অনুসারে হয় নাই; সাহেব ক্ষিপ্রবুদ্ধি, তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া লইলেন, এবং হুকুম দিলেন যে উচিত সংশোধন জন্য ডিপুটী বাবুর সদনে রুবকারি ওয়াপশ পাঠান যায়।

কি জন্য বেমামুলী রুবকারি দ্বারা গালাবাতির ইণ্ডেণ্ট পাঠান হইয়াছিল এবং কেনই বা ফারম মোতাবেক পাঠান হয় নাই, ডিপুটী বাবু তাহার তদন্তে লিপ্ত হইলেন। জানা গেল যে ফারমের অভাব হওয়াতে রুবকারি পাঠান হইয়াছিল। সুতরাং ফারমের জন্য ইণ্ডেণ্ট গেল।

ক্রমে ফারম আসিয়া পৌঁছিলে, ফারম পূরণ করিয়া

পুনর্ব্বার মেজেষ্টরের সদনে প্রেরণ করা হইল। মেজে-ষ্টর তাহা কমিশ্যনরীতে পাঠাইয়া দিলেন। কমিশ্যনর সাহেব মঞ্জুর করিয়া কাগজ কলমের সরবরাহকারী আফিশে চালান দিলেন। বজেটের অতিরিক্ত খরচ মঞ্জুর করাইবার জন্য একৌণ্টেণ্ট জেনেরেলের অভি-প্রায় লইয়া সরবরাহকার সাহেব যথাক্রমে, যথানিয়মে, যথাসময়ে, পুলিন্দা করিয়া বাঙ্গী ডাকে আধখানা গালাবাতি কমিশ্যনরের জরিয়তে, মেজেষ্টরের মার-ফতে মহকুমার ডিপুটী বাবুর কাছে পাঠাইয়া দিলেন।

ডিপুটী বাবু দস্তুর মত রসিদ পাঠাইয়া দিয়া আপন সেরেস্তায় গালাবাতি জমা করাইয়া লেফাফা বন্ধ করি-বার জন্য হুকুম জারি করিলেন। সাত মাস ঊনিশ দিন পরে লেফাফা যথাস্থানে যথাপথে চলিয়া গেল। লেফাফার ভিতরে বাজার দরের রিপোর্ট ছিল; নবে-ম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের কলিকাতা গেজেটে প্রচ-লিত বাজার দর ছাপা হইল।

দপ্তরি এক দিন নাজির বাবুর তামাক সাজিয়া দেয় নাই। লেফাফা বন্ধ করিবার সময়ে গালাবাতি গলিয়া তিন ফোঁটা মাটীতে পড়িয়াছিল; নাজির সেই দোষ ধরিয়া দপ্তরির বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিয়া দিলেন। রিপোর্ট ক্রমে ক্রমে উচ্চতম কর্ত্তৃপক্ষের গোচর হও-য়াতে এক সরকুলার বাহির হইয়াছে; তাহার মর্ম্ম এই যে দপ্তরিরা গাফিলি করিয়া সরকারের যেরূপ লোকসান করে, তাহাতে দপ্তরির পদ উঠাইয়া দেওয়া

উচিত, না কি দপ্তরিদের কার্য্য পরীক্ষা জন্য ষ্টেশনরি আফিশে একটা নূতন সেরেস্তা খুলিয়া সরবরাহকার সাহেবের মাসিক দুই শত টাকা বেতন বাড়াইয়া দিয়া এ বিষয়ের ব্যবস্থা করা উচিত, প্রত্যেক জেলার এবং প্রত্যেক মহকুমার হাকিমান, এ সম্বন্ধে আপন আপন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন।

ইতিমধ্যে প্রধান প্রধান ভারতবর্ষীয় সভার কমিটী বসিয়া ফসেট সাহেবের দ্বারা ব্যয় সংক্ষেপের জন্য বিলাতের মহাসভায় একটা হাঙ্গামা করিবার প্রস্তাব হইতেছে।

এখনও লেখালেখি ফুরায় নাই, সুতরাং কোনও কথার মীমাংসাও হয় নাই। সেই এক পয়সার গালা-বাতির গোল মিটিলে প্রেশ কমিশ্যনর আফিশ হইতে পঞ্চানন্দ অবশ্যই সংবাদ পাইবেন, এই আশ্বাসে সম্প্রতি পাঠকবর্গকে নিশ্বাস ফেলিবার অবসর দেওয়া গেল।

লেজ! লেজ!! লেজ!!!

অতি উৎকৃষ্ট, সুগোল, সুদীর্ঘ, সুগঠন বিস্তর লেজ আমাদের দোকানে বিক্রয় জন্য প্রস্তুত আছে। লেজগুলি আসল বিলাতি কারিকরের তৈয়ারি এবং জাহাজে করিয়া খাস চালানে আমদানি করা হইয়াছে। এই লেজগুলি এত উত্তম এবং উপাদেয় যে সঙ্গতি

থাকিলে আমরা নিজেই ব্যবহার করিতাম। যাহাদের পয়সা নাই, যাহারা আমাদের মত নিরন্ন, তাহাদের কিনিবার চেষ্টা করা বৃথা। লেজগুলি সুলভ, কিন্তু কেবল রোজগেরের পক্ষে।

লেজগুলি বিশেষ উপকারজনক। তুমি যখন মাতাল হইয়া আড়ষ্টভাবে পড়িয়া থাকো, চক্ষুতে পলক নাই, মুখে বচন নাই, হাত পায়ে স্পন্দন নাই, তখন এই লেজ আপনা আপনি, তোমার বিনা চেষ্টায়, বিনা পরিশ্রমে, মুখের কাছে ইতস্তত সঞ্চালিত হইয়া মাছি তাড়াইতে থাকিবে। টাকাওয়ালা বাবু হও, তো লেজ লও।

তুমি এক প্রকাণ্ড বক্তা, মস্ত বুদ্ধিমান উকীল, সওয়াল জবাব করিতেছ, হাত পা কতই নাড়িতেছ, এমন সময়ে মোক্তার আপন কার্দানি দেখাইবার জন্য তোমার কাণের কাছে ভিন্ ভিন্ করিয়া তোমার স্রোত ভঙ্গ করিয়া দিতেছে, তোমাকে বিরক্ত করিতেছে। থামাও তাহাকে, লেজের এক বাড়ি মারিয়া। লও লেজ, ভালো উকিলের বিশেষ দরকারি। অনেক কাজে লাগিবে।

তুমি হাকিম, এজলাসে বসিয়া উত্তর পূর্ব্ব জ্ঞান হারাইয়া কি মাথা মুণ্ড করিতেছ, তাহার ঠিকানা নাই। যে টুকু বুদ্ধিশুদ্ধি গোড়ায় ছিল, তাহা মেজাজের গরমে গলিয়া গিয়াছে। শেষে আপীল আদালত উপরওয়ালার ভয়ে উবিয়া গিয়াছে। আমি

তোমার বন্ধু মানুষ, কাছে বসিয়া আছি, অথচ সময় মতে উপদেশ দিয়া তোমার উপকার করিতে পারিতেছি না, প্রকাশ্যভাবে তখন কিছু বলিয়া দিলে তোমার আত্মগরিমায় জখম লাগে, বাজে লোকের কাছে তুমি অপদস্থ হও। একটী লেজ থাকিলে কোনও ভয় থাকিবে না, সময়শিরে লেজ টিপিয়া দিয়া তোমার বন্ধু পথভ্রম হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবেন। যদি সুবোধ হও, বুদ্ধির পরিচয় দিতে চাও, দশের কাছে আপন গুণপনার যথার্থ পরিচয় দিতে চাও, তাহা হইলে লেজ লও! লেজ থাকিলে আর ভুল হইবে না।

তুমি ময়লাফেলা কমিসনর, অমুক কমিটির মেম্বর, রায়ে রায় দিয়া সাহেবের মন যোগানো, আর পাড়াপড়সীকে ভোগানো তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। সাহেবের হাতে যদি তোমার লেজটী দিয়া রাখিতে পারো, তাহা হইলে তুমি নির্ভয়, নিঃসংশয়, নিশ্চিন্ত। সাহেব যেই লেজ ধরিয়া টান দিবেন, অমনি তুমি সাহেবের দিকে ঝুঁকিবে। যদি এ সম্মানের পদ রাখিতে চাও, একটী লেজ লও। লেজ নহিলে তোমার কিছুতেই চলিবে না।

তুমি বড়লোক, চিহ্নিত ব্যক্তি; কত সভা সমিতিতে কত দরবারে তোমার নিমন্ত্রণ হয়। লেজ থাকিলে অনেক জায়গায় অপ্রতিভ হইবে না, পাগড়ি সঙ্গে না থাকিলে তোমার ক্ষতি হইবে না, আর, বাজে লোকের

গোলে কখনও মিশিয়া যাইবে না। লেজ না থাকায় অনেক অনেক জায়গায় অনেক সময়ে তোমার গোল হয়, লোকে তোমাকে চিনিতে পারে না, তোমার উচিত সম্মান করিতে পারে না, সেই জন্যই গোল হয়। লেজ লও, তাহা হইলেই যত গোল মিটিয়া যাইবে।

তুমি বাগ্মীপ্রধান সভাপতি মহাশয়, তোমার একটি লেজ থাকা নিতান্ত আবশ্যক। তুমি বায়ুর বর পুত্র, তুমি কথায় কথায় ঝড় বাহিয়া দাও, বায়ু বেগে আপনি কতই উচ্চে আরোহণ করো। তোমার সঙ্গে উঠিবার ক্ষমতা থাকিলে ভারত এতদিন অধঃপতিত থাকিত না। কিন্তু নিঃসহায়, নিরবলম্ব ভারত কি ধরিয়া উঠিবে? তুমি লেজে বাঁধিয়া না তুলিলে এই অসাড় জড়ভরত ভারতের কোনই উপায় নাই। লেজ লও, তোমার মহিমার ধ্বজা উড়াও, ভারতের উদ্ধার বার্ত্তা বায়ুবেগে বিঘোষিত করো। মহাভাগ, লেজ লও।

আর তুমি যক্ষরাজ, কুবেরের কুঠিয়াল, লক্ষ্মীর বিশ্বাসপাত্র, তোমাকে একটী লেজ লইতেই হইবে। তোমার অভাব নাই তাহা জানি, তথাপি তোমার যত লেজ বাড়িবে, ততই সম্মান বাড়িবে, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। দেখো তোমার কতদিকে কত টান, কিন্তু সাহেব সুবার টানেই তোমার লেজমালা দিবা নিশি যোড়া থাকে। আমাদের মত গরিব লোকের জন্য একটা পৃথক লেজ যদি রাখিয়া দাও, তাহা হইলে অনায়াসেই তোমার বার পাইতে পারি। তাই·

বলিতেছি, গুণধাম একটী লেজ লও। তোমার ক্ষতি নাই, আমাদের ষোলো আনা লাভ, ভারতবর্ষের চারি পোয়া উপকার, একটী লেজ লও!

নগদ মূল্যে লইলে এক একটী রম্ভা দস্তুরি দেওয়া যাইবে।

পেসাদার এণ্ড কোম্পানি।

[বাণিজ্যের উন্নতি একান্ত প্রার্থনীয়, এই জন্য আমরা বিনা মূল্যে এই বিজ্ঞাপন পত্রস্থ করিলাম। ভরসা করি গ্রাহকবর্গ লেজের গৌরব অনুভব করিয়া আমাদের বদান্যতার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিবেন।]

পঞ্চানন্দ।

পুনশ্চ নিবেদন।—পঞ্চানন্দের ছাপাওয়ালা বোধ হয় অত্যন্ত অলস এবং অমনোযোগী, আর বোধ হয়, সে পঞ্চানন্দের চক্ষের উপর কাজ করে না। এই বিজ্ঞাপন বিনা মূল্যে প্রচারিত হইতেছে, সেই কৃতজ্ঞতায় ছাপাওয়ালাকে একটী লেজ বিনা মূল্যে দিতেছি; ইহাতে উভয় পক্ষের সুবিধা হইবে। পঞ্চানন্দের একটা অবলম্বন হইবে, আর ছাপাওয়ালারও লেজের মমতায় একটুকু ভয় থাকিবে।

পেসাদার এণ্ড কোং।

সাতাশী সাল।

সাতাশী সাল চলিয়া গিয়াছে, বাঙ্গালীর আর এক বৎসর ফুরাইয়াছে। ইহাতে সুখ দুঃখের কিছুই তো

দেখি না। নিত্যই এক এক বৎসর যাইতেছে; সাতাশী আটাশী কেবল গণনার কথা। যদি সুখের দুঃখের কথা তুলিতে হয়, কি বলিতে হয়, তাহা হইলে দিন গেল বলিয়া সুখ দুঃখ প্রকাশ করাই উচিত। কিন্তু দিনের দাম বোঝে, এমন লোক অল্প, তাই দীর্ঘ কাল পরে নিঃসাড়ে দিনের পর দিন—বহু দিন—কাটাইয়া নিদ্রিতের পার্শ্বপরিবর্ত্তনের ন্যায় বর্যান্তে এক দিন, এক বার, বৎসর গেল বলিয়া লোকে অধরোষ্ঠ সঞ্চালন করিয়া থাকে। তাহার পর যে ঘুম, সেই ঘুম। সাতাশী সাল বহিয়া গেল; দশ জনে বলে, আমিও একবার বলি।

হরি বলো, দিন গেল! তিনটী তুড়ি দিয়া বিকট হাই তুলিয়া সাতাশী সালের অন্তিম দিনের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করা যাউক। যেমন করিয়াই হউক যে সময়েই হউক, হরিনাম লইলে ফল আছে। যে অসাড়, নিস্পন্দ, ক্রিয়াহীন, প্রাণবর্জ্জিত, তাহার জন্য হরি নাম বিশেষ মাহাত্ম্য ধারণ করে। "যার কেউ নেই তার হরি আছে।" যখন নির্জীব মানবের মৃতদেহ গঙ্গাতীরে লইয়া যাইতে হয়, তখন তাহাকে "হরি হরি বলো, হরিবোল" বলিয়া হরিনাম শুনাইবার ব্যবস্থা আছে, রীতি আছে। সাতাশী সালের বঙ্গবাসী সমীপে, একবার "হরি বলো, দিন গেল" বলিয়া হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

যাহা বলিলাম তাহা সত্য। কিন্তু তবু উহারই

মধ্যে একটা কথা আছে। যে মাছটা সূত কাটিয়া অথবা জাল ছিঁড়িয়া পালায়, সেটা খুব বড় মাছ ; আর যে মানুষটা মায়াসূত্র কাটাইয়া অথবা ভবজাল ছিন্ন করিয়া লোকলীলা সম্বরণ করে, সেই খুব বড় লোক।

চুনো মাছের জালের ভিতর থেকে একটা দেড় ছটাক ওজনের পোনা মাছ লাফাইয়া পালাইল ; অমনি "খুব মাছটা পালিয়েছে, মস্ত মাছটা হাত ছাড়া হয়েছে, মাছটা খুব প্রকাণ্ড" ইত্যাকার বিস্ময় ক্ষোভ প্রভৃতি বিবিধ বৃত্তিবিকার জ্ঞাপক ধ্বনি হইয়া থাকে। সেইরূপ মনসা রাম রায়, আমরণ গৃহিণীর গহনা চিন্তায় নিযুক্ত থাকিয়া, আর পেটের ভিতর মদের ভাঁটি খুলিয়া বমনোদ্গারে পাড়া তোলপাড় করিয়া অবশেষে এক দিন শান্তিনিকেতনে যাত্রা করিলেও—"এমন মানুষ, এমন দাতা ভোক্তা, এমন ক্রিয়াবান ব্যক্তি আর হইবে না" বলিয়া হাহাকার শব্দও শোনা যায়। এমন অবস্থায় সাতাশী সাল যে একটা খুব সালের মত সাল চলিয়া গিয়াছে, একথা বলিলে সামাজিক প্রথার সম্মান ভিন্ন অবমাননা করা হইবে না। এ হিসাবে সাতাশী সালের একটা ইতিহাস লিখিয়া সংসারের উপকার করিলে দোষ হইতে পারে না ; বরং না করিলে প্রত্য-বায় আছে!

ইতিহাস লিখিতে হইলে বিস্তর কথা লিখিতে হয়। আমি প্রধান প্রধান কথা গুলা লিখিয়াই ক্ষান্ত হইব।

১। পারলৌকিক বিবরণ।

যাহার বিনাশ নাই, বিবর্ত্তন নাই, উন্নতি নাই, অবনতি নাই, গতি নাই, স্থিতি নাই, সেই পুণ্য-আত্মার পুণ্যধাম-যাত্রার উল্লেখ করাই সর্ব্বাগ্রে উচিত; সেই জন্য বঙ্গের পারলৌকিক প্রসঙ্গের অবতারণা প্রথমেই করা যাইতেছে।

এ সম্বন্ধে সাতাশী সাল বঙ্গের সৌভাগ্যের কাল বলিয় পরিগণিত হইবে। পাপাত্মার দৌরাত্ম্য হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অনেকগুলি পুণ্যাত্মা ভব ভবন হইতে প্রস্থান করিয়াছেন।

(ক) যাহাদের গৌরাঙ্গ প্রাপ্তি হইয়াছে, তাহাদের খুব জোর কপাল; বুটের স্থপারিশে প্লীহা পিঞ্জর ভগ্ন করিয়া আত্মারাম প্রাণপক্ষী উড়িয়া যাইবে, কিম্বা গুলিখোরের বদনাম না লইয়াও গুলি ভক্ষণ পূর্ব্বক পঞ্চভূতের অধীনতা হইতে পাপদেহের পাপপ্রাণ পরিত্রাণ পাইবে, এর চেয়ে ভালো কথা আর কি আছে বলো? তা সাতাশী সাল এ সৌভাগ্যে বঞ্চিত হয় নাই।

কতকগুলি আত্মা ফাঁসীযাত্রা করিয়াছে; ইহাদের উন্নতিও কাল্পনিক কথা নহে, কারণ ইহারাও গৌরাঙ্গের ইচ্ছানুরূপ কাজ করিয়াছে।

ভক্তি মার্গে এই পর্য্যন্ত।

(খ) আরও অনেকগুলি আত্মা, গৃহিণীর গঞ্জনা

সহিতে না পারিয়া, ভ্রাতাকে বিষয় বিভবের হিসাব বুঝাইয়া দিতে অপারগ হইয়া, ছেলের স্কুলের মাহিয়ানা যোগাইতে না পারিয়া, মেয়ের বরের দাম দিতে অসমর্থ হইয়া; ওদিকে কতকগুলি আত্মা, গহনা বেচিয়া স্বামীর মদের যোগান যোগাইতে না পারিয়া, পরপুরুষের কোমর ধরিয়া নৃত্যভঙ্গী প্রদর্শনে অক্ষম হইয়া, চেয়ারে বসিয়া "অপূর্ব্ব প্রেম" নবন্যাস পড়িবার সময়ে দুষ্টমতি শাশুড়ী কর্ত্তৃক ব্যাহত হইয়া———ইত্যাকার নানা কারণে নানা প্রকারে নানা আত্মা, কড়ি কাঠে দড়ি বন্ধন পূর্ব্বক উদ্বন্ধনে ভববন্ধন ছিন্ন করিয়া আরাম-কুঞ্জে চলিয়া গিয়াছে।

এতদ্ভিন্ন যাহারা জ্বরের সঙ্গে বিশিষ্ট আত্মীয়তা প্রযুক্ত, অথবা ওলাউঠার অনুল্লঙ্ঘনীয় নির্ব্বন্ধ জন্য বা এবম্বিধ অন্যবিধ কারণে ডাক্তার বাবুর অনুরোধে, হাতুড়ের উপরোধে, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের দলও নিতান্ত পাতলা নহে।

আর যাহারা রাজার সম্মান রক্ষার জন্য শুদ্ধ পেটের দায়ে বাস্তুভিটার মায়া ছাড়িয়া লোকান্তরে বসবাস করিতে গিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা যতই কেন হউক না,—তাহারা গণনার মধ্যে আসিতে পারে না। আর গণ্য মান্য লোক ভিন্ন অন্যের হিসাব রাখিয়া পঞ্চানন্দই বা আত্মলাঘব করিবেন কেন?

অনন্তর ছাঁকা পরলোকের কথা এইখানে শেষ করিয়া ইহলোক মিশ্রিত পরলোকের কথা বলা যাই-

তেছে। অর্থাৎ ইহলোকে থাকিয়াও পরলোকের ব্যবস্থা যাঁহারা করিয়া থাকেন, সেই ধার্ম্মিক দলের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যাইতেছে।

সাতাশী সালে ধর্ম্মের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। খ্রীষ্টান রাজা আফগানস্থানে এক গণ্ডে চপেটাঘাত খাইয়া দক্ষিণ আফেরিকাতে দ্বিতীয় গণ্ড পাতিয়া দেন, এবং তদ্দ্বারা ধর্ম্মোপদেষ্টার উপদেশ সার্থক করেন।

মহম্মদের শিষ্যগণ এক হস্তে কোরাণ, অন্য হস্তে তরবাল চালাইবার সুবিধা না দেখিয়া, হোটেলে খানশামা রূপ ধারণ পূর্ব্বক হারাম অর্থাৎ শূকর মাংস ছেদন করিয়া ধর্ম্মের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন।

দুর্গোৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে ফলার এবং সাহেব সুবাকে খানা দিয়া "সর্ব্ব জীবে সমান দয়া", পড়িয়া মার খাইয়া কথাটী না কহিয়া "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্যের মাহাত্ম্য রক্ষা করিয়া, হিন্দু সন্তান কুলধর্ম্মে নিষ্ঠা প্রদর্শন দ্বারা ধর্ম্মের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মী সকল ধর্ম্মের উপাদেয় খিচুড়ি পাকাইয়া অকাতরে বিতরণ পূর্ব্বক সগৌরবে নববিধানের ধ্বজা তুলিয়া ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তনে ত্রুটি করেন নাই।

আর ইহার উপর উপধর্ম্ম, বাজে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম প্রভৃতি কত প্রকারে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে,—তাহার তালিকা এখনও প্রস্তুত হয় নাই এবং সংক্ষেপে বর্ণনাতীত।

মুখ্য কল্পে ধর্ম্মের এই ভাব ; গৌণ কল্পে চতুর্দ্দিকে সুফল। আর্য্যসন্তান এত হাঙ্গামেও জাতি বাঁচাইয়া চলিয়াছে ; ব্রহ্মজ্ঞানী জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়া ভ্রাতৃভাবে সমগ্র পৃথিবীকে একাকার করিয়াছে ; খ্রীষ্টভক্ত সর্ব্বত্রে হোলি স্পিরিট্ * অর্থাৎ পবিত্র আত্মার প্রসাদ করিয়া দিয়াছে। আর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য তিরোহিত হইয়াছে ; লোকে বিরোধ করা ভুলিয়া গিয়াছে ; দলাদলি উঠিয়া গিয়াছে ; নাপিত পুরুত বন্ধ করা হইয়াছে ; সুতরাং রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু সংসার হইতে অপসারিত হইয়াছে। অতএব সাতাশী সাল প্রকৃত ধর্ম্মের সাল।

২। রাজনৈতিক বিবরণ।

সাতাশী সালের ইতিহাসে অপরাপর প্রসঙ্গ না কি পারলৌকিক কথার মত বড় অঙ্গের নয়, সেই জন্য সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

রাজনীতির ভিতর দুইটা মূল তত্ত্ব ; তাহারই ডাল পালা লইয়া ভাঙ্গচুর করিয়া যত যাহা বলা যাউক। মূলতত্ত্ব দুইটা এই যে, এক আছেন রাজা, তিনি ইংরেজ ; আর এক আছে প্রজা, সে নেটিব। ইহাদের সম্পর্কও দুইটী কথা লইয়া——আদান আর প্রদান ; তা' প্রজা টেক্স দিতে ত্রুটী করে নাই, রাজাও

---

* বুঝিতে পারিলাম না। খোলা ভাটীতে কি হোলি স্পিরিট্ (holy spirit) বিক্রী হয়। ছাপাখানার ভূত

লইতে ক্রুটী করেন নাই। সুতরাং রাজনীতির মূল সূত্র সুন্দররূপে সপ্রমাণ হইয়াছে।

যদি বলো প্রজাপালন আর রাজভক্তি লইয়াই রাজনীতি, তাহাতেও পঞ্চানন্দের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। সাতাশী সালে ইংরেজ অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিয়াছেন; সঙ্গতি অনুসারে ছেলেকে যেমন লেখা পড়া শেখাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া উচিত, তাহা করা হইয়াছিল; উচ্ছৃঙ্খলের শাসন, বেতরিবতের সোহবৎ, দুষ্টের প্রহার—এ সমস্তই হইয়াছিল। আর মিতাক্ষরা শাস্ত্র না কি নিতান্ত সেকেলে, সেই জন্য বাপ থাকিতে বেটার ধনাধিকার হইতেই পারে না; তা' ইংরেজও মিতাক্ষরার মতে চলেন নাই।

রাজভক্তি পক্ষে, প্রজারাও অকাতরে রাজসেবা করিয়াছে। কেনই বা না করিবে? পেট তো চলা চাই। গুলি ডাণ্ডা, বঁটি দা, এ সমস্ত ফেলিয়া দিয়া সুশীল সুবোধ বালকের মত প্রজারা ২৪ ঘণ্টা মেহনৎ করিয়া পড়া মুখস্থ করিয়াছে, আর গুরু দক্ষিণার ভাবনা ভাবিয়াছে।

রাজনৈতিক ডাল পালা উপলক্ষে এই কথা বলা উচিত যে, জমীদারেরা ষড়যন্ত্র করিয়া প্রজাদের, আর প্রজারা ষড়যন্ত্র করিয়া জমীদারদের দুঃখ মোচন করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়াছে। তাহাতে ভারতবর্ষে একতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ইহা ভিন্ন সাতাশী সালে তিন শ পঁয়ষট্টী খানি

আইন জারি হইয়াছে, এক হাজার দিস্তা কাগজে দরখাস্ত হইয়াছে, পাঁচ হাজার ঘন ফুট বক্তৃতা হইয়াছে, আর দশ হাজার বর্গ মাইল দেশীয় সংবাদ পত্র চলিয়াছে। সুতরাং রাজা এবং প্রজা উভয়েই সদ্ভাব এবং সৌহৃদ্য বিষয়ে লক্ষ যোজন অগ্রসর হইয়াছেন।

৩। বাণিজ্যিক বিবরণ।

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ"—এই কথার গৌরব বুঝিয়া বিস্তর ভারতবাসী তৈলের বিনিময়ে উপাধি, মানের বিনিময়ে পদ, খোশামোদের বিনিময়ে অর্দ্ধচন্দ্র, জাতীয়তার বিনিময়ে করমর্দ্দন, ধুতি চাদরের বিনিময়ে কপিত্ব, স্বতন্ত্রতার বিনিময়ে অনুকরণ——ইত্যাদি নানা রকমে নানা কারবার করিয়াছে। ইহাতে ভারতবর্ষের মূলধনের বহুগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে, তৎপক্ষে সংশয় নাই।

ইংরেজও বাণিজ্য প্রধান জাতি, ভারতবর্ষে অনেক কারবার করিয়াছেন। রজত ও শোণিত লইয়া অথচ মাটীর দরে আফিঙ, মদ, গাঁজা, চণ্ডু বেচিয়াছেন; ইহাঁদের বিচার না কি খুব খাঁটি এবং সরেস, তাই অত্যল্প মাত্রাতে দিয়াও অনেকের সর্ব্বস্ব লইতে পারিয়াছেন; ষ্টাম্প বিক্রয়, টিকিট বিক্রয় প্রভৃতি দ্বারাও ইংরেজের বিস্তর লাভ হইয়াছে। আর কাবুল অঞ্চলে যথেষ্ট অপযশ লইয়া ভারতের ধন প্রাণ বিক্রয় দ্বারা ইংরেজ অল্প লাভ করেন নাই।

বাজার কিছু নরম ছিল, আমদানি রপ্তানিও কম হইয়াছিল। তা' হউক, কিন্তু তাহাতে পচা সড়া মালের কাটতি যে কম হইয়াছে, এমন বোধ হয় না।

৪। সামাজিক বিবরণ।

খবরের কাগজওয়ালা, সুশিক্ষার টিকাওয়ালা প্রভৃতি প্রধান প্রধান লোকেরা বলেন, এবং ব্যবহারের দ্বারা প্রতিপন্ন করেন যে, সমাজের কথায় আমাদের কাজ কি? পঞ্চানন্দও তাই বলেন। বাস্তবিক, বাল্য বিবাহ, বৃদ্ধ বিবাহ, বিধবা বিবাহ, সধবা বিবাহ, ভদ্রলোকের সম্মান, ইতর লোকের অজ্ঞান, যুবাদের দীক্ষা, ছেলেদের শিক্ষা, বারোয়ারি, দলাদলি, পঞ্চাইতি, কি মদ মাতালের ঢলাঢলির কথায থাকিযা দরকার কি? ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যই উন্নতির মূল; কেহ কাহারও তোয়াক্কা রাখিবে না, কাহারও মুখাপেক্ষা করিবে না— তবে তো মঙ্গল। তাই যদি হইল, তবে কে কি খাইল, কে কোথায় যাইল, রাম কি বলিল, হরি কি করিল, কাহার কেমন সংস্কার, কিসে কার উপকার— এ সকল কথা ভাবিয়া তাসের সময়, টপ্‌পার সময়, ইয়ারকির সময় কেন বৃথা নষ্ট করিতে যাইব? সমাজ আছে, আপনার আছে, তাহাতে আমরাই বা কি, আর তোমারই বা কি? সমাজে মাহিয়ানা বাড়ে না, রাজা বাহাদুরি ঘটে না, কাজ কর্ম্ম যোটে না, দেনা পাওনা মেটে না, কিছুই হয় না—তবে সমাজের সঙ্গে কিসের সম্পর্ক?

এই মহান ভাবের পুষ্টি সাতাশী সালে হইয়াছে।

৫। সাহিত্যিক বিবরণ।

একা পঞ্চানন্দের কথা বলিলেই সমগ্র সাহিত্যের কথাই বলা হইল। সাতাশী সালে স্বতেজে, স্বজোরে লোকযোগে, ডাকযোগে, আপনার সুযোগ বুঝিয়া, পরের অনুযোগ সহিয়া পঞ্চানন্দ চলিয়া আসিয়াছেন। ছ কোটী সাড়ে সাতাশী লক্ষ বঙ্গবাসী সকলেই মনোযোগ পূর্ব্বক ভাবগ্রহ করিয়া পঞ্চানন্দ পাঠ করিয়াছেন। কেহ রাধাবল্লভ জীউর বনলালা বন্ধক দিয়া কেহ দুর্গোৎসবের ব্যয় কমাইয়া দিয়া, কেহ শুঁড়ির খাতায় বাকী রাখিয়া, কেহ পেট্রিয়টিক-ফণ্ডে দাতব্য না করিয়া—এই রূপে যিনি যেমনে পাইয়াছেন, আড়াই টাকা বাঁচাইয়া পঞ্চানন্দের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বে কাহারও কাহারও মূল্য বাকী রাখা অভ্যস্ত ছিল; সাতাশী সালে তাঁহারা আপন ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সকলেই অগ্রিম মূল্য দিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন, জাতীয় গৌরবের জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। কাজে কাজেই অন্নচিন্তার দায় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পঞ্চানন্দ এক চিত্তে এক ভাবে আত্মকর্ম্মে নিয়োজিত থাকিতে পারিয়াছেন।

যাঁহারা যথার্থ সুশিক্ষিত, কেবল তাঁহারাই সাতাশী সালে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে যেমন

পাঠক অপেক্ষা লেখকের সংখ্যা অধিকতর ছিল, সাতাশী সালে আর সেরূপ হয় নাই। সাহিত্য সংসারে আর এক সুলক্ষণ এই দেখা গিয়াছে, প্রত্যেক লেখকই স্ব স্ব প্রধান না হইয়া সকলে মিলিয়া লিপি সাহায্য দ্বারা স্বীয় সাহিত্যানুরাগের পরিচয় প্রদান এবং পঞ্চানন্দের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন। সুতরাং সাতাশী সালে কি রাজদ্বারে, কি সুহৃদসমাজে—সর্ব্বত্রই বিলক্ষণ প্রভাব দেখাইয়া পঞ্চানন্দ স্বকর্ত্তব্য সাধন করিতে পারিয়াছেন।

অতএব সভাপতি এবং সভ্য মহোদয়গণকে ধন্যবাদ পূর্ব্বক পঞ্চানন্দ পুনশ্চ কুশাসন গ্রহণ করিতেছেন।

আর সংপ্রতি যে পরচ্ছিদ্রদর্শী পঞ্চানন্দ "সঙ্গ" দোষে সাধারণার কাছে ধরা পড়িয়াছেন, তাহার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ তাহাতে লোকের ক্ষতি নাই, পঞ্চানন্দেরও বৃদ্ধি নাই।

এখন অষ্টাশী সাল এইরূপ চালাইতে পারিলেই আর ভাবনা থাকে না।

লাট মন্দিরের খবর।

(হাড়গিলের পাঠানো।)

জানেন ত আমি কুঁড়ের বেহদ্দ, আমার আবার খবরাখবরের ভার দেওয়া কেন? আমি এই গম্বুজের ওপর দাঁড়িয়ে থাকি, অথচ দুটী পা কখনও এক সঙ্গে বার করিনে; দিন রাত জেগে থাকি, তবু দুটী চোক

মেলে কখন পূরো নজরে চাইনে। লোকে মনে করে —কত জন বলেও—হাড়্গিলের মত হুঁসিয়ার অথচ বিজ্ঞ লোক সংসারে আর নাই। আসল কথা আমিই জানি,—আমার মত আল্‌সে ত্রিভুবনে আর নাই।

যাই হৌক, আপনি যে আমার মত নাছোড় বন্দা, তাতে দুটো খবর না দিলেও, দেখ্‌চি, আর চলে না। ফলে আমি বাইরের কিছু বল্‌তে পার্‌বো না, এই লাট মন্দিরের ভেতর যা দেখ্‌তে শুন্‌তে পাই, তাই নিয়ে দু কথা যা যোগায়, বল্‌চি ;—

১। ব্যক্তি ; লাটের দল ও মলাটের দল।

প্রথম ত দেখি খোদ লাট, নাম রিপন। লোকটা কিছুতেই নাই, খায় দায় মাইনে ন্যায়, এই পর্য্যন্ত। রিপন চাচা পষ্ট কবুল জবাব দিতে খুব মজবুৎ, মনের ভেতর বড় এক খান কোরকাপ নেই, দলের লোকে যেমন যেমন বোলে কোয়ে দ্যায় তেমনি কাজ কর্ম্ম করে। একবার একটা টিকে দেবার আইন হয়েছিল, তাতে লেখা ছিল যে, যে টিকে না দেবে, তার ম্যাদ হবে। রিপণ চাচা আইন দেখে চম্‌কে গেল, বোল্লে তোমরা দশ জনে যা ভালো বোঝো, তাই করো, তায় আমি আপত্তি করি নে, কিন্তু আইনের ব্যবস্থা শুনে আমার পেটের ভিতর হাত পা সেঁদিয়ে যাচ্ছে—এতে ম্যাদ কেন? সেই হাত পা সেঁদোনই সার, আইনটা কিন্তু জারি হোয়ে গেল।

অমনি সেদিন আবার ফৌজদুরি কার্য্যবিধির আইন

হবার বেলা যতীন্দ্র ঠাকুর বল্‌লে যে, খালাশের পর আপীল কোরে লোককে নাস্তানাবুদ করাটা ভালো নয় কোনো রাজ্যেই এমন বেমক্কা কথা চলে না, তবে এখানে চল্‌বে কেন ? চাচা—ঐ রিপণ চাচা সাদা সিদে লোক, বোলে ফেল্‌লে—আমি ওসব কিছু বুঝি সুঝি নে, দলের লোক যা করে করুক। আগেকার লাট যা কোরে গ্যাছে, তার উল্টো কোরতে গেলে, এক্ষুণি এরা আমায় খেয়ে ফেল্‌বে। যা হোচ্ছে, হোক। চাচার এ আক্কেলটুকু হোলো না যে, আগেকার লাটের আমলে আপীলে সাজা বাড়বার নিয়ম ছিল, অথচ আজকের এই মজলিসেই সেটা উল্টে দেওয়া হোচ্চে। চাচা কিন্তু পষ্ট বোলে দিলে যে, কথা গুলো শক্ত, আমি অতো ভেবে উঠ্‌তে পারি নি।

চাচার দোষই বা দি কি বোলে ? ভাল মানুষের ছেলে এসেছে ত এক মগের মুল্লুকে, না জানে এ দেশের লোককে, না জানে এদের ভাষা, না জানে এদের চাল চলন, না জানে কিছু। এ হরি ঘোষের গোয়ালে—অর্থাৎ কি না এই ভারতবর্ষে—হঠাৎ যে একটা কিছু ঠাউরে ওঠা, যার তার কাজ নয়। তাই বোল্‌চি যে রিপণ চাচা খায় দায় মাইনে ন্যায়, কোনো গোলের ভেতর থাক্‌তে চায় না। তবু ভালো; "ভালো কোর্‌তে পার্‌ব না, মন্দ কর্‌ব কি দিবি তা দে"—ডেকে হেঁকে যে সেইটে করে না, এই ঢের।

লাটের দলে অনেকগুলো উপসর্গ আছে। তার

একটা লড়াইয়ের লাট, নেহাত ষণ্ডামার্ক লোক না হোলে কেউ কাঁচা প্রাণের মায়া ছেড়ে লড়াইয়ের চাকরি স্বীকার করে না; তা এ লোকটা কাজে যেমন ষণ্ডামার্ক, বুদ্ধিতে ততোধিক। আসামে কুলি পাঠাবার আইন নিয়ে যখন টক্কাটক্কি হচ্ছিল, হাঁদারাম উঠে বোল্লেন কি না, আসামের চা-বাগানের কুলির মত সুখী জীব ভূ ভারতে আর নাই। আমি মনে মনে ভাবলুম, যে, হাঁদারামের তাই যদি মনে হোয়েচে ত, এ কর্ম্ম-ভোগ কোরে মরে কেন, আপনি গিয়ে কুলি হোলেই ত হয়। হাঁদারাম যদি কুলি হয়, তা হলে দেশের লোকের হাড় জুড়োয়, যার বাগানে হাঁদারাম খাটে তার কাজ বেশি হয়, আর হাঁদারামের খেদটুকুও যায়। ষণ্ডামার্কের কিন্তু সে বুদ্ধিটুকু হোলো না।

আর একটা মহিষাসুর আছে, সেটার নাম বিট্‌লে ষ্টোক্। দরকার মত আইনের মুসবিদা করাই তার কাজ, কিন্তু বিটলে এমনি কুচক্রী, লাগুক না লাগুক, সময় অসময় না বুঝে আইন কোর্চ্চিই কোর্চ্চিই। বিটলে মনে করে যে, লাট মন্দিরটে কুমোরের চাক, আর তার মগজটা কাদার তাল। সেই চাকে চাপিয়ে কেবলই পাক দিচ্ছে. আর আইন বার কোরুচে। আইন যা করে, তাতে বিদ্যে প্রকাশও সেই গোছের; না বেরুতে বেরুতেই তালি দিয়ে রিফু কোর্‌তে হয়। তার পর আবার সেই রিফুর রিফু, তস্য রিফু, ক্রমাগত চোলেচে। বিট্‌লে যে আইনের টাকাগুলো মাটী

কোর্‌চে, তা করুক ; ঐ যে এত কাগজ, কলম, কালি নষ্ট করে, তাতেই বড় কষ্ট হয়। আমার কেবলই মনে হয় যে, পঞ্চানন্দ ঠাকুর এত কাগজ কলম পেলে না জানি কি একটা কারখানাই কোরে ফেল্‌ত। শুনিতে পাচ্ছি বিট্‌লে এই বার যাবে। না টেঁকলেই ভালো। যে দিন যাবে, আমি সেদিন পালক ঝেড়ে একবার হাওয়া খাবো।

এই রকম গ্রহ উপগ্রহ লাটমন্দিরে অনেক আছে। সব কটার কথা বোল্‌তে গেলে বিস্তর সময় নষ্ট হবে।

যতীন্দ্র ঠাকুর টাকুর আর আর যারা আছে, তাদের আমি গ্রহ উপগ্রহ বোলে ধরি না। তারা লাটমন্দিরে মলাট মাত্র—সোণার জলে হলকরা বেস বাঁধানো, ওপরে টাইটেলটুকু আছে, কিন্তু ভেতরে সব ফাঁক ; তাই তাদের মলাট বোল্‌চি। শুদ্ধ শোভার্থে তাদের নিয়ে গিয়ে লাটমন্দিরে সাজিয়ে রেখে দ্যায়, দরকার হলে কর্ত্তারা নেড়ে চেড়েও দ্যাখেন, কিন্তু ভেতরে কখনও কিছু খুঁজে পান না, সেই জন্য বোলচি যে এদের ভেতরে সব ফাঁক। নইলে বিশ কোটি লোকের বেদ বোলে অমন যত্ন কোরে তুলে নিয়ে গিয়ে কাজের বেলায় অমন তুচ্ছ তাচ্ছীল্য কোর্‌বে কেন ? এক দিনও দেখলুম না যে, এদের কথা বিকুলো অথচ গতি বিধি সাধ সম্মান—কিছুরই কসুর নাই। আমার মনে হয় যে এরা বড় বেহায়া লোক ; নইলে পয়সা নেই, কড়ি নেই, শক্তি নেই, সামর্থ্য নেই,—

এসব দেখে শুনেও রোজ রোজ পরের আমোদ বাড়া-বার জন্যে সঙ সাজ্তে যাবে কেন? আমি হোলে ত কিছুতেই যেতেম না; যেখানে আমার কথা চলে না, সে দিকে আমার পাও চলে না, এই আমার মত।

শিবপ্রসাদ নামে একটা মেড়ুয়া রাজাও এই মলা-টের দলে আছে। এ একটা মানুষের মত মানুষ; সে দিন বোলে ফেল্লে যে, সিবিল সাহেবের দল খুব বেশি বেশি না থাকিলে দেশ চোলবে না, দেশের ভারি অমঙ্গল হবে। কথা খুব পাকা। আপন মঙ্গলেই দেশের মঙ্গল, সিবিল সাহেব না হোলে ছাতুখোরের সেলাম নেবে কে? কথা ঠিক, সিবিল সাহেব যখন নেই, তখন শিবপ্রসাদও নেই। সুতরাং!

২। পদার্থ; ঘটনা ও রটনা।

বিদ্যাসাগর ছেলেদের শেখান যে, ইতস্তত যাহা দেখিতে পাও, তাহাই পদার্থ। সে কথা যদি ঠিক হোতো, তা হোলে রিপন চাচা অবধি ছাতুমারা মেড়ুয়া পর্য্যন্ত সবই পদার্থ হোতো। কিন্তু আমি নাকি এ সব

"জলবিম্ব তদ্রূপ প্রায়"

বিবেচনা করি, কখন আছে কখন নেই তাই—এ সকলকে পদার্থও মনে করি না। আমার মতে এ সমস্তই অপদার্থ।

আসল পদার্থ হোচ্চে লাটমন্দিরে যা ঘটে, আর যারটে। তারই কথা এখন কিছু বোলবো।

এক ঘটনা ন আইন উঠে গ্যাছে। কেন যে উঠে গেল, কিছুই বুঝতে পাল্লুম না; লাটমন্দিরের এক পাশে ভাল মানুষের মত বোসে থাক্‌ত, মুখে কথাটী ছিল না, কোন উৎপাত ছিল না, অথচ দশ জনে পেছনে লেগে, বেচারিকে বোকা বানিয়ে উঠিয়ে দিলে। কাজটা ভাল হয় নি। আপনি কি বলেন? আমাদের মধ্যে এইটুকু হোয়েচে যেন আইনের কথা নিয়ে লোকে যতীন্দ্র ঠাকুরকে যজমেনে ঠাকুর নাম দিয়েচে—কেন না, গর্ভাধান, জাতকর্ম্ম ইস্তক তার শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত সকল ক্রিয়াতেই ইনি উপস্থিত থেকে মন্ত্র বোলে যজিয়ে ছিলেন। কেউ কেউ বলে মজিয়ে ছিলেন।

আর এক ঘটনা আসামের চা বাগানে কুলি পাঠাবার আইন। এই আইন নিয়ে তুমুল কাণ্ড হোয়েছিল—দলাদলি পর্য্যন্ত হোয়েছিল, একটা কুলির দল, আর একটা চাকরের দল। দেশী লোক সমস্ত কুলির দলে, আর বিদেশী সব চাকরের দলে। চাকরেরা জিতেচে, কুলিরা হেরেচে; এখন কুলির দল বোল্‌চে এতো আইন নয়, এ মানুষধরা কল। আমি কুলিও না, চাকরও না, কাজেই আমি এর কিছুতেই নেই।

আরও একটা ঘটনা, ফৌজদারি কার্য্যবিধি। এ সেই বিটলে গুণনিধিরই বিধি, কাজে কাজেই নামে বিধি হোলেও এতে অনেক অবিধি আছে, তা বলাই বাহুল্য। এই আইন জারি হবার সময়ে লাটমন্দিরে অনেকগুলো পদার্থের সিদ্ধান্ত হোয়েচে :—

(ক) লাট সাহেব আইন কানুনের কথা ভাব্‌বেন বলেন, কিন্তু ভেবে উঠতে পারেন না।

(খ) আগে আপীল কোরলে সাজা বাড়তো, এখন আর বাড়বে না; দলস্থ লোকের অভিপ্রায় হোলে হালের লাট সাহেব সাবেক লাট সাহেবের ব্যবস্থা রহিত করেন।

৩। উপকার,—কিন্তু কার?

এই যে ভারতবর্ষে ইংরেজের রাজ্য কেবল লাভ লোকসানের উপরেই নির্ভর করে, তা অনা বাজে লোকে জানে না বটে, কিন্তু আপনার অবিদিত নাই। গোড়ায় ব্যবসা কর্‌বারই জন্যে এখানে ইংরেজদের আসা, এখনও সেই ব্যবসার ভরসাতেই তাদের এত কষ্ট স্বীকার কোরে রাজ্য পরিচালন। তবে দোকান-দারির দায়ে জমীদারি ঘুট্‌লে পর যেমন সেরেস্তা আলাদা রাখ্‌তে হয়, ইংরেজেরাও সম্প্রতি সেই ভাবে কাজ চালাচ্ছেন; কতকগুলি ইংরেজ খাটি দোকান নিয়ে থাকেন, আর কতকগুলি নায়েব, গোমস্তা—জজ মেজেষ্টর—সেজে জমাদারি সেরেস্তার কাজ আঞ্জাম করেন। কিন্তু আসলে যে বেণে, সেই বেণে; জমীদারি সেরেস্তাতেও সেই খরিদ বিক্রী, লাভ লোকসান গণনা ভিন্ন অন্য কথা নাই। রাজকার্য্যে—অর্থাৎ ঐ জমীদারি সেরেস্তায় বছর বছর হিসাব নিকাশ করা হয়, আর পর বৎসরের আয় ব্যয়েরও একটা ফর্দ্দ তৈয়ের হয়। এই হিসাব নিকাশ করা ফর্দ্দ তৈয়ের

করাকে বজেট বলে ; বজেট লাটমন্দিরেই হয়,—আমি সেই বজেটের কথাই বল্‌তে বোসেছি।

বছর বছর হয়, এবারও বজেট হোয়েচে। বছর বছর সেই আফিঙ বিক্রী, সেই ষ্টাম্প বিক্রী, ইংরেজ আমলাদের মেহনৎ বিক্রী, বিচার বিক্রী, ধর্ম্ম বিক্রী—ইত্যাদি নানা রকম জিনিস বিক্রী হোয়ে থাকে, এবারও হোয়েছে। তবে বজেটে কেবল খোতেনের ধরণে মোটামুটি টাকার অঙ্ক গুলো ধরা হয় মাত্র, বিশেষ খোলাশা কিছু থাকে না। যেমন, বিচার খরিদ করাতে রামা চাষার সর্ব্বস্ব গ্যাছে, রাজারাম রায়ের ঘরে এত টাকা দেনা প্রবেশ কোরেচে—এ রকম কোনও ব্যাওরা বজেটে পাওয়া যায় না। তা অন্য বছরও থাকে না, এবারও ছিল না। ফলে এ সব পুরাণো কথার হিসাবে বজেটের কথা না বল্‌লেও চল্‌ত। কিন্তু এবার নাকি একটু বিশেষ খবর আছে, তাই লিখতে হোচ্ছে। আর সেই বিশেষ কথা গুলো লোকে বুঝ্‌তে পার্‌বে বোলে এতটা ভূমিকাও কোর্‌তে হলো।

বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি, আমারও আসল কথা চেয়ে ভূমিকা বড়। তা কবি কি? যা না বোল্লে নয়, তা না বোলেই বা থাকি কি কোরে?

নুনের কাটতি বাড়াবার জন্যে নুনের দর কমিয়ে দেওয়া হোয়েছে। এতে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন দুই হবে। নুনের মহাজনরা বড় জোচ্চোর ; ব্যবসা

করে, কিন্তু সরকার বাহাদুরকে ফাঁকি দেবার চেষ্টাটা বিলক্ষণ আছে—পূরো লাইসেনি দিতে কিছুতেই চায় না। এবার তেমনি জব্দ! সাবেক দরে গাদা গাদা নুন কিনে রেখেছিল, আর লাভ কোরে বড় মানুষ হবে ভেবেছিল। মুখে ছাই পোড়েছে—নুনের দর কম হওয়াতে একেবারে গোল্লায় গ্যাছেন। কেমন, দুষ্টের দমন হোলো কি না?

শিষ্টের পালনও তেমনি। যে দশ টাকা রোজকার করে, কি যার বাপের দশ টাকা আছে সময়ে অসময়ে চাঁদাটা আসটা দেয়—সেই ত শিষ্ট। তা স্বচ্ছন্দে এখন পৌনে সাত পয়সার নুন সাড়ে পাঁচ পয়সায় পাবে। এরা এখন চার পা তুলে রাজাকে আশীর্ব্বাদ কোরবে, আর অনায়াসে নুনের পয়সা বাঁচিয়ে তাতে তেল কিনে হর্ত্তা কর্ত্তাদের মন যোগাতে পারবে। তবেই দেখ, শিষ্টের পালন টাও হোলো। লাভের অঙ্কেও দু পয়সা এলো।

আর, দিনে বাউরি, বিন্দে দুলে, হলা ক্যাওরা—এরা কি মানুষ তাই এদের জন্যে মাথা ধরাতে হবে? ব্যাটারা এক দমে আধ পয়সার বেশি নুন কিন্‌বে না, তা রাজার দোষ কি বলো? এরা নেহাৎ পাজি; এমন পাজি লোকের কথায় থাক্তেই নেই।

আর এক কাণ্ড হোয়েচে, কাপড়ের মাসুল উঠে গ্যাছে। এখন দেদার কাপড়ের আমদানি হবে, দেদার টাকার রপ্তানি হবে। তা হোলেই বাণিজ্য, আর

বাণিজ্য হোলেই লক্ষ্মী! বোকা তাঁতির বিনাশ, বুদ্ধিমন্ত সদাগরের জন্যে পাটের চাষ ইত্যাদি ইত্যাদি।

বোঝা গেল যে, ভারতের এবার উপকার। তবে লোকে বোঝে না, এই যা। তারা বলে কি—শুনলেও হাসি পায়—তারা বলে যে, বিলিতি কাপড়ে আমাদের তাঁতি কুল গেল, আর বিলিতি মদে বোষ্টম কুল গেল; এখন আমরা দুয়ের বার। শোনো একবার কথাটা!

এমন যে বজেট, মূর্খ লোকে একেই বলে——বজ্জাতি।

শোকশেল।

হায়! কি সর্ব্বনাশ হইল! এত ভরসা, এত আশা সমস্ত আকাশে বিলীন হইয়া গেল। আর আমরা কি লইয়া জীবন ধারণ করিব? কেমন করিয়া লোকের কাছে মুখ দেখাইব? দুঃখময় সংসারে একমাত্র প্রদীপ, দুস্তর সাগরে একমাত্র ভেলা, বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র পুত্র, দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র গৃহ-লক্ষ্মী—কোথায় অন্তর্ধান হইল? মুদ্রাশাসনী-ব্যবস্থা, ওরফে আদরের ধন 'ন আইন' কোথায় গেল? হায়! আমাদের আর কিছুই নাই! (১। দীর্ঘ নিশ্বাস)

আমরা দেশী লোক, দেশী ভাষায় দেশী কথা লিখিয়া আর কি করিব? আমরা লিখি, বাবুরা

পড়েন না ; আমরা পরামর্শ দি, বাবুরা কাণে তোলেন না ; আমরা উত্তেজন করি, বাবুরা জল ঢালিয়া দেন ; আমরা কত মিষ্ট কথা বলি, বাবুরা তুষ্ট হন না ; আমরা গালাগালি দি, বাবুরা ভ্রূক্ষেপ করেন না ; আমরা কাগজ পাঠাইয়া দি, বাবুরা দাম দেন না। আমাদের আদর নাই, মান নাই, মর্য্যাদা নাই, সম্ভ্রম নাই, ভয় নাই, লজ্জা নাই, ঘৃণা নাই—কিছুই নাই। কে আমাদের আদর করিবে ? বাবু ত করিতেন না, করিবেনও না। যাহা কিছু করিত, আমাদের সাধের ন আইন। দশ দিক অন্ধকার করিয়া, অতল সাগরের মধ্যস্থলে ডুবাইয়া দিয়া, গহন বনের মাঝে ফেলিয়া, ন আইন কোথায় গেল ? হায় ! কি পরিতাপ ! এ বাদ কে সাধিল ! পদ্মপলাশলেচন ন আইন ! তুমি কোথায় গেলে ? শিশু আমরা, এ বিপদে আমাদিগকে কে রক্ষা করিবে ? (২। বক্ষে করাঘাত।)

রণরঙ্গিণী দিগম্বরী মহাকালীর পদানত, বাহ্যজ্ঞান শূন্য, ভূতপতি, আশুতোষ ভোলানাথ একবার সদয়-নেত্রে কটাক্ষপাত করিয়া আমাদিগকে লোক মধ্যে স্থান দিয়াছিলেন ; লাট লিটন আমাদের জন্য ন আইন করিয়া আমাদিগকে পদস্থ করিয়া গিয়াছিলেন। সেই দিন ত্রিভুবনে আমাদের বিজয় দুন্দুভি শ্রুতি-গোচর হইয়াছিল, স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল তরকম্পিত হইয়াছিল, বাবুরা পর্য্যন্ত আমাদিগকে চিনিয়াছিলেন। আমাদের সে গৌরব কে বিলুপ্ত করিল ? আমাদের

সে দিনের কে অন্ত করিয়া দিল? এ প্রাণ আর কেমন করিয়া রাখিব? ও হো! কি হইল? (৩। অশ্রুবর্ষণ)

ন আইনের বলে আমরা সাহেবের বজ্রহৃদয় কাঁপাইয়া দিয়াছিলাম। ন আইনের কৃপায় আমরা জগৎ জয়ী ইংরেজের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলাম। বিনা অস্ত্রে, বিনা শস্ত্রে, নির্ব্বান্ধব যে আমরা—আমরাও রাজ্যে বিদ্রোহ করাইতে, রাজবিপ্লব ঘটাইতে, লোকের চালে চালে স্বাধীনতার ধ্বজা উড়াইতে, আমাদের চিরশত্রু বাবুগণেরও মাথা মুড়াইতে সক্ষম হইয়াছিলাম। এত গুণের ন আইন আমাদের কে হরিয়া নিল? (৪। দন্ত ঘর্ষণ)

যে দিন হইতে আমাদের ন আইনের ডঙ্কা বাজিয়াছিল, সেই দিন হইতে আমরা কত উন্নতই হইয়াছিলাম! আমাদের উপর কত চক্ষুই পড়িয়াছিল! মাতৃভাষা যাহাদের পক্ষে কুক্কুর দষ্ট ব্যক্তির জল স্বরূপ আতঙ্ক উৎপাদক, এমন কত কত বাবুও আমাদের নাম করিয়া, চীৎকারে গগন ফাটাইয়া বাগ্মীর যশোলাভ করিয়াছিল। যাহারা বাঙ্গালার ব জানে না, এমন কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাহেব, বর্ষে বর্ষে কত বিজ্ঞাপনীই আমাদের নামে লিখিয়া অমরত্ব লাভ করিতেছিল। মহামহামন্ত্রী-সম্প্রদায় গভীর রজনীতে গুপ্ত গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমাদের জন্য কত যন্ত্রণাই করিতেছিল। কিন্তু হায় অদ্য! অদ্য আমরা

কোথায় ? কাল আমরা বীর ছিলাম, সিংহের সমকক্ষ ছিলাম, আজ সেই আমরা কাপুরুষ, শৃগালেরও অধম ! এখন কি আবার ভেকের পদাঘাত সহ্য করিতে হইবে ! এখন কি আবার বাবুদের উত্তোলিত নাসার তিরস্কার সহ্য করিতে হইবে ? এখন কি আবার সেই অরণ্যে রোদন আরম্ভ করিতে হইবে ? হায় ! অদৃষ্টে কি এই ছিল ? ন আইন, তুমি কি ছলিবার জন্য, আমাদিগকে এমনি তুলিয়া আবার ফেলিবার জন্যই আসিয়াছিলে ? আদরের উৎস ন আইন ! কে তোমার চাঁদমুখে পাথর চাপাইয়া দিল ? হায় ! কি ছিলাম, কি হইলাম ! অহো, কি অধঃপাত ! (৫। বক্ষে বঁটীর আঘাত, পতন ও মূর্চ্ছা)

রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা।

ইতিমধ্যে বাখরগঞ্জের জজ কম্পবেল সাহেবের বাসার সরহদ্দে জনেক ব্রাহ্মণ কনষ্টেবল পাইখানাকৃত্য সমাধা করাতে, জজ কম্পবেল উক্ত ব্রাহ্মণের স্বহস্তে তৎকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া লন। বাঙ্গালার ক্ষুদ্র লাট তজ্জন্য জজ সাহেবের শাস্তির জন্য তাহাকে অপদস্থ অর্থাৎ জজ হইতে জাণ্টু মেজেষ্টর করিয়া দিয়াছেন।

অপর, জঙ্গীপুরের মহকুমাতে গোরু ছিনাইয়া লইবার মোকদ্দমায় ডিপুটী মেজেষ্টর অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর উপযুক্ত সাজা না দেওয়াতে

অর্থাৎ আসামীকে কয়েদ না করিয়া জরিমানা করাতে মুর্শিদাবাদের খোদ মেজেষ্টর মৌশলি সাহেব ডিপুটী-মেজেষ্টর বাহাদুরের ভ্রম দেখাইয়া এক খণ্ড হাফ সরকারি পত্র তাঁহার বরাবর লেখেন। পুনশ্চ, ক্ষতিগ্রস্ত নীলকর সাহেব পুনর্ব্বার গোরু ছিনাইয়া লওয়ার অপরাধে সাবেক বকেয়া আসামী এক্তার মণ্ডলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার নালিশ করায় ডিপুটী বাবু নিজ রায়ে খোদ মেজেষ্টরের সেই চিঠির উল্লেখ করিয়া এক্তার মণ্ডল আসামীকে বিলক্ষণ মেয়াদ ঠুকিয়া দেন। তাদৃশ কঠিন সাজা দিতে আইন মতে ডিপুটী বাবুর এক্তার না থাকা কথিতে উক্ত এক্তার মণ্ডল জেলার জজ আদালতে আপীল দায়ের করে। খোদ মেজেষ্টর কায়িক দণ্ড দিবার উপদেশ দিয়া যে পত্র লেখেন, তাহা ডিপুটী রায় বাহাদুরের রায়ে প্রকাশ থাকাতে জেলার জজ ঐ খোদ মেজেষ্টর সাহেবকে বলেন যে, এ প্রকার পত্র লিখিলে ভবিষ্যতে মেজেষ্টর সাহেব বাহাদুরের খারাবি হইতে পারে। খোদ মেজেষ্টর ইহাতে রাগত হইয়া জঙ্গীপুরে শুভাগমন ও ডিপুটী বাবুকে তলব করিয়া স্পষ্টাক্ষরে মুখের উপর বলিয়া দেন, যে, তাহার পত্রের কথা রায়ের ভিতর প্রকাশ করিয়া দেওয়াতে ডিপুটীর বোকামি অথবা সার্কি বজ্জাতি জানা যাইতেছে। তাহাতে ডিপুটী রায় বাহাদুর অপমান জ্ঞান করিয়া কমিশনর সাহেবের হজুরে মনঃকষ্ট জ্ঞাপন করাতে কমিশনর

সাহেব তজ্জন্য ডিপুটীর বেতন কমাইয়া দিয়া অপদস্থ করণ জন্য বাঙ্গালার ক্ষুদ্র লাট সাহেবের সদনে সুপারিশ করেন। ক্ষুদ্র লাট ডিপুটী বাহাদুরকে মহকুমায় থাকিবার অযোগ্য বিবেচনা করিয়া জেলাতে বদলি করিয়া দিয়াছেন। এবং বজ্জাতি শব্দের অর্থ বজ্জাতি মাত্র তদতিরিক্ত কিছু নহে, এই কথা বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত মৌশলি সাহেবকে অনুরোধ করিয়াছেন, যে অতুল বাবুকে সেই মর্ম্মে এক পত্র লেখা হয়।

বাঙ্গালার লাট সাহেবের এই দুই বিচারকার্য্য পর্য্যালোচনার জন্য পঞ্চানন্দ সমীপে পেশ হইয়াছে।

প্রথমতঃ কম্পাবেল সাহেবের অধোগতি দর্শনে পঞ্চানন্দ দুঃখিত হইয়াছেন। সাহেব হইতেছেন রাজকুল, সে কুলে কালি দেওয়াতে লাট সাহেবেরই অবিবেচনা প্রকাশ পাইতেছে। যে ব্যক্তি আত্মকলঙ্ক গোপন করিতে জানে না, সে লোকের হস্তে লাটগিরি রাখা উচিত কি না পঞ্চানন্দ তাহার বিবেচনা পশ্চাৎ করিবেন।

দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালীদের মনে এ প্রকার ভ্রম হওয়া আশ্চর্য্য নহে যে, কনষ্টেবলের দরখাস্তেই বুঝি জজ সাহেবের চাকরি গেল। অথচ এরূপ ধারণা জন্মিয়া গেলে, এবং প্রকৃত পক্ষে কনষ্টেবলের কথায় জজ সাহেব হেন ব্যক্তিকে অপদস্থ হইতে হইলে, ইহার পর রাজকার্য্যে সাহেব লোক পাওয়াই দুঃসাধ্য হইবে। এদিকে সাহেব লোক যদি বিরক্ত হইয়া বদ-

দেশে আর চাকরি স্বীকার না করেন, তাহা হইলে বাঙ্গধিকার বৃথা, সমুদ্র লঙ্ঘন বৃথা, আর মিথ্যা-কথাতে-দশানন-রূপী বঙ্গবাসীর পুরী ছারক্ষার করাও বৃথা।

সুতরাং হয় লাট সাহেব কম্পবেলের জজিয়তি কম্পবেলকে পুনঃপ্রদান করুন ; নতুবা, যদি অভ্যন্তরের কোনও গূঢ় কথা থাকে, তাহা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়া দুরাশী বঙ্গবাসীর ভ্রম দূর করুন।

মৌশলির অতুল-কীর্ত্তি সম্বন্ধে লাটের বিচার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর না হইলেও পূর্ব্ববৎ মন্দ হয় নাই। লাট-বুদ্ধির উন্নতি দেখিয়া পঞ্চানন্দের আশ্বাস হইয়াছে।

অত্যাচার কাহাকে বলে অতুল বাবু তাহা জানেন না। নচেৎ গরু ছিনাইয়া লওয়ার মোকদ্দমাতে তাদৃশ অল্প দণ্ড দিতেন না। ইহাতে জানা যায় যে অতুল বাবুর নীলের চাষ নাই।

আইনে সাজার চূড়ান্ত সীমা লিখিয়া দেয়, অপ-রাধ বুঝিয়া, অপরাধীর সেই দণ্ডের তারতম্য করাই হাকিমের কর্ম্ম। অতুল বাবুর প্রতি দয়া করিয়া কোন্ মোকদ্দমায় কি আন্দাজ সাজা দেওয়া উচিত মৌশলি সাহেব ইহা দেখাইয়া দেওয়াতে, তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। কারণ হাকিম হইয়া যে বুদ্ধিটুকু খাটাইতে হয়, অতুল বাবুর আর তাহা খাটাইতে হইত না, অথচ পুরা মাহিয়ানাটা বাক্সগত হইতে পারিত। এ সামান্য কথা অতুল বাবু বোঝেন নাই, সুতরাং খোদ মেজেষ্টর মৌশলি সাহেব

যে তাহাকে স্বয়ং নিজ মুখে বোকা বলিয়াছিলেন, তাহা অন্যায় নহে। তবে বোকাকে বোকা জানিয়াও বোকা বলিতে না পাইব, তবে কি বলিব? মৌশলি সাহেব যে স্পষ্টবাদী সরলভাষী সত্যপ্রিয়, ইহা লাট সাহেব বুঝিতে পারেন নাই।

লাট সাহেব বলিয়াছেন যে, বজ্জাত শব্দটা কিছু রূঢ়, সুতরাং মৌশলি সাহেবের এমন শব্দ প্রয়োগ না করাই উচিত ছিল। মৌশলি সাহেব দেখাইয়াছেন যে এই শব্দের চলিত অর্থ তত মন্দ নহে। বঙ্গভাষায় যাহার এ প্রকার গাঢ় জ্ঞান, অবসর বুঝিয়া যিনি শ্লেষ করিতে জানেন, তাহাকে ভাষা জ্ঞানের জন্য পুরস্কার না দিয়া তিরস্কার করা যে কাঁহাতক অবিবেচনার কাজ হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। এতদ্ভিন্ন একজন সাহেব যে বঙ্গভাষায় গালি দিয়াছেন, ইহাতে ভাষার গৌরব, সাহিত্যের সম্মান, এবং অতুল বাবুর সৌভাগ্য মনে করা উচিত। যে অতুল বাবু বাঙ্গালী হইয়াও এ কথা বুঝেন নাই, তাঁহাকে বাঙ্গলাদেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়া হিন্দিভাষী পূর্ণিয়া জেলাতে বদলি করিয়া দেওয়া সৎপরামর্শের কাজ হইয়াছে।

প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে লাট সাহেবকে এই পর্য্যন্ত দেখাইয়া দিয়াই পঞ্চানন্দ অদ্য পুঁথিতে ডোর বাঁধিলেন।

বিদেশের সংবাদ।

১

বেঞ্জামিন ডিজ্‌রেলি ওরফে আর্ল্‌ বিকন্সফীল্‌ড নামক এক ব্যক্তি ইংলণ্ডে লোকলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তিনি জাতিতে ইহুদি, ব্যবসায়ে পুস্তক-লেখক ছিলেন; আর, মধ্যে বারেক দুইবার তিনি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। বলিয়া রাখা উচিত যে, ইংলণ্ডে মন্ত্রী হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; সকলেরই মন্ত্রী হইবার অধিকার আছে। এই লোক-টার মৃত্যু উপলক্ষ করিয়া অনেকে বিস্তর কাগজ কালি নষ্ট করিয়াছে, আর যাহার মনে, যে কথার উদয় হইয়াছে, তাহাই বলিয়া ফেলিয়াছে।

পঞ্চানন্দ বিবেচনা করেন যে, বেঞ্জামিনের জন্য বঙ্গবাসীর মাথা ব্যথা, অন্যায় কথা। এ দেশে অনেক গ্রন্থকার আছেন; কিন্তু বঙ্গবাসী সারগ্রাহী, সুবিবেচক এবং প্রতারিত হইবার পাত্র নহে, সেই জন্য সে সকল গ্রন্থ বড় একটা বিকায় না; ইংলণ্ডের লোক বোকা, তাই ডিজ্‌রেলির পুস্তকের এত পসার।

আর, ইহুদি হইয়াও ডিজ্‌রেলি মন্ত্রিত্ব পাইয়াছিলেন বলিয়াই যে, গৌরব করিতে হইবে, তাহারও কোনও অর্থ নাই। ডিজ্‌রেলি স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টান হওয়াতেই এরূপ ঘটিয়াছিল; তা এ দেশেও অনেকে জাতি দিয়া মেমের সঙ্গে নাচিতে পাইয়াছেন। সুতরাং ইহাতে প্রশংসার কিছুই নাই।

টের পাইতেন, ডিজ্‌রেলি যদি এ দেশে জন্ম গ্রহণ করিতেন। পুঁথির খশড়া বগলে করিয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিলেও তাঁহার রোজ অন্ন যোটা ভার হইত। সই সুপারিশের জোর থাকিলে বেঞ্জুমিঁয়া বড় জোর একটা ডিপুটিগিরি পাইতেন। (মনে থাকে যেন, তাঁহার বি, এল্ পাস ছিল না, মফঃস্বলে তিন বৎসর মোক্তারের খোশামোদও করেন নাই, সুতরাং মুন্‌সুফি হইবার কোনও আশাই ছিল না)।

তাহার উপর সেলামের কেতা দোরস্ত থাকিলে, আর সাহেবদের বাড়া বাড়া দু বেলা ঘুরিয়া সত্য মিথ্যা দশটা বলিবার ক্ষমতা থাকিলে, বেনু চাচা হদ্দ খাঁ বাহাদুর হইতে পারিতেন। বাস্তবিক এ দেশে কাহারও চালাকি খাটে না; ইংলণ্ড বোকার জায়গা সেখানে সবই হইতে পারে। তবে কি ডিজ্‌রেলির কথা লইয়া বাড়াবাড়ি কাড়াকাড়ি করা এ দেশে ভালো দেখায়?

২।

আরও একটা লোক ইউরোপে মারা গিয়াছে,—রুষিয়ার জার।

এ মৃত্যুর বিচার কঠিন সমস্যা। রুষিয়া-সন্তানগণের ভয়ানক আক্রোশ, তাহারা জার রাখিবে না। প্রজার মনোরঞ্জন করে এমন ভূস্বামী তাহারা চায়। এ ভাবে দেখিতে গেলে প্রজাদের দোষ মনে হয় না। বাস্তবিক, চক্ষের উপর এ অত্যাচার সহিবে কেন?

আর লোকের যদি অসহ্য হয়, তবে জারই বা কতক্ষণ থাকিতে পারে?

আর এক পক্ষে মনে হয় প্রজারা মিলিয়া মিশিয়া সহিয়া বহিয়া থাকে না কেন? বঙ্গ দেশের প্রজা কেমন ভাল মানুষ!—ক্ষুদ্র জমীদারকেও ভূস্বামী নাম দিয়া কত আদর, কত ভক্তি, কত যত্ন, কত সম্মান করে! অথচ সকলেই জানে যে, ইহারা জারেরও অধম। অদ্য সূর্য্যাস্তে আবাহন, কল্যকার সূর্য্যাস্তে বিসর্জ্জন। তবে কি জানো, এখানে ধরণী সর্ব্বংসহা।

ভালো হউক, মন্দ হউক, এ কথাতেও বঙ্গবাসীর, ভারতবাসীর না থাকাই উচিত; এ দেশেরও ভাবনা ভাবিবারও কোনও হেতু নাই; যেহেতু আমাদের মালিক—মহারাণী ভারতেশ্বরী!

রিউটার প্রেরিত তারের খবর।

বিলাত,

আষাঢ় মাস, অপরাহ্ণ।

মেস্তর লালমোহন ঘোস ভারতবর্ষে যাইবার উদ্দেশে জাহাজের তক্তার উপর পা দিয়াছেন।

তাঁহার সহিত লাট রিপনের বরাবর এই মর্ম্মের এক চিঠি গ্লাডস্টোন সাহেব পাঠাইয়াছেন;—"বাবা-জীবনের প্রমুখাৎ সকল সমাচার অবগত হইবা। তেঁই বোম্বাই মোকামে পদার্পণ করিবার অগ্রেই পত্র পাঠ মাত্র, ছাপার আইন, অস্ত্রের আইন, দণ্ডের আইন এবং

যাবদীয় টেক্স উঠাইয়া দিবা। ভারতবর্ষে আমাদের তরফ যে সকল আমলা ও নগদী পাইক ইত্যাদি থাকিবে, তাহাদের বাসাখরচ ও অন্য অন্য খরচ বরদারির টাকা এথা হইতে পাঠান যাইবেক। নহিলে লিবারেল অর্থাৎ বদান্য নামে কলঙ্ক হইবেক।

তোমাকে চাকরি দেওয়াতে ভারি বিভ্রাট উপস্থিত। বাবাজীবন যদি সম্মত হয়েন, ইহাঁর হস্তে আদায় তহশীলের কাগজ পত্র এবং তহবিল সমঝাইয়া দিয়া তুমি ফেরত জাহাজে বাটী রওয়ানা হইবা। নিতান্তই যদি বাবাজীবনের অমত হয়, তাহা হইলে নবাব আবদুল মিয়াঁকে ভার দিতে পারিবা। তেঁই বড় লায়েক আদমি এবং আমাদের নিতান্ত অনুগত।

আসিবার কালীন এথাকার মিউজিয়মে রাখিবার জন্য মহারাজা, রাজা, নবাব, রায়বাহাদুর, খাঁবাহাদুর প্রভৃতি আমাদের সৃষ্টির এক এক নমূনা, এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান, ও ইণ্ডিয়ান সভার এক এক সভ্য সঙ্গে আনিবা। জীয়ন্ত না পাওয়া যায়, মরা আনিলেও চলিতে পারিবে।

নাস্তিক ব্রাডলা পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করায়, তাহার বিলক্ষণ নাকাল হইতেছে—এ কথা বুঝাইয়া দিয়া মিরারকে সান্ত্বনা দিবা এবং চিন্তা করিতে নিষেধ করিবা ও ব্রাহ্মমতে গোবরের শিবপূজা করিতে উপদেশ দিবা।”

“পঞ্চানন্দ” পাঠ করিবার অভিপ্রায়ে মহারাণী

বাঙ্গালা ভাষা শিখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। বাঙ্গালা পরীক্ষা দিয়া হাজার টাকা পুরস্কার-প্রাপ্ত-হওয়া জনৈক ইংরেজ ঐ কর্ম্মের জন্য মনোনীত হইয়াছেন। নাম টের পাওয়া যায় নাই। চীনের সহিত রুসিয়ার যে যুদ্ধ হইতেছে তাহাতে চীনের সাহায্য জন্য যুদ্ধের অর্দ্ধেক ব্যয় ভারতবর্ষের ধনাগার হইতে দিবার প্রস্তাব হইতেছে। ফসেট ইহাতে আপত্তি করিবেন।

দেশহিতৈষিতার ইতিহাস।

(প্রাপ্ত পত্র।)

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন্দ ঠাকুর

শ্রীপদপল্লবাশ্রয়েষু।

দণ্ডবৎ প্রণামা নিবেদনঞ্চৈতৎ

আমি ঘোর বিপদে পড়িয়াছি, আপনার শ্রীচরণে শরণ লইতেছি, উচিত আদেশ করিয়া এ দাসকে এ মহাশঙ্কট হইতে উদ্ধার করিতে আজ্ঞা হয়। আমি একজন পল্লীগ্রামবাসী ক্ষুদ্র জমীদার। আগে আগে খাইয়া পরিয়া দুদশ টাকা আমার উদ্বৃত্ত হইত, সেই জন্য সামান্য সামান্য লোককে কর্জ্জটা আসটা কখনও কখনও দেওয়া হইত। সরকার বাহাদুরকে যথা-সময়ে রাজস্ব দিই, আলি পথে পাল্কীযোগে এ গ্রাম হইতে ও গ্রাম যাই বলিয়া পথকর দিই, কি জন্য

বলিতে পারি না, কিন্তু আরও একটা কর দিই, লাইসেন দিই, বেয়ারিং চিঠির মাশুল আর নগদ টিকিটের দাম ছাড়া ডাকফণ্ড দিই, আর সরকার হইতে যখন যে কাগজপত্র তলব হয়, তাহাও দিই। এই সকল বিষয়ে আমি কখনও ত্রুটি গাফিলি কিম্বা আপত্তি করি নাই।

বিষয়রক্ষা করিতে হইলে কালেভদ্রে মামলাটা মোকদ্দমাটা করিতে হয়। যে মোকদ্দমায় আমার পরাজয় হয়, তাহাতে ঘর হইতে কিছু যাইবারই কথা, কিন্তু যে মোকদ্দমায় জয়লাভ করি, তাহাতেও আসল গণ্ডা কখনই পোষাইল না; উকীল, মোক্তার, সাক্ষী, আমলা সকলেই যথাশাস্ত্র আপন আপন অংশ লইতে লইতে আমার ভাগ্যে অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকে।

সরকার বাহাদুরের খাজানা যথা সময়ে দাখিল করিতে পাই বলিয়া, সে অনুগ্রহের দক্ষিণা দিয়া থাকি; পুলিশের এলাকায় বাস করি বলিয়া নিত্য পূজার উপর সময়ে সময়ে মানসিক দিয়া থাকি।

হাকিমহুকুম সাহেব সুবা গের্দ্দিয়ারিতে এ অঞ্চলে আসিলে খাসীটা মুর্গীটা, শাকটা ফলটা ভক্তি পূর্ব্বক যোগাইয়া থাকি। হুজুরী কোনও সর্দ্দার লোকের প্রয়োজন হইলে ধার করিয়া হাতী ঘোড়া পর্য্যন্ত সরবরাহ করি।

আমার সৌভাগ্যবলেই যে এ সকল করিতে পাই, তাহা আমি জানি, এবং শতসহস্র বার স্বীকার করি।

স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, খোদ জজ মেজেষ্টর পর্য্যন্ত দায়ে অদায়ে আমাকে স্মরণ করিয়া চরিতার্থ করিয়া থাকেন। তাঁহারা যে আমার ন্যায় দীনহীন অকিঞ্চনকে স্মরণ করেন, সেই জন্য হাঁসপাতালের টেক্স, ইস্কুলের টেক্স, অলিঙ্গ কালঙ্গের কাঙ্গালী বিদায়ের টেক্স, ভোজ সমারোহের টেক্স—যখন যাহা তলব হয়, তৎক্ষণাৎ বাড়ীর গহনা পত্র বাঁধা দিয়াও হুকুম তামিল করিয়া থাকি। অধিক কি বলিব, এই খয়েরখাঁহীতে আমার ঘরে কিঞ্চিৎ দেনা প্রবেশ করিয়াছে; তথাপি দেবকৃত্য পিতৃকৃত্য কমশম করিয়া দিয়া এক প্রকার চালাইয়া আসিতেছিলাম।

এখন উপস্থিত বিপদ এই যে, অদ্য এক ইংরেজী পরোয়ানা হুজুর লোক হইতে স্বাগত হইয়াছে, গ্রামের মাষ্টের মহাশয় তাহা পড়িয়া বলিতেছেন, যে, দেশহিতৈষিতার তহবিলে টাকা জমা দিবার হুকুম আমার প্রতি হইয়াছে। মাষ্টের মহাশয় বলিতেছেন যে,এইবার আমি হুজুর হইতে বাহাদুরি পাইলেও পাইতে পারি।

এখন উপায় কি? দেশহিতৈষিতা কাহাকে বলে তাহা আমার কোনও কর্ম্মচারী কিম্বা গ্রামবাসী লোক, কিম্বা পঞ্চক্রোশের মধ্যে কোনও লোক, আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারে নাই। কেহ কেহ বলিতেছে যে, লড়াই করিতে মানুষ কাটা পড়িয়াছে, সেই জন্য টাকা দিতে হইবে। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, মারামারি

করিতে গেলেই খুন জখম হইয়া থাকে, সে জন্য আমাকে কেন টাকা দিতে হইবে? সুতরাং এ কথাটা নিতান্ত অলীক বলিয়াই বোধ হইতেছে। দ্বিতীয় কথা এই যে, দেশহিতৈষিতার যদি একটা তহবিল থাকে, তবে আমাকে সে তহবিলে জমা দিতে হইবে কেন? যাহার তহবিল, সে বুঝিয়া সুঝিয়া তাহার জমাখরচ নিকাশ নিষ্পত্তি করিবে; আমি তাহতে জমা দিতে যাইব কেন? আর সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কথা এই যে, আমার মোটে টাকা নাই, তাহার জমা দিব কি? ধার করিয়া জমা দেওয়াতেও ক্ষতি বৈ লাভ নাই। সুতরাং সরকার বাহাদুরের এমন অভিপ্রায় কখনই হইতে পারে না। সেই জন্য মহাশয়ের নিকট ভিক্ষা যে, ইহার আসল ব্যাওরাটা আমাকে জানাইবেন, আমি শ্রীচরণে বিক্রীত হইয়া থাকিব।

মাষ্টের মহাশয় যে বাহাদুরির কথা বলেন, তাহা-রই বা ভাবখানা কি? ঘরে না থাকিলেও দিতে পারাতে বাহাদুরি হইতে পারে, কিন্তু সে বাহাদুরি লইয়া কাজ কি? সরকার বাহাদুর এমন বাহাদুরি দিবেন কেন? তবে যদি হুকুম এইরূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। আপনি তাহাও জানাইলে আমার পরম উপকার হয়। তাহা হইলে নাকি, গাই না থাকিলেও বলদ দুইয়া দুধ দেওয়া এবং বাহাদুরি লওয়া আবশ্যক।

আমি ভাবিয়া কূল কিনারা পাইতেছি না। যদি

টাকা জমা দিতেই হয়, তবে ফেরত পাওয়া যাইবে কি না, এবং কত দিনে কি নিয়মে ফেরত পাওয়া যাইবে, তাহা জানিতে ইচ্ছা। ফেরত পাওয়া যদি না যায়, তাহা হইলে কিস্তিবন্দী করিয়া টাকা দেওয়া চলে কি না, অথবা বেবাক টাকার তমঃস্বক লিখিয়া দিলে সদ্য নিস্তার পাওয়া যাইবেক কি না, তাহাও জানিতে চাহি।

আপনি নাকি সদর জায়গায় থাকেন, আর সকল মুলুকের আসল খবর রাখেন, এইরূপ শুনা আছে, সেই জন্যই আপনাকে জিজ্ঞাসা। ইহা শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

সেবক

শ্রীএককড়ি রায় দাসস্য।

পুঃ নিবেদন,

এই সকল কথার উত্তর পাইলে, আপনি যদি আমার জেলার মোক্তারিপদ লইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সালিয়ানা আড়াই টাকা বেতনে আপনাকে নিযুক্ত করিতে পারি, ইতি।

[পাঁচ টাকা হউক ভালো, না হউক ভালো, পঞ্চানন্দ এ সকল বিষয়ে পরামর্শ দিতে অসমর্থ। যে স্থলে, "দিলে প্রাণ যায়, না দিলে মান যায়" সে স্থলে বোধ হয় কেহই কিছু বলিতে ইচ্ছা করে না। বিশেষতঃ, রাজা প্রজার কথা, পঞ্চানন্দ ইহাতে একেবারে নীরব। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই ইহার কারণ বোঝা যাইবে।

প্রজার "আশা" বলিলে হৃদয় প্রফুল্ল হয়; আবার রাজা রাজড়ার সেই "আশা" বলিলেই "সোঁটা" মনে পড়িয়া রক্ত শুখাইয়া যায়। যাঁহারা রাজা প্রজার অভিধান উত্তম রূপ জানেন, তাঁহারাই রায়জীর সমস্যা পূরণ করিবেন।

পঞ্চানন্দ।]

সুরেন্দ্রায়ণ।

দেবচরিত্রে মুখবন্ধ।

পঞ্চানন্দ দেবতা, সুতরাং ইচ্ছা অনুসারে কখনও মুক্তদেহ, কখনও যুক্তদেহ।

এতদিন পঞ্চানন্দ মুক্তদেহ ছিলেন,—সে পেটের দায়ে; এখন যুক্তদেহ হইলেন,—সখ করিয়া। ফল কথা, বায়ূনাং বিচিত্রাগতিঃ। সেই জন্য সম্প্রতি পঞ্চানন্দের ছায়া বঙ্গবাসীর কায়াতে মিশিয়া গেল। বাস্তবিক পঞ্চানন্দ ত বঙ্গবাসার জন্যই আবির্ভূত।

তবে যুক্তই হউন, আর মুক্তই হউন, পঞ্চানন্দ আপন আত্মা বজায় রাখিবেন, নিজের কোট কখনও ছাড়িবেন না। দেবত্বের গুণে, পঞ্চানন্দ বঙ্গবাসীর সহিত এক হইয়াও পৃথক রহিলেন; পঞ্চানন্দের ঝোঁক বঙ্গবাসী লইতে পারিবে না, সুতরাং হইবে না; আর পঞ্চানন্দ আপন ঝোকেই অস্থির, কাজে কাজেই বঙ্গবাসীর জন্য ঝুঁকি হইবেন না।

যেখানে ভারতের বিদ্যা বাহির হয়, হীরার লাঞ্ছনা হয়, সুন্দরকে সন্ন্যাসী হইতে হয়, পঞ্চানন্দ সেই বর্দ্ধমানপুরেই বর্ত্তমান রহিলেন। আর যাহাই হউক, ঠিকানা ঠিক রহিল।

পঞ্চানন্দ অমূল্য; এবার তাহার লৌকিক প্রমাণ

উপস্থিত। অনর্থের-মূল অর্থ লইয়া পঞ্চানন্দ বঙ্গবাসীকে নিঃসম্বল করিতে ইচ্ছুক নহেন, বরং বঙ্গবাসী কালক্রমে কুবেরত্ব লাভ করিলেই পঞ্চানন্দ সুখী হইবেন।

আইস ভাই! সকলে মিলিয়া পঞ্চানন্দের এই বদান্যতাকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করা যাউক।

সমস্ত মাটী।

সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যের গণ্ডগোলে সব মাটী হইল। বোকা লোকে এই সোজা কথাটা বুঝিতেছে না, বুঝাই-লেও বুঝিবে কি না সন্দেহ। তবু আমার যে রকম গায়ের জ্বালা ধরিয়াছে, না বুঝাইয়াও আর থাকিতে পারিলাম না।

প্রথম মাটী.—খোদ পঞ্চানন্দ।

দিব্য পরমানন্দে নিদ্রা যাইতেছিলাম; আমার জগৎযোড়া খোস নাম, বাঙ্গালার সুখময় পরিণাম, ইত্যাদি সম্বন্ধে কত মনোহর স্বপ্ন দেখিতেছিলাম;—এমন ঘুমটী আমার ভাঙ্গিয়া গেল। মাঝে মাঝে জাগিয়াছিলাম বটে, কিন্তু কথাটী কহি নাই; অলৌ-কিক প্রতিভার লক্ষণ—নিরবচ্ছিন্ন আলস্য; "জীনি য়সের" প্রকৃত পরিচয়,—নিষ্পন্দ কুঁড়েমি; ইহা জানিয়া, ইহা ভাবিয়া, কথাটী না কহিয়া, পাশ ফিরিয়া শুইতেছিলাম, আবার ঘুমাইতেছিলাম। এত সাধের ঘুম আবার ভাঙ্গিয়া গেল, আবার আমাকে ইতর প্রাণীর মত কথা কহিতে হইল। এত হট্টগোলে কি ঘুম হয়?

এমনতর বিরক্ত করিলে কথা না কহিয়া কি থাকা যায়?

যেদিন বে-এক্তেয়ার খিলিজি সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র সম্বল করিয়া, নীরবে নবদ্বীপ প্রবেশ পূর্ব্বক বঙ্গদেশ করতলস্থ করিল, সেদিন এত গোল না হইবারই কথা। কিন্তু পলাসীর যুদ্ধও ত শুনিয়াছি!—(শুনিয়াছি; কেন না, চক্ষু চাহিয়া কষ্ট স্বীকার করিয়া কোনও কিছু দেখা আমার অভ্যাস নহে; একটু কাণ লম্বা হইলেই যে কাজ হয়, তাহার জন্য চক্ষুর অপব্যয় করাটা আমাদের মত বিরাট বুদ্ধিমন্ত দেবজাতির লক্ষণ নহে)—পলাসীর যুদ্ধ শুনিয়াছি, এত গোল ত হয় নাই; বক্সরের লড়াই হইয়াছে, এত গোল হয় নাই, সেদিনকার সিপাই হাঙ্গামাতে এমন গোল হয় নাই; আত্মশাসন সম্বন্ধে মহালাটের অনুষ্ঠানপত্র পাঠ মাত্র যেদিন বঙ্গদেশ স্বাধীন হইল, সেদিনও এমন গোল হয় নাই। তাহার পর বাঙ্গালী মাত্রেই অবাধে ইংরেজদিগকে কারারুদ্ধ করিবে, দ্বীপচালান করিয়া দিবে, এই সুব্যবস্থার সূচনা যখন হইল, তখনও এত গোল হয় নাই। আজি তবে কেন বাপু এমন? কথাটা কি, না, সুরেন্দ্র কারাসাৎ হইয়াছে! উত্তম হইয়াছে, তাহার এত গোল কেন? বরং হিসাব করিয়া বুঝিতে গেলে গোল থামিবারই কথা। পৃথিবীতে শান্তির আবির্ভাব হইবারই কথা। তা না, কেবল গোল, কেবল হৈহৈ রৈরৈ শব্দ। জিজ্ঞাসা করি, ইহাতে কি

ঘুমানো যায় ? বলো দেখি, এত গোলযোগের পরে কি অলৌকিক প্রতিভার লক্ষণ অক্ষুণ্ণ রাখা যায় ? এখন এই আমায় জাগিতে হইল, কথা কহিতে হইল, মাটী হইতে হইল। আমি বেশ ছিলাম ; সুরেন্দ্র জেলে গেল, আমাকে একেবারে মাটী করিয়া গেল। সামান্য নরলোক সুরেন্দ্র, জেলে গিয়া বিশ কোটি মানুষের বুকের উপর সিংহাসন পাতিয়া আমাকে টিটকারি করিতেছে ; আর আমি দেবতা—জেলখানার ফটকের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলাম। এতে কে না মাটী হয় ? আমি ত একেবারে ডাহা মাটী !

তার পর মাটী,—দেবতা।

আমারই জাতি জ্ঞাতি, একচ্ছিদ্র শালগ্রামই হউন, আর নবদ্বার বিশিষ্ট বিগ্রহই হউন, তিনিও বিলক্ষণ মাটী। সুরেন্দ্র জেলে যাইবার আগেই তিনি কতক মাটী হইয়াছিলেন, অন্তত এক শ বছরের কম বয়সের পাথর হইয়াছিলেন ! তবে ঠাকুরের কিছু ইজ্জত ছিল, তাঁহার হইয়া দুজন হিন্দু খ্রীষ্টানে যুক্তি করিয়া মেথরের ঝাড়ুপূত বারাণ্ডায় ঠাকুরকে বসিতে দিয়াছিল, বিশেষ নাস্তানাবুদের কারখানা কেহ কিছু করে নাই, অন্তত বিশেষ কিছু প্রকাশ পায় নাই ;—অন্তর্যামী ঠাকুর অন্তরের কথা অন্তরে রাখিয়া দিলেই আর গোল হইত না। কিন্তু সুরেন্দ্র জেলে যাওয়াতে

ঠাকুরটী একেবারে মাটী। সাধ করিয়াই হউক, আর দায়ে পড়িয়াই হউক, ঠাকুর সেই তিলকে তাল করিয়াছেন; করিয়া হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খ্রীষ্টান, নানকপন্থী, অঘোরপন্থী, সকলের শরণাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। এখন তাঁহার মরা ইজ্জতের জন্য পথে ঘাটে, হাটে মাঠে, যত্র তত্র কেবল কান্নাহাটি পড়িয়া গিয়াছে। লজ্জার কথা বলিব কি, উইলসেন পাণ্ডার বিরাটপূর্ব্ব নামক মহাতীর্থের হিন্দুযাত্রীরাই এখন তাঁহার প্রধান সহায় বলিয়া লোকের মাঝে রাষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। এতে যদি ঠাকুর মাটী না হয়, তবে আর কিসে মাটী হইবে?

চূড়ান্ত মাটী—হাইকোর্ট।

বিচারক নরেশচন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে কর্ত্তা-বিচারকের কাছে উপস্থিত। বলিলেন,—"দাদা, ঐ বাঁড়ুয্যেদের সুরেন ঐ যে ছোঁড়া চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে দেশের লোককে ক্ষেপায়; ঐ সুরেন আমায় যা'চ্ছে তাই বোলে গালাগাল দেচে, আমায় কত কি বোলেচে, আমায় বড্ড অপমান কোরেচে, ওর একটা কিছু কবো, নৈলে এ প্রাণ আমি রাক্‌বো না, এ মুক আর আমি দেখাবো না। এর আগে কতবার কত কতা বোলেচে, তা আমি কিছু বোলতে পারি নি। এবার আমার কোনও দোষ ছেলো না, মিচি মিচি আমায় যা'চ্ছে তাই বোলেচে, তোমার পায়ে হাত দে বলচি দাদা, এবার

আমার কিছু দোষ নেই। আমি তো ভালো মন্দ কিচু জানিনে, তা স্মুক্কে যাকে পেইচি, তাকেই জিজ্ঞেস্ কোরে তবে কাজ কোরেচি; তা তাদের কিচু না বোলে সুরেন্ কেন আমায় গাল দেবে? এর বিহিত একটা কোত্তেই হবে; নৈলে দাদা—অঁ্যা অঁ্যা —আমি বুঝি শস্তা হাকিম বোলে—অঁ্যা—আমি বুঝি কম দরের লোক বোলে—অঁ্যা” বলিতে বলিতে দর-বিগলিত নয়ন-ধারায় নরেশের বক্ষস্থলপ্লাবিত হইয়া গেল।

তখন, জলদ-গম্ভীর স্বরে দাদার জীমূত-মন্দ্র হইল;—

“তবে রে পাষণ্ড ষণ্ড দুষ্ট দুরাচার!
বাঙ্গালী কুলের গ্লানি, অ-সিবিলিয়ান্,
বাঙ্গালী চালক তুই, বাঙ্গালীর মুখে,
দিলি গালি, যা'চ্ছেতাই বলিয়া নরেশে
—কনিষ্ঠ দোসরে মম! নয়নের পানি
নিকালিলি রে নিঠুর, কঠোর ভাষণে
তার প্রতি! অতি কোপে পড়িলি রে আজি,
রক্ষা নাই, রক্ষা নাই, রোষাগ্নি সম্মুখে
মম তোর। ফর্ ফরে অগ্নি-শিখা যথা
উঠয়ে জ্বলিয়া, চালে টিকার আগুন
ফুৎকারিয়া সংযোজিলে,—মধ্যাহ্ন-মারীচে
যে চালের খড় তপ্ত—হায় রে তেমতি
জ্বালাইব তোরে আমি যা থাকে কপালে।
তোয় জ্বালাইতে যদি বঙ্গদেশ জ্বলে,

প্রান্ত হ'তে প্রান্ত যদি অগ্নিময় হয়,
তবু না ডরিব আমি, ক্ষান্ত না হইব।
পুড়েছিল হাত মুখ, তা বোলে কি হনূ—
তোদেরি রামের দাস, তোদেরি সে হনূ—
লঙ্কাচালে লেজানল লাগাইতে কভু
ভুলিয়া ভাবিয়াছিল অগ্র কি পশ্চাৎ ?"
কহিলা নরেশে লক্ষ্যি—যাও ভাই, নিজ
সিংহাসনে উপবেশি,—(বেশি কিছু নয়)—
রুল বাণ হানো গিয়া মন্ত্রপূত করি,
আত্মসার করি আগে; করিতেছি পণ,
তব শিরস্পর্শ করি, এই বাণে হবে,
অ-সুরেন অ-গার্থ বা, ব্যর্থ নাহি বলি।
কিন্তু ভাই এক কথা, যা বোলে সুরেন
তোমারে দিয়াছে গালি, মিছা ত এবার ?"
উত্তরিলা বিচারেশ নরেশ সুমতি,
শান্তভাব পরিগ্রহি, যুড়ি দুই পাণি,
" পূর্ব্বকৃতি, নিতি নিতি, স্মৃতিপথে আনি
গঞ্জে দাদা নিজ দাসে; দোষ কিন্তু আজি
নারিবে বলিতে কেহ, সুধাইবে যারে;
কুগ্রহ আমার, তাই নিগ্রহ প্রকাশি,
অবিশ্বাস করো দাদা, নহিলে, বিগ্রহ
বিরাজে অলিন্দে আজি, তারে স্পর্শ করি
শপথিতে পারি আমি, পারে অন্য লোকে,
সুরেন যা বলিয়াছে, ঠিক সত্য নহে।"

"ধাইল বিষম রুল, শূল সম তেজে,
আনিল সুরেনে ধরি, ভুল ভ্রান্তি কিছু
না মানিয়া, না শুনিয়া, জেলিল সুরেনে।
আপনি আপন মান বজোরে বজায়,
করিয়া বিচারী-বৃন্দ, আনন্দে অপার,
নিজ মাথে নিজে নিজে পুষ্প বরিষিল,
নিজ জয় রবে নিজ ঘর ফাটাইল ;
ভাবিল উল্লাসে অতি, গৌরব বাড়িল।
(ক্ষুদ্র এক কথা কবি কাতরে কহিবে,
ভরসা, সকলে ইহা স্মরণে রাখিবে।
পাঁচু যবে কবি হয়, চড়ে কল্পনায়,
সত্য মিথ্যা ভেদ তার, তখনি ফুরায়।
উপরে যা বলা গেল, বিচার ব্যাপার,
সত্য বলি, এক কথা সত্য নহে তার।
কেবল কল্পনা-লীলা ছন্দের ছাঁদুনি,
ক্ষেপার খেয়াল শুধু আঁখর বাঁধুনি।
ইচ্ছা নাই করিবারে কোর্টাবমাননা,
ধর্ম্ম জানে, সাধ নাই, যেতে জেলখানা।)

ফলে, সুরেন্দ্রনাথ জেলে গেলেন। দেশ হাহাকার, ছিছিকার, ধিক্কার, ন্যক্কার, "নয়নলৌহিত্যাদি করণক চিত্ত-বিকার" প্রভৃতি অশেষ প্রকারে বিচারকদের বিচারকে অবিচার প্রতিপাদন পুরঃসর প্রতিনিয়তই প্রত্যেক স্থানে, যানে, গানে, ধ্যানে, মৌনে, জাগরণে, শয়নে স্বপনে রাত্রিদিনে যেখানে সেখানে ঐ কথার

আন্দোলনে এক বিষমাকার কারখানা হইয়া উঠিল। এদিকে জেলখানায় খাতায় খাতায় লোক, বস্তা বস্তা চিঠি, স্তূপে স্তূপে খবর, ঝাঁকায় ঝাঁকায় খাদ্য, জালায় জালায় পেয় ইত্যাদি উপস্থিত হইতে লাগিল। এক কথায় ছেলেরা গান শিখিল—

"যা যা
তোরা দিলি সাজা, আমরা করি রাজা।"

হাইকোর্টও দেখিলেন দেখিয়া মনে মনে বলিলেন,

"মন্দ নয় মজা, দিতে গেলুম সাজা,
দশ জনে যে তুলে দিলে সুরেনেরই ধ্বজা।"

কচি কচি ছেলেরা গাইতে লাগিল—

"এক কথা খাটী, হাইকোর্ট মাটী।"

তেমনি মাটী,—ডব্‌লুসি-বানরজী।

বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের ছেলে যদি, কোট হ্যাট পরে,
গোরু ভোজন করে,
তেল মাখা ছাড়ে
আর ইংরিজী ঝাড়ে,
তাহা হইলে সে কখনই, বাঙ্গালী রয় না,
সাহেবও হয় না,
নয় মানুষ, নয় ভূত,
বিতিকিচ্ছি আঁটকুড়ীর পুত।

এই ভাব দাঁড়ায়। বানরজীর তদবস্থা। সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যে এখন বাঙ্গালী; সুতরাং মামলাবাজ; মনে

মনে ভাবিলেন বিচারে যা হয় হবে, কিন্তু আইনের কথা গুলা লইয়া তর্কাতর্কিটা করিতেই হইবে। বানরজী কিন্তু এ বাঙ্গালী ভাবের পোষকতা করিলেন না, মনে মনে ঠাওরাইলেন, এত কাউ, কাফ্ উদরস্থ করিয়াছি, আর এই চারিটা জন্‌বুলকে আমি মুখের জোরে বাগাইতে পারিব না?—আমি? আমি ডব্-লুসি-বানরজী? ইহা হইতেই পারে না। গেলেন অমনি ছুরী কাঁটা নিয়ে এগিয়ে। বাপো! একি তোমার টেবিলের গোরু যে, তুমি ঝাঁ করে বাগাবে! চার চারটে আস্ত জীয়ন্ত জন্‌বুল হুঙ্কার দে, মাথা নেড়ে যেই দাঁড়িয়েচে, বাঁড়ুয্যের পো বানরজীর ছুরী কাঁটা যে কোথায় ছটকে পড়লো, তা আর কে দেখে? তখন একেবারে নিরস্ত্র, কাজেই রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন।

হইতে যদি বিলিতি কশাই, হে বানরজী, তবে হয় ত কাজ উদ্ধার করিতে পারিতে। অথবা থাকিতে যে নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ তনয়,—“তোমারা ভূতনাথ ভবানী-পতি ভোলা-মহেশ্বরের বাহন, তোমরা দেবাদিদেব বিশ্বেশ্বরের অবলম্বন, তোমাদের ঐ ক্ষিতিবিদারি শৃঙ্গা-ষ্টকে তৈল দিয়া দিতেছি, তোমাদের চারিটী ককুদ-মর্দ্দন করিয়া দিতেছি, তোমাদের চার আষ্টে বত্রিশ খানি খুরে ধরিয়া মিনতি করিতেছি, হে ষণ্ডেশ্বরগণ, এ যাত্রা ক্ষমা করো”---ইত্যাদিরূপ স্তবস্তুতি দ্বারা জনবুলাবতারগণের মনস্তুষ্টি করিতে পারিতে তোমার

মনস্কামনা পূর্ণ হইত। কিন্তু তুমি যে দুয়ের বাহির, কাজেই মাটী। তুমি জ্ঞাতসারে কোনও পাপের পাপী নও, কেবল কর্ম্মদোষে,

"আপনি মজিলে ভাই, লঙ্কা মজাইলে।"

সার সংগ্রহ মাটী।

একে একে সকলগুলি বিস্তারে দেখাইতে হইলে বিস্তর কাগজ কলম মাটী হইবে। অতএব সংক্ষেপে বলি, সুরেন্দ্রনাথের এই হুজুকে

১ লর্ডরিপণ মাটী,
২ আত্ম শাসন মাটী,
৩ ইলবর্টের আইন মাটী,
৪ পালেদের কৃষ্ণদাস মাটী,
৫ ছেলেদের পরকাল মাটী,
৬ মাষ্টারদের ইহকাল মাটী,
৭ কেশব সেনের নববৃন্দাবন মাটী,
৮ শিবপ্রসাদের কুশপুত্তল মাটী,
৯ দেশের খবরের কাগজ মাটী,
১০ বিস্তর রাজারাজড়া মাটী,
১১ ইংরেজ বাঙ্গালীর সদ্ভাব মাটী,
১২ বিস্তর সাহেবের খানা মাটী,
১৩ সুরেন্দ্রনাথ বাঁড়ুয্যে মাটী,
১৪ হরিণ বাড়ী মাটী,
১৫ ইংলিশম্যান খুব মাটী।

কত বলিব ? বাঙ্গালার মাটীও মাটী। ভরসার কথা দুটী আছে ; মাটী হইবেন না সুরেন্দ্রনাথের পরম পূজনীয়া জননী, আর মাটী হইবেন না আমাদের জননী জন্মভূমি। কারণ উভয়েই—"স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

কার্য্যকারণ তত্ত্ব।

কার্য্যকারণ ভাবের উপলব্ধি করা, মনুষ্য বুদ্ধির আয়ত্ত নহে। কোন্ বীজে কি ফল পাওয়া যায়, কোন পদার্থ হইতে কি সিদ্ধান্ত হয়, ইহা যদি নিঃসংশয়ে কেহ স্থির করিতে পারিত, তাহা হইলে সংসার সুখ দুঃখের অতীত হইত। সকলেই ইহা জানে এবং মানে, তথাপি হস্তগত গোটাকতক কার্য্যকারণ সম্বন্ধ সূচক দৃষ্টান্তের প্রয়োগ করিয়া, এই দুর্জ্জেয় অথচ অভ্রান্ত তত্ত্বের প্রমাণপুঞ্জ বর্দ্ধন করা আবশ্যক বোধ হইতেছে ঃ—

যেহেতু	অতএব
জজ নরেশচন্দ্র জানেন যে বাঙ্গালী মাত্রেই মিথ্যাবাদী; এক প্রাণীর কথাতেও বিশ্বাস করা যায় না।	জজ নরেশচন্দ্র একজন বাঙ্গালী ইন্টিপেটার কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন, যে, আদালতে ঠাকুর আনিলে হিন্দুর মনে কষ্ট, কিম্বা হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট হইতে পারে না।

যেহেতু

লোকের কাছে সমাচার লইয়া, বিশ্বাস করিয়া, বিচারকের উপর কটাক্ষ করিলে পাপ নাই ;

অতএব

ব্রাহ্মপবলিক-ওপিনিয়-নের নিকট সমাচার পাইয়া বিশ্বাস করিয়া বিচারকের উপর কটাক্ষ করিলে ঘোর পাপ।

যেহেতু

চোরের অধিকারভুক্ত হইয়া শালগ্রাম ঠাকুরকে আদালতে উপস্থিত হইতে হইয়াছে,কেহ তাহাতে ধর্ম্মহানির আশঙ্কা বা ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ বলিয়া গণ্ডগোল করে নাই ;

যেহেতু

বিচারেশ নরেশের অধিকারে পড়িয়া ঠাকুরকে আদালতে আসিতে হইয়াছিল বলিয়া ধর্ম্ম-হানির শঙ্কা অথবা গণ্ডগোল করা অসঙ্গত।

যেহেতু

বিচারকের চক্ষে বর্ণভেদ, ধর্ম্মভেদ বা জাতিভেদ নাই, সকলেরই প্রতি এক বিচার, সমান বিচার হইয়া থাকে ;

অতএব

আদালতের অবজ্ঞা করা অপরাধে, টেলর ও ফেনিক সাহেবের সম্বন্ধে যে আদেশ হইয়াছিল, স্থরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে সে না হইয়া অন্যরূপ হইল।

যেহেতু

ভারতবর্ষে সাধারণের কোন একটা মত নাই; রাজনীতি ঘটিত কথায় শ্রদ্ধা বা অনুরাগ নাই, সজাতীয়তার মূলে ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসীদের কোনও প্রকার একতা বা সমসংযোগ নাই;

অতএব

সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড হওয়াতে হিন্দু ও মুসলমান, উড়ে ও পার্শি, পঞ্জাবী ও আশামী সমস্বরে মনোবেদনা প্রকাশ করিতেছে। হাটে মাঠে, সহরে, পাড়াগাঁয়ে সভা করিতেছে, চাঁদা করিয়া টাকা তুলিতেছে, ইত্যাদি।

যেহেতু

রাজপ্রতি লাট রিপণ, জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে যোগ্যপাত্রে যোগ্য অধিকার দিবার অভিপ্রায়ে ফৌজদারি কার্য্য বিধির কলঙ্ক মোচনের সংকল্প করিলেন, এবং ইঙ্গ-ফেরঙ্গের দল সেই জন্য দেশী লোকের উপর বিজাতীয় ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া কুৎসিৎ ও কটু ভাষায় গালাগালি দিতে লাগিল,

অতএব

এদেশের লোক ইংরেজের উপর দ্বেষভাবাপন্ন লাট রিপণের শাসন প্রণালীর দোষে রাজদ্রোহী, অতিশয় অকৃতজ্ঞ এবং জাতিবৈর প্রদর্শনকারী বলিয়া সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে।

যেহেতু	অতএব
এদেশের লোক আজন্ম ইংরেজী শেখে, ইংরেজী-তে লেখা পড়া করে, বিতর্ক বক্তৃতা করে, বিলাত যায়, সাহেব হয়, তথাপি ইংরেজের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি শিক্ষা দীক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে অভিজ্ঞ হইতে পারে না, সুতরাং ইংরেজের দোষ গুণের বিচার করিবার অযোগ্য।	ইংরেজেরা বাঙ্গালা ভাষা শেখেন না, বাঙ্গালীর কানাচের দিকে ঘেঁসেন না, বাঙ্গালীর ধর্ম্ম কর্ম্ম বোঝেন না, তথাপি বাঙ্গালার হাট হদ্দ ষোলো আনা উদরস্থ করিয়া লন, সুতরাং বাঙ্গালীর পাপ পুণ্যের বিচার করিতে নিশ্চয় যোগ্য।

সংশোধিত যাত্রা—মানভঞ্জন।

বৃন্দা। রাধে, মানময়ি, তুমি কালাচাঁদের কোরে অপমান, শেষে আপনি হবে হতমান, এত মান ত ভাল নয়, শ্রীরাধে।

রাধা। শোনো বৃন্দে, তুমি স্বজাতি বোলে এ যাত্রা তোমার মাফ কো'ল্লুম; কিন্তু ঐ কৃষ্ণ যদি এমন কথা বল্‌তো, তা হ'লে এক্ষণি রুল হান্‌তুম, কাল সকালে জেল দিতুম। তুমি আর অমন কথা বলো না, বৃন্দে, আমার মানের গায়ে ফুলের ঘা সয় না, বৃন্দে।

বৃন্দে। কি বোল্লে শ্রীরাধে?

তোমার "মানের গায়ে ফুলের ঘা সয় না?"
রাধে, আমাদেরও আর জেলের ভয় হয় না।
এখন, কালা যদি জেলে যায়, হবে সবে ক্ষিপ্ত প্রায়;
যে নাইকো কুলে, সেও গোকুলে,
ঘটাবে এক বিষম দায়।
এখন, সুরেন্দ্র বাঞ্ছিত পদ, দেখ জেল সম্পদাস্পদ,
কেবল বাইরে যারা, তারাই সারা,
জেলে কে ভাবে বিপদ?
তাই বলি,
রাধে তুমি সাধে সাধে জেলের কথা তুলো না।
জেলে দিলে শুধু লাঞ্ছনা, গেলে পরে ক্ষীরছানা,
দেখেও এত কারখানা,রাধে,ভুলো না আর ভুলো না।
বরং আমার কথা রাখো রাই,
মানের গোড়ায় দাও গো ছাই,
তোমার কুটকুটে মান, বিষের সমান.
কোনও পক্ষের ভদ্র নাই।
রাধে কাজ নাই আর পোড়া মানে,
ও মানে কি লোকে মানে,
তাই মানা করি রাই কিশোরী,
মান ছাড় গো মানে মানে।
নিয়ে ঘরের কুচ্ছ, পরের তুচ্ছ
সইবে কেন পার্য্যমানে।
ধনি, মানের এখন মানে নাই,
আপন মানত আপন ঠাঁই,
বাঁধো কালাচাঁদে, প্রেমের ফাঁদে
এই উপদেশ ধরো রাই।

অবিদ্যা ও বিদ্যা।

(জীর্ণোদ্ধার)

দোতলার উপর সবে একটি ঘর, আর সেইটিই ঘরের মতন। নীচেকার ঘর বড় স্যাঁৎ সেঁতে, হাওয়া নেই বলিলেই হয়, কিন্তু সেকেলে হাড়ে সব সয় বলিয়া বাঞ্ছারামের বুড়ী মা ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেপুলে গুলি লইয়া দরমার উপর মাদুর পাতিয়া সেই ঘরে শোন, বসেন। উপরে থাকেন বৌমা—বাঞ্ছারামের সাত রাজার ধন, পাড়ার চক্ষুঃশূল, শাশুড়ীর বিড়ম্বনা, স্ত্রী উত্তোলনী সভার গৌরব।

বাঞ্ছারাম শাল্‌কের পাটের কলে—চাকরি করেন! কি চাকরি কেহই জানে না;—তবে কলের সাহেব বাঞ্ছারামকে "বাবু" বলিয়া ডাকে, আর দুই হাত দুই পায়ে মানুষে যা করিতে পারে, বাঞ্ছারাম সেই কর্ম্ম করে। বাঞ্ছারামের মাহিনে কুড়ি টাকা।

তবু সেই দোতলার ঘরে একখানি কেদারা, একটা ছোট মেজ, একখানি মাঝারি আড়ার আর্শী, দোয়াত, কলম, কাগজ। সেই কেদারার উপর দিন রাত্রি বিরাজ করেন—বৌ মা!

আজি সকালে সকালে বাঞ্ছারামের কলে যাইবার বরাত, সাহেব কড়াকড় করিয়া বলিয়া দিয়াছে। ভোরে উঠিয়া গামছা হাতে বাঞ্ছারাম বাজার করিয়া,

আনিয়াছে, বুড়ীও তাড়াতাড়ি ভাত ব্যঞ্জন রাঁধিয়া প্রস্তুত; ছেলেগুলা টাটা করিতেছে; বৌমা নামিয়া আসিয়া আহার করিয়া গেলেই ছেলেরা খাইতে পায়, বাঞ্ছারামের কলে যাওয়া হয়।

বৌমার বিলম্ব দেখিয়া বুড়ী সাহসে ভর করিয়া, তাঁহাকে খবর দিতে গেল। বৌমার চক্ষু পৃথিবীতে নাই, শূন্যে, বৌমার সম্মুখে মেজের উপর কাগজ; বৌমার ডানি হাতে কলম; বৌমার বাঁহাত ঝাঁপটার এক গোছা আলগা চুল ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। বুড়ী ডাকিল—"বৌ মা!" বৌ মা সংসারে নাই, সাড়া দিলেন না!

বুড়ী আবার ডাকিল—"বৌমা!"

বৌমার চট্‌কা ভাঙ্গিল। বৌমা মৃদু-মন্দ স্বরে শান্তভাবে, বুড়ীর দিকে সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "আহা! মূর্খতা কি ভয়ঙ্কর দোষের আকর! শ্বশ্রূঠাকুরাণি, পুস্তকে আছে আপনি পূজনীয়া! কিন্তু আপনি আমার যে উচ্চভাবে ব্যাঘাত দিলেন, যে কবিদুর্ল্লভ কল্পনার ধ্বংশ করিলেন, তাহাতে আপনি আমার সহিষ্ণুতার সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন এমত নহে, প্রত্যুত সে সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন।

বুড়ী ভয়ে কাঁপিতেছিল; থতমত খাইয়া বলিল—"তা নয় মা, বাঞ্ছা, সকালে সকালে যাবে, সেই জন্য—"

বৌমা আর সহিতে পারিলেন না;—"তবে দেখিতেছি অদৃষ্ট মানিতেই হইল! হায়! বঙ্গভূমে রমণী-

কুলরবি হইয়াও যদি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিচালন করিতে না পাইব, তবে অদৃষ্টের আধিপত্য স্বীকার করা ভিন্ন উপায়ান্তর কৈ? শ্বশ্রূঠাকুরাণী! আপনি আপনার মূর্খ পুত্রকে মৎসমীপে একবার প্রেরণ করুন; তাঁহার অকিঞ্চিৎকর সামান্য অর্থোপার্জ্জনে এবং আমার আশ্রয়ীভূতা কবিতাদেবীর আরাধানায় কি প্রভেদ, একবার তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।"

বুড়ী কিছুই বুঝিতে পারিল না, কোন দিনই বৌমার কথা বুঝিতে পারিত না। নীচে গিয়া বাঞ্ছারামকে পাঠাইয়া দিল।

বাঞ্ছারাম আসিল, কিন্তু মুখে কথা নাই; এক দিকে সাহেব—অন্নদাতা, এদিকে পরিবার—ভয়ত্রাতা; দুই পিতৃ তুল্য, কথাটী না কহিয়া ইহাই ভাবিতেছিল।

বৌমা বক্তৃতা জুড়িলেন। বাঞ্ছারামের নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় হইল। বক্তৃতা শেষ হইলে বাঞ্ছারাম বলিল—"সময়ে না আহার করিলে শরীর থাকিবে কেন? শেষে কি সব দিক নষ্ট করিবে?"

স্বাস্থ্যরক্ষা খুলিয়া বৌমা দেখিলেন, বাঞ্ছারামের কথা যথার্থ। বাঞ্ছারামের উপর প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—"বড় বাধিত হইলাম!"

বৌমার আহার হইল; বাঞ্ছারামের চাকরিও বজায় রহিল।

১। সুরুচির কথা।

নিস্তারিণী বিধবা, কিন্তু লোকে বলাবলি করে যে, তাহার চরিত্রটা বিধবার মতন নয়। নিস্তারিণীর এক জন আত্মীয় লোক গ্রামান্তর হইতে তাহার তত্ত্ব করিতে আসিয়া কএক দিন ধরিয়া তাহার বাড়ীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। নিস্তারিণীর ইহাতে একটু অসুখ হইতেছিল, আত্মীয়কে যাইতেও বলিতে পারে না, অথচ তিনি থাকাতে নিস্তারিণীর বিষম উৎপাত মনে হইতেছিল। এক দিন সেই আত্মীয় ব্যক্তি নিস্তারিণীর নিকট একটু চূণ চাহিয়া পাঠাইলেন, নিস্তারিণীও মনের দুঃখ প্রকাশ করিবার সুবিধা পাইয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল ;—"চূণ! আমার কাছে চূণ? কেন আমি কি পান খাই, তাই আমার কাছে চূণ থাকিবে? আমি বিধবা মানুষ, চূণ রাখি, পান খাই, তবে আর না করি কি? আত্মীয় লোকের এই কথা! আপন হইয়া এই কলঙ্ক রটনা! অপরে তবে না বলিবে কেন? চরিত্রেই যদি খোঁটা হইল, তবে বাকী রহিল কি? হায়! হায়! কুনাম রটনা হইতে কুকাজ ঘটনা যে ভালো!" ইত্যাদি। নিস্তারিণীর আত্মীয় বুঝিলেন; বুঝিয়া সেই দিনই প্রস্থান করিলেন। গ্রামের দুই চারি জন লোক, যাহারা নিস্তারিণীকে বিশেষ আদর যত্ন করিত, নিস্তারিণীর চরিত্রের গুণবাদ

করিত, এক সুরে বলিতে লাগিল—"আত্মীয় হইলে কি হয়? ভদ্র লোক হইলে কি হয়? কথাটা ভদ্র লোকের মতন হয় নাই। যাহাই হউক আত্মীয়ের অভিপ্রায় মন্দ ছিল না, তবে তাঁহার রুচি এবং শিক্ষার বিলক্ষণ দোষ আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। বিধবা স্ত্রী লোকের নিকট চূণ চাওয়াটা নিতান্ত বিকৃত রুচির কার্য্য।"

পঞ্চানন্দের "শনিবারের পালা" নামক মহাপদ্য পড়িয়া কেহ কেহ সুরুচি সুনীতির কথা তুলিয়াছেন; ইহাঁরা নিস্তারিণীর দলের লোক না হইলেও ইহাঁদের আপত্তিটা যেন নিস্তারিণীর অঙ্গের বলিয়াই মনে হয়। তমালের পাতা কালো, যমুনার জল কালো, মাথার চুল কালো, কোকিল কালো, ভ্রমর কালো, মেঘ কালো—সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া, কালো দেখিলেই, —কালাচাঁদ কৃষ্ণকে মনে করিয়া কাজ কি? যদি বা মনে পড়িল, সে দোষ মনের না কালোর? ফলে যাহারই দোষ হউক, পঞ্চানন্দের দোষ কখনই নহে।

যাঁহার যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন, পঞ্চানন্দ দুঃখিত হইবার পাত্র নহেন; বরং বক্তারা যে বাঙ্গালা সাহিত্যে অবহেলা না করিয়া, উহারই মধ্যে বাছাই বাছাই গ্রন্থ পাঠ করেন, এবং চুনা চুনা প্রসঙ্গ কণ্ঠস্থ অভ্যাস করিয়া রাখেন, সে জন্য তাঁহাদিগকে সাধুবাদ করিতে পঞ্চানন্দ মুক্তকণ্ঠ। কে বলে বাঙ্গালা ভাষার মা বাপ নাই; কে বলে বাঙ্গালা সাহিত্যের আশা

ভরসা নাই ? লেখার মত লেখা হইলে, আর বাগাইয়া যোগাইয়া লিখিতে পারিলেই সকলেই আছে।

ফলতঃ, সুরুচির বিষয় যেমনই হউক "শনিবারের পালায়" কাহারও অরুচি দেখা যায় নাই। ইহা অপেক্ষা অধিকতর সুখের বিষয় কি হইতে পারে ? পঞ্চানন্দ এত দিনে পূজক চিনিতে পারিলেন, ভক্তের পরিচয় পাইলেন।

২। সুনীতির কথা।

কতক গুলি কথা আছে, যাহা পরিহাসের অতীত, কতক গুলি বিষয় আছে, যাহা উপহাসের আয়ত্ত হইবার নহে; আর কতকগুলি পদার্থ আছে যাহা লইয়া রসিকতা চলে না, রসিকতা করিতে চেষ্টা করা অন্যায় এবং চেষ্টা করিলে রসিকতা ফলে না। এ তত্ত্ব সকলেই জানেন, পঞ্চানন্দও মানেন। শরীরের দ্বারা, মনের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা বা ব্যবহারের দ্বারা যে ব্যক্তি এ তত্ত্বের বিপর্য্যয় করে সে সুনীতির বিরোধী, সুতরাং বনবাসের যোগ্য। আইস ভাই, বিশদ করিয়া উদাহরণ দিয়া এই তত্ত্বের প্রতিপাদন করা যাউক।

মনে করো একটা লোক অন্য কোনও দিকে সুবিধা না পাইয়া ধর্ম্মানুসরণ দ্বারা বড় লোক হইবার চেষ্টা করিতেছে। উচ্চাভিলাষ গর্হিত বস্তু নহে, সেই উচ্চাভিলাষ সাধনের পন্থা যদি ধর্ম্ম হয়, তবে ধরা বাঁধা

প্রশংসার কাজ। ধর্ম্ম ঘরেও হয়, বাহিরেও হয়; অরণ্যেও হয়, লোকালয়েও হয়; চুপি চুপি করা চলে, সোর হাঙ্গামা করিয়াও চলে। এমত অবস্থায় যদি কোনও ব্যক্তি নিশান তুলিয়া, ডঙ্কা বাজাইয়া, সঙ্ সাজিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করে, অথচ যৎ-সামান্য কালের নিমিত্ত লোকের কাজ নষ্ট করা ভিন্ন অন্য অপকার না করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিকে কখনই দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। আবার, ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইলেই ধর্ম্মের বিচার করিতে হয়; বিচার করিতে হইলেই, প্রচারের বিষয়ীভূত ধর্ম্ম ভিন্ন অপর ধর্ম্মের নিন্দাবাদ করিতে হয়; কেবল মুখে যদি নিন্দাবাদ করিয়া কাজে সেইরূপ নিন্দিত ধর্ম্মেরই অনুসরণ বা অনুকরণ করা যায়, তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি? এইরূপ পাঁচটা আয়োজন করিয়া পাঁচ রকমে ইষ্টসিদ্ধি করিবার যত্ন করা অসঙ্গত নহে। এবং এরূপ সঙ্গত ব্যবহারকে যে পরিহাস করে, সে সুনীতির বিরোধী। এরূপ ব্যাপার যে কোথায়ও হইতেছে, তাহা নহে; তবে দৃষ্টান্ত না কি কল্পিত বস্তু লইয়াও দেওয়া যাইতে পারে, সেই হেতু উপরিলিখিত কথা গুলি বিন্যস্ত হইল।

আবার দেখো, সকলেই কিছু ধনবান নহে, সকলেই সুখী নহে। সেই জন্য "ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া লাখ টাকার স্বপ্ন দেখার" একটা প্রবাদ চলিত আছে। মনে করা যাউক—কল্পনার বলে সবই মনে করা

চলে—ভারতবর্ষ রাজনীতি বিষয়ে নিতান্ত ম্রিয়মাণ, দরিদ্র, অসঙ্গতিপন্ন এবং কাতর। কিন্তু তাই বলিয়া একটা খুব স্বাধীন, খুব সবল, খুব ধনশালী দেশের অনুকরণে ভারতবাসী যদি রাজনৈতিক সভা করে, রাজনীতির বড় বড় কথা লইয়া আন্দোলন করে, অনুমোদন করে, করিয়া একটু সুখে থাকে, সংসারের জ্বালা একটু ভুলিতে পারে, অন্ন চিন্তা হইতে কিয়ৎ-কাল অব্যাহতি পায়, এবং মরিবার সময়ে হাত পা ছাড়াইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া মরিতে পারে, তাহা হইলে দোষ কি? এরূপ ব্যবহারের প্রতি কটাক্ষ করা, ইহা লইয়া উপহাস করা, অতি অন্যায়, নিতান্ত নিষ্ঠুরের কাজ; যে তাহা করিতে পারে, সে সুনীতির বিরোধী তৎপক্ষে কি সংশয় আছে?

“বেগার দিই, তবু বসিয়া থাকি না কর্ম্ম-কুশল ব্যক্তি এই মন্ত্রের উপাসক। এই দলের লোক অন্য কাজ না পাইলে “খুড়ার গঙ্গা যাত্রা” ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। মনে করো একটা ছিন্ন ভিন্ন জাতির তুমি এক জন অপদার্থ লোক; সাধ্য নাই, সহায় নাই, সাহস নাই, সেই জন্য অপদার্থ। এখন, জাতির, উন্নতি করিতে হইলে অনেক কষ্ট স্বীকার করা আব-শ্যক, অনেক খড় কাঠের দরকার। বিদ্যা বুদ্ধি সকল লোকের থাকে না, শিল্প বিজ্ঞান লইয়া মাথালো মাথালো দশ জন লোকের চলিতে পারে; সুতরাং জাতিবন্ধন করিতে হইলে, ইতরদের সঙ্গে একটা

সাধারণ বন্ধনের আবশ্যকতা ; ধর্ম্মে এবং ভাষায় এই বন্ধন হইতে পারে, কিন্তু আমার তত সময় নাই, তত ক্ষমতাও নাই যে, গোড়া পত্তন করিয়া গৌরচন্দ্রিকা হইতে আরম্ভ করিয়া আমি সমুদয় পালাটা শেষ করিয়া উঠি। তাই বলিয়া কি একটা সখের দলও আমার করিতে নাই? সখ করিয়া যদি আমি জাতীয়তার পালা গাইতে আরম্ভ করি, ভুলোর দলের মেথরাণীর গান, মহেশ চক্রবর্ত্তীর ভূতের সঙ্, বৌ মাষ্টারের ভিস্তীর নাচ, এই সকল যোট পাট করিয়া যদি দুদিন দশ দিন আমোদ আহ্লাদ করি, তাহাতে দোষ কি? বস্তুতঃ তাহাতে দোষ নাই, ক্ষতি নাই, কিছুই নাই। সুতরাং এমন আচরণ করিলে যে রসিকতা করিয়া ঠাট্টা তামাসা করে, সে নিতান্তই সুনীতির বিরোধী।

আবার দেখো, কেরাণী বাবু, হুজুর বাবু প্রভৃতি জন কতক লোক এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে পেটের দায়ে অজস্র খাটুনি খাটিয়া একটু বিকৃতমনা হইয়া উঠিল। কাজে কাজেই তাহাদের মাথাও গরম হইল। এক দিন চীৎকার করিয়া উঠিল—"দোহাই ধর্ম্মাবতার, আর চলে না, আমাদের মনে হইতেছে যে মাথা বুঝি নাই, পাগড়ী আছে দেখিতে পাই, কিন্তু মাথা খুঁজিয়া পাই না। যদি অনুমতি করেন, ত মাথাটা খুলিয়া রাখি, নেহাত না হয় কালো টুপি দিয়া ঢাকিয়া রাখি ; তবু হাত বুলাইলেও মাথা আছে এমন বুঝিতে পারিব। নচেৎ গরিবমারা হয়।" আফিসের সাহেব গরম দেশে.

আরও গরম; তাহার সর্ব্বাঙ্গ গরম, মাথা আরও। সাহেব গোল শুনিয়া নিজে চীৎকার ধরিলেন—"কেঁও রে তোর ভি মাথা? মাথা যা আছে সে আমার দখলে, তোর যদি থাকে, ঢাকিয়া রাখ্, আর শুধু ঢাকিলেই বা হইবে কেন? পরামর্শ করিতে হইলে মাথায় মাথায় ঠোঁকাঠুকি না হয়, সেই জন্য একটা বিঁড়াও মাথায় পরিয়া থাক্। নতুবা যদি দেখি শির্ লাঙ্গা, তবে দেখ্‌বি শির লেঙ্গা।" ইত্যাদি দৃশ্য দেখিলেও যে রসিকতা করিতে চেষ্টা করে, সেও সুনীতির বিরোধী, নিতান্ত দুর্নীত লোক। এ সকল কথা সকলের শিখিয়া রাখা আবশ্যক।

ভদ্র লোকের ছেলে মানুষ করিবার প্রকরণ।

এক দফা—শিশুপালন।

একদা জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্নকালে ঘোষেদের শ্রীমতী ছোট বৌ ছোট বাবুকে একটী পুত্ররত্ন দিবেন বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। ছোট বাবুও অনেক দিন ধরিয়া সেই আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসিতে-ছিলেন, সুতরাং রত্ন লাভের জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন এবং গৃহিণীকে বিলম্ব করিতে দেখিয়া যন্ত্র-বিদ্যাবিশারদ যম-নমজোপম এক ধাত্রী পুরুষকে স্বীয় রত্নলাভাভিসন্ধি সাধনে সহায়তা করিবার উদ্দেশে

আনয়ন জন্য আদেশ প্রেরণ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে সেই মহাপুরুষ এক বস্তা হাতা, বেড়ী, কোদাল, কুড়ল, করাত, খন্তা প্রভৃতি লইয়া উপস্থিত হইলেন। ঘোষমহিলা এই সন্দেশ শ্রবণমাত্র ভীতচিত্তা হইয়া আর আব্দার লওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে বিবেচনা করিয়া প্রতিশ্রুত পুত্ররত্ন আপনা হইতে প্রদান পূর্ব্বক নীরবে কালযাপনা করিতে লাগিলেন। তখন চতুর্দ্দিকে আনন্দোৎসব জন্য কোলাহল ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ এবং প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ধাত্রীপুরুষ অভীষ্ট কার্য্যে অকৃতমনোরথ এবং ব্যাহত হইয়া ক্ষণকাল মৌনভাবাবলম্বন পুরঃসর চিন্তা করতঃ পরিশেষে পুত্রবরকে বারেক নয়নগোচর করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলে ছোট বাবু তাহাতে সম্মত হইলেন, এবং অনতিবিলম্বে তাঁহাকে অন্তঃপুর মধ্যে স্বকীয় সঙ্গে লইয়া গেলেন। ছোট বৌ প্রাণপতিকে ঈদৃশ অবস্থাপন্ন এবং তাদৃশ অনুচরানুসৃত দেখিয়া মৃদু মন্দ ভাবে বসন সংযমন পূর্ব্বক অতিমাত্র কষ্টে তদীয় দেহলতা যৎকিঞ্চিৎ অপসারণ করিলেন। তখন সূতিকাগারস্থিতা কিঙ্করীর ক্রোড়ে ইহাঁরা উভয়ে সেই কুমারলাঞ্ছন নবকুমারকে দৃষ্টিগোচর করতঃ ধাত্রীপুরুষ সহসা বিস্ময়-রোষ-ঘৃণাপূর্ণ হৃদয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। ছোট বাবু তাঁহার তদ্রূপ ভাবের কারণ জিজ্ঞাসু হইলে তিনি কথঞ্চন আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন—"অহো, কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই শিশু অনাবৃত গাত্রে মৃত্যু-

সঞ্চারী এই ভীষণ শীতল বায়ু সঞ্চার ভোগ করিয়া সম্ভাবিনী পীড়ার আবির্ভাবাশঙ্কা বদ্ধমূলা করিতেছে। অধিকতর লজ্জার বিষয় এই যে, কিঙ্করী স্ত্রীজাতি সম্ভূতা হইয়াও এই বালককে অক্ষুব্ধ চিত্তে স্বীয় অঙ্ক-দেশে স্থাপন পূর্ব্বক প্রদর্শন করিতে ভীতা বা ব্রীড়া-ন্বিতা হইতেছে না। তদুপরি বালকেরও কি ধৃষ্টতা, একেবারে আবরণ বিহীন, এমন কি কৌপীনটীর পরিদ-ধান না হইয়াও এই রমণীজন মণ্ডলে অম্লান বদনে সহাস্যাস্যে বিরাজ করিতেছে। এতৎকারণ প্রযুক্তই অস্মদ্দেশের এবম্প্রকার দুর্গতি, এবম্ভূত অবনতি, এবং এতাবৎ রোগশোক জরামৃত্যুপরিপ্লুত দশা সংঘটিতা হইয়াছে। ইহার প্রতীকার না করিলে সুখ সৌভা-গ্যের আশা সুদূর পরাহতা, তাহা শেমুষীসম্পন্ন কোন্ মতিমান ব্যক্তি অস্বীকার করণে সক্ষম হইবেন।”

ছোট বাবু প্রণিধান পূর্ব্বক ধাত্রী পুরুষের উপদেশ লহরী শ্রবণাঞ্জলিপুটে পান করতঃ তাহার সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন, “যথার্থ কথা,” কিন্তু অজ্ঞ জনের ন্যায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে সবিস্তার উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। ধাত্রীপুরুষ লঙ্কার যাবদীয় শাস্ত্রগ্রন্থ উদ্-ঘোষণ পূর্ব্বক বিধিব্যবস্থা সমন্যস্তা করিয়া কিয়ৎ-কালান্তে অন্তর্দ্ধান হইলেন। নবজাতশিশু তদবধি ফেলানেলমণ্ডিত হইয়া ভবযন্ত্রনা সংকীর্ণ করণ বিষয়ে যত্নপর হইল।

কালক্রমে, বালক কি অভিধায় আখ্যাত হইবে তদ্‌বিষয়ে ঘোরতর বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। কেহ প্রস্তাব করিল প্রিয়নাথ, কেহ নলিনীভূষণ, কেহ কামিনীমোহন, কেহ বা দামিনীকণ্ঠ ইত্যাদি বহুধা অভিধা প্রস্তাবিত হইলে, পরিশেষে সকল পক্ষ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ত্যাগ স্বীকার করিয়া নর নারী উভয় জাতির মনস্তুষ্টিজনক ননীগোপাল নামকরণ স্থিরীকৃত করিল। তদবধি নবকিশলয় বিনিন্দিত নবীন শিশু ননীগোপাল হইল, আতপতাপে তাহার দেহ বিগলিত হইতে লাগিল, শীত-সঞ্চারে তদীয় শরীর জমাট আড়কাট্ হইতে লাগিল, এবং রমণী-জনসুলভ কোমলহৃদয় তদীয় জনক ছোট বাবু, তথা স্নেহময়ী জননী ছোট বৌ শিশুকে ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম এই পঞ্চভূত হইতে নিরাকৃত করিয়া পরম যত্নে লালন পালন করিতে লাগিলেন। ক্ষিতিস্পর্শনিবারণ জন্য দাস দাসী নিয়োজিত হইল; বহুবিচার পুরঃসর সময়ে সময়ে মীমাংসা করিয়া ননীগোপাল উষ্ণজলে স্নাত হইতে লাগিল, রুদ্ধদ্বারবাতায়ন গৃহে তেজঃ নিবারিত হইতে লাগিল, কার্পাসকৌষিকোর্ণজালে প্রভঞ্জনের প্রকোপ বিধ্বস্ত হইতে লাগিল এবঞ্চ দিব্যাশ্বযুগলোঢ়যানে আকাশের দুঃশ্বাস হইতে ননীগোপাল রক্ষিত হইতে লাগিল। নবনীত পুত্তলী-নিন্দিত ননীগোপাল এইরূপে দিনে দিনে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।—ইতি "লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি।"

অথ বিদ্যাশিক্ষা।

(এডুকেশন-গেজেট হইতে সংগৃহীত।)

ননীগোপালের যখন পাঁচ বৎসর বয়ক্রম হইল, তখন "দশবর্ষাণি তাডয়েৎ" জানিয়া তাহার পিতা মাতা তাহাকে বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে পড়িতে দিলেন। সেখানে কড়ানিয়া, ষট্‌কিয়া, নামতা, কড়িকসা, মণ-কসা, সুদকসা কাঠাকালি, বিঘাকালি, দেয়ালকালি, নৌকাকালি প্রভৃতি শিখিলে অথবা নামলেখা, পত্র-লেখা, খৎলেখা, পাট্টালেখা প্রভৃতি সিখিলে, একদিকে সময় নষ্ট অপরদিকে বৃথা কষ্ট জানিয়া,ননীগোপালকে তালব্য শ, মূর্দ্ধণ্য ষ, দন্ত্য স, বর্গীয় ব, অন্তঃস্থ ব, হ্রস্ব স্বর, দীর্ঘ স্বর, প্লুত স্বর প্রভৃতির উচ্চারণ গত প্রভেদ সম্বন্ধে সাবধানে নিরস্ত করিয়া কণ্ঠস্থ করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইতে লাগিল, এবং যাবদীয় উচ্চাচরণ স্থান, ব্রহ্মাণ্ডের শব্দের লিঙ্গজ্ঞান প্রভৃতি বাঙ্গালার অত্যা-বশ্যক তত্ত্ব সকল মুখস্থ করিবার আদেশ দেওয়া হইতে লাগিল। অধিকন্তু পৌণ্ডো, শিলিঙ্গ, পেন্‌সো দিয়া টাকা কড়ির হিসাব,আর ড্রাম,ঔন্‌স,পৌণ্ড দিয়া ওজনের জ্ঞান স্লেটে অঙ্ক পাতিয়া ননীগোপাল শিখিতে লাগিল।

এ দিকে কলিকালে লোক অল্পায়ু হয়, এ কথাটা সকলে জানে বলিয়া, চিরজীবী ননীগোপালের পর-কালের পথ মুক্ত রাখিবার জন্য বাড়ীতে একজন উপ-শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার কৃপায় পি-এল-ও-

ইউ-জি এচ্—প্লাউ, টি-এচ-ও-ইউ-জি-এচ—দো, সি-ও-ইউ-জি-এচ্—কফ, আর-ও-ইউ-জি-এচ্—র‍্যাফ্, টি-এচ্-আর-ও-ইউ-জি-এচ — থ্রুটি-এচ্-ও-আর্-ও-ইউ-জি-এচ্—থারা—ইত্যাদি উচ্চারণ রহস্যে ননীগোপাল নিত্য নিত্য নূতন আনন্দের আস্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিল।

ননীগোপাল প্রত্যূষে শয্যা হইতে ওঠে, অমনি স্নেহময়ী জননী একবার তাহাকে মিঠাই মোহনভোগ দিয়া জলযোগ করাইয়া দেন; জলযোগ সম্পন্ন হইবা-মাত্র হিতৈষী পিতা তাহাকে পাঠগৃহে বসাইয়া দেন; নয়টা না বাজিতেই পাঠ স্থগিত রাখিয়া ননীগোপাল স্নান করে; স্নানান্তেই আহার; সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ে গিয়া ননীগোপাল আবার পড়া দেয়, আবার পড়া লয়। প্রদোষে বাড়ী আসিয়া ননীগোপাল উপশিক্ষকের হস্তে আবার কোমল প্রাণ সমর্পণ করিয়া দেয়। যখন চিঙ্কিনে রৌদ, সেই একটার সময় একবার ননীগোপাল বাহিরে যাইতে যাইতেই গলদ্‌ঘর্ম্ম কলেবর হইয়া বিদ্যামন্দিরে পুনঃপ্রবেশ করে, এবং স্বাধীন ক্রীড়ার সুখানুভব করে।

এইরূপে দশ বৎসর বয়স না হইতেই ননীগোপাল বাঙ্গালা সাহিত্যে পারদর্শী, বাঙ্গালা ব্যাকরণে কৃত-বিদ্য, প্রাচীন ও নব্য সমগ্র ইতিহাসে ব্যুৎপন্ন, ভূগোলে নখদর্পণ, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারে তৎপর, অর্থনীতি শাস্ত্রে পণ্ডিত, পাটীগণিত, বীজগণিত,

জ্যামিতি, ক্ষেত্রব্যবহার, জরীপ, স্থিতিবিজ্ঞানের যন্ত্র-জ্ঞান, গতিবিজ্ঞানে বেগমান প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধকাম হইয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী সাহিত্যেও উন্নতি করিতে লাগিল। ননীগোপালের সুখ্যাতি লোকের মুখে আর ধরে না, সেই আহ্লাদে ছোট বাবুর আর মাটীতে পা পড়ে না, আর ছোট বৌ সেই অহঙ্কারে সকলের সঙ্গে দাঁড়াইয়া কথা কহিতে পারেন না।

আর দশ বৎসরের মধ্যে ননীগোপাল ইংরেজীতেও পূর্ণমাত্রায় জ্ঞান লাভ করিল। শেষবার পরীক্ষা দিয়া ননীগোপাল যে পুরস্কার পাইল, অনেকে চাকরি করিয়া তত টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে না। বিংশতি বৎসর বয়সেই ননীগোপাল এইরূপে কৃতবিদ্য এবং সিদ্ধার্থ হইয়া সুখের পূর্ণভোগ পাইল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখ মানুষের ভাগ্যে ঘটে না; সেই জন্য ননীগোপালের সুখেও দুই চারিটী কণ্টক ফুটিয়া তাহাকে একটু কাতর করিয়াছিল। সে গুলির উল্লেখ আবশ্যক।

(১) পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে ননীগোপালের বিবাহ হয়। এখন তিনি বিদ্যাসমুদ্রের পারে আসিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিতে পাইলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বয়স তিন বৎসর, পুত্র খেলা করিতে শিখিতেছে এবং অজ্ঞাতকুলশীল এক ব্যক্তি তাঁহার প্রণয়িনীর উদর-পরিধি বৃদ্ধি করিতেছেন।

(২) প্রত্যেক বার পরীক্ষা দিবার অনতিপূর্ব্বে

ননীগোপালের জ্বর, উদরাময়, শিরঃপীড়া প্রভৃতি উপস্থিত হইত, কিন্তু সুবিজ্ঞ চিকিৎসকদিগের কুইনীনের প্রয়োগে, গবাস্থিচূর্ণ পথ্যে, এবং পিতা মাতার যত্নের বাহুল্যে তিনি পরীক্ষা দিয়া উঠিতে পারিতেন। তাহাতে বিশেষ কিছু অনিষ্ট হয় নাই বটে, কিন্তু ননীগোপালের শরীর এখন নিয়ত নিস্তেজ এবং অসাড় মনে হয়, অগ্নিমান্দ্য সর্ব্বদাই থাকে, উদরাময় প্রায়ই দেখা দেয়, শিরঃপীড়া যখন তখন ঘটে, এবং চক্ষুতে কিঞ্চিৎ দৃষ্টি কম হয়।

(৩) বিদ্যাশিক্ষা শেষ হইবার দুই তিন বৎসর আগে হইতে ননীগোপালের পিতা এক ঘরাও মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইলেন, কিছু দিন পরে ছোট বৌ, ননীর মা, প্রাণত্যাগ করিলেন, এবং ছোট বাবুও শেষে প্রেয়সীর অনুগমন করিলেন। ফলে, এ সব না ঘটিলেও, আর আর যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিতই।

"তাড়য়েৎ দশবর্ষাণি"তে ক্ষান্ত হইল না। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, ননীগোপাল প্রায় মানুষ হইয়া উঠিয়াছে।

অথ "মিত্রবদাচরেৎ"।

(এটা পঞ্চানন্দের।)

ননীগোপাল মানুষ হইল বটে, কিন্তু তাহার মনে বড় ভাবনা হইল। এখন করি কি? যাই কোথায়? খাই কি? এই সকল ভাবনায় ননীগোপালের মন

তোলপাড় করিতে লাগিল। গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে ছেলেদের প্রাইজ হইতেছিল ; ছোট লাট অনুগ্রহ করিয়া, কষ্ট স্বীকার করিয়া, স্বয়ং সেইখানে উপস্থিত হইয়া স্বহস্তে প্রাইজের বইগুলি বিতরণ করিতেছিলেন। ননীগোপাল ব্যাপার দেখিতে গিয়াছিল ; বালকদের উৎসাহ-আগ্রহ-আশা-মাখা মুখ দেখিয়া ননীগোপালের চক্ষের জল অতিকষ্টেই চক্ষে রহিল ; সুবিধা, সময় বা স্থান পাইলে সে জল একবার অনর্গল পড়িত তাহার আর ভুল নাই। তাহার পরে সাড়ে ছয় কোটি লোকের রাজা, লক্ষ টাকার চাকরে, চিড়িয়াখানার প্রতিবাসী ছোট লাট সাহেব দাঁড়াইয়া উঠিয়া অন্যান্য দশ কথার পর গাঢ়স্বরে বলিলেন— " লেখা পড়া ত সকলেই শিখিতেছে ; এখন এ দেশের বড় মানুষের ছেলেদের, ভদ্রলোকের ছেলেদের দশা যে কি হইবে, তাহাই আসল ভাবনার কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

কথা শুনিয়া ননীগোপাল একটু কান্দিল, না কান্দিয়া আর থাকিতে পারিল না ; সেই সঙ্গে সঙ্গেই ননীগোপাল একটু হাসিল, হাসি আপনা আপনি আসিল বলিয়া হাসিল। ননীগোপাল চমৎকারা অন্নচিন্তার দায়ে সকলই করিতে সম্মত, কিন্তু তাহার শরীর তাদৃশ পটু নহে ; ওকালতি করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সেখানে কাহারও বিদ্যা খাটে না, বিদ্যাতে কুলায়ও না, চাকরির চেষ্টা করিয়াছিল,

যোটে নাই, যাহা যুটিয়াছিল তাহা না যোটারই মধ্যে, কারণ তাহাতে মান সম্ভ্রম দূরে থাকুক, গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হওয়া দুষ্কর। সুতরাং ননীগোপাল লাট সাহেবের কথায় মনের বেগ সামলাইতে পারিল না; এত লেখা পড়া শিখিয়া কিছু হইল না, অতএব দশায় হইবে কি—ইহা সত্য সত্যই ভাবনার কথা বুঝিয়াই ননীগোপাল কান্দিল। তখনি আবার লাট সাহেবের অট্টালিকা, লাট সাহেবের গাড়ী ঘোড়া, লাট সাহেবের নাচ গান, লাট সাহেবের খানা পিনা, এত হঙ্গামের ভিতর পরের দশার জন্য ভাবনা কেমন করিয়া থাকিতে পারে, বাস্তবিক থাকিবে না, যথার্থ ভাবনা থাকিলে পন্থাও হয়—এই সব মনে করিয়াই ননীগোপাল হাসিল। সভা ভঙ্গ হইলে ননীগোপাল আবার সেই অন্নের চেষ্টায় ফিরিতে লাগিল।

সংবৎসরেও অন্ন সংস্থান হইল না, কিন্তু অন্নের সংস্থান করা যে খুব সহজ ব্যাপার, ধনী হওয়াটা যে সকলেরই ইচ্ছায়ত্ত, ননীগোপাল ইহা বুঝিতে পারিল। কারণ, সংবৎসরই বক্তার বক্তৃতায় এই কথা, সংবাদ-পত্রের লেখায় এই কথা অনর্গল বাহির হইতেছিল,—India is rich, you are rich; develope the resources of your country, find out the mine of wealth that is in her. Set about your task in right earnest, and you shall want nothing, ইংরেজীতে এই সব, "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" বাণিজ্য করো, কৃষি করো, মাথা করো, মুণ্ড করো—বাঙ্গালায় এই সব কথা, নিত্যই ননীগোপাল শুনি-

তেছিল বা পড়িতেছিল ; যাহার অন্ন আছে সে বলে, যাহার "অদ্য ভক্ষোধনুর্গুণঃ" সেও বলে, যাহার উচ্চ-পদ, তাহার মুখে এই কথা, যে চাকরির জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছে, তাহার মুখেও তাই। দুঃখের বিষয় এই যে এ সকল কথা বুঝিয়াও, ইহার মর্ম্ম জানিয়াও ননীগোপাল এ সমস্ত প্রলাপ মনে করিতে লাগিল।

বৎসর ঘুরিয়া গেল, আবার গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে প্রাইজ বিতরণ ; এবার প্রধান বিচারপতি বক্তা, ননীগোপাল উপস্থিত। প্রধান বিচারপতি বলিলেন, "সকলকেই যে ডাক্তার, উকীল, সঙ্গীত-বিশারদ বা চাক্‌রে হইতে হইবে এমন কোনও কথা নাই। ভগবান এক এক জনকে এক এক গুণ দিয়াছেন, মন দিয়াছেন, মন দিয়া লাগিলে একটা না একটা কাজ যে যুটিবেই, সে কাজে ফল যে ফলিবেই, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এই দেখো, কত ব্যবসা আছে, তোমরা অবলম্বন করিলেই হয়—এঞ্জিনিয়ার হইতে পারো, জরীপের কাজ করিতে পারো, উকীল হইতে পারো, চিকিৎসক হইতে পারো" ইত্যাদি।

বিচারপতি সমস্ত বলিলেন, কেবল পন্থাটা বলিয়া দিলেন না। ননীগোপাল বাড়ী আসিল, কর্ম্ম কাজের আশা ছাড়িয়া দিল, স্ত্রী পরিবারকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়া দিল, মদ ধরিল, ইয়ারকিতে মশ্‌গুল হইল। "মিত্রবদাচরেৎ" কাহাকে বলে, ননীগোপাল তাহা

বুঝিল, ননীগোপাল মানুষ হইল। কিন্তু বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য, মানুষ বেশী দিন টেঁকে না অল্প দিনের মধ্যেই ননীগোপালের স্ত্রী বিধবা হইল, ননীগোপালের ছেলেরা পিতৃহীন হইল। আর "আমার কথাটী ফুরাইল" ইত্যাদি।

মূলে কুঠারাঘাত।

পৃষ্ঠ সূচনা।

বঙ্গদর্শন ত পড়া আছে? তবে আইস ভাই একবার দার্শনিক বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

ভারতের ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম্মী বঙ্গপন্থীই বঙ্গের ভরসা ভারতের ভরসা, জগতের ভরসা। বঙ্গপন্থী বুঝিয়াছেন, বুঝাইতেছেন, বৈষম্য সকল অনর্থের মূল। এই জন্য বঙ্গপন্থী অবতার স্বীকার করেন না। যদি স্বীকার করি, যে মধ্যে মধ্যে এক জন বা দশ জন অমানুষ শক্তি লইয়া জগতে অবতীর্ণ হন, তাহা হইলে বৈষম্যবাদের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। বঙ্গপন্থীর মতে তাঁহারা সকলেই অবতার, সমকার্য্যে সমধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বঙ্গপন্থী বেদ বাইবেল কোরাণ পুরাণ কিছুই মানেন না; গ্রন্থবৈষম্য তাঁহাদের পন্থায় নাই। সেই জন্য বর্ণ পরিচয় হইতে বেদান্ত দর্শন পর্য্যন্ত সকল পুঁথিই তাঁহার দৃষ্টিতে সমান। তৃতীয়ত অর্চ্চনা, বন্দনা, পূজা প্রেমার তাঁহারা

সকলই বৃথা বলেন। আমি ভক্ত, তুমি ভগবান, ঐ কথা ঘোর বৈষম্য মূলক ; এ মোহ-ভাবের প্রশ্রয়দাতা বঙ্গপন্থী নহেন, সুতরাং তিনি অর্চ্চনা বন্দনায় নাই। চতুর্থত বঙ্গপন্থী জানেন, পাপ পুণ্য—মিথ্যা ; বঙ্গপন্থীর নবদর্শনকার, ইহা শ্লাঘার সহিত স্বীকার করিয়াছেন, এবং বঙ্গপন্থীর কার্য্য কলাপে প্রত্যহই এই সাম্যবাদের পরিচয় পাওয়া যায়।

বঙ্গবন্থী বিবেচনা করেন, "মনুষ্যের ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা আপনা হইতে ক্রমে ঘুচিবে। ধূমকণার স্বতন্ত্রতা ঘুচিয়া সমুদ্র হইয়াছে, মনুষ্যের ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা গেলে সেই রূপ কি একটা হইবে।"

এই নরসাগর জমায়েতের পূর্ব্বে দেশে মহাদেশে, গ্রামে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, ভবনে, অঙ্গনে, প্রকোষ্ঠে, খট্টায় যে নরনারীরূপ আকৃতির প্রকৃতিগত বৈষম্য দৃষ্ট হয় তাহা ঘুচিয়া যাইবে, গিয়া কি একটা হইবে।

যত দিন তাহা না হইতেছে, ততদিন বঙ্গপন্থীর মতে, জগতের ভরসা নাই, নরসাগর সৃষ্টির সুযোগ নাই।

স্ত্রী পুরুষের বৈষম্যই সকল অনর্থের মূল। সার্ব্বজনিক, সার্ব্বদেশিক, সার্ব্বকালিক। হিন্দু মুসলমানের ভেদ, পৃথিবীর একদেশব্যাপী ; ব্রাহ্মণ শূদ্র ভেদ এখন কেবল ফলারব্যাপী, ধনী, নির্ধনের ভেদ জেলে নাই, মূর্খ পণ্ডিতের ভেদ সাহেবের কাছে নাই,

নবেল রোমান্সে ভেদ বঙ্কিম বাবুর কাছে নাই, নাটক প্রহসনের ভেদ মিত্রজার কাছে ছিল না, আধুনিক পুস্তক পুঞ্জমধ্যে ওজনগত ভেদ থাকিলেও, পাঠকের কাছে নাই, যোগেশ বাবুর কাছেও নাই। কিন্তু নর নারীর ভেদ কোথায় নাই বল ? বিলাতের সাম্য সভা পার্লিয়ামেণ্ট হইতে দরিদ্রের পাকশালা পর্য্যন্ত এই বিজাতীয় জাতিভেদ কোথায় নাই ? বঙ্গপন্থী এত চেষ্টা করিলেন, তবু ত ধর্ম্ম সভা হইতে স্ত্রী পুরুষের স্থান গত বৈষম্যও উঠিল না! ইংরেজ-রাজ্য সাম্য অবতার,—বড়কে ছোট করিয়া ছোটকে বড় করিয়া অনবরত সাম্য সাধন করিতেছেন ; তথাপি তাঁহার বিখ্যাত সাম্যশালা শ্রীঘরে স্ত্রী পুরুষের স্থান বৈষম্য এখনও ত ঘুচিল না। অহো কি দুর্ভাগ্য !

তাহার পর, আকৃতির বৈষম্য, প্রকৃতির বৈষম্য, বিকৃতির বৈষম্য, নিষ্কৃতির বৈষম্য, পরিচ্ছদের, প্রবৃত্তির, নিবৃত্তির—বৈষম্য, আহারের ব্যবহারের প্রহারের অপহারের উপহারের বৈষম্য,—এ সকল কবে যে ঘুচিবে, বঙ্গপন্থী তাহা তাঁহার নব দুরদর্শনও স্থির করিতে পারেন না।

এই জাতিভেদ সকল জাতিভেদের শিরোমণি অথচ মূল। তলদেশে আঘাত না করিলে আর চলে না। দুঃখভরা ধরার সকল দুঃখের মূলই ঐ।

এই বৈষম্য তাড়নেই লঙ্কাকাণ্ড, ইলিয়ুম নাশ, দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ, ৺মিত্রের মুখহেট, কুচবিহারে

কিষ্কিন্ধ্যা, মৃজাপুরের গৃজাদ্বন্দ্ব। এই জাতিভেদ হইতেই কায়স্থের কন্যা দায়, গ্রাণ্টের ঘোমটা দায়, পঞ্চানন্দের গৃহিণী দায়, সাধারণীর অনাদায়। (এ তাগাদায় কিন্তু লাভ নাই।)

এই বৈষম্য হইতেই ঢেঁকিতে ঢীপ ঢাপ ঢুপ, ব্যাকরণে ঈপ্ আপ্ ঊপ; ঘট ঘটীর দুর্ঘটনা, রমণ রমণীর বিচ্ছেদ যাতনা; লেনিতে father mother, brother sister প্রভৃতি নিতান্ত ঘনিষ্ঠের পৃথক্ পৃথক্ প্রকোষ্ঠে সংস্থান। নাটকে—ললিত ললামের, এবং লীলা লহ-রীর ভিন্ন পথে, এক দল বাহু কম্পে, এক দল পদ ঝম্পে প্রস্থান।

এই জন্যই শকুন্তলা ভবন দুষ্মন্তগণের জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিয়া যাইতেছে! ন্যাশনাল থিয়েটর বসিয়া যাইতেছে, ফৌজদারি আদালত চলিয়া যাই-তেছে, দেওয়ানি আদালত বেনামির বিচারে ব্যস্ত, কালেক্টর নাম খারিজে ব্যস্ত।

এই জন্যই দম্পতি, উপদম্পতি ক্ষণদম্পতি মধ্যে, ঈর্ষার উৎপত্তি। তাৎকালিক জুলুবীর ওথেলো, এই ঈর্ষা হইতেই অকাল মৃত। বন্ধুতায় বন্ধুর-ভাব; সভ্যদলে ভ্রাতৃ ভগিনী ভাব।

এই বৈষম্য হইতেই আলঙ্কারিকের আবিষ্কার। নায়ক নায়িকা ধীর, ললিত, উদাত্ত, শঠ, ধৃষ্টদ্যুম্ন—কলহান্তরিতা, বিরহান্তরিতা, প্রবাসান্তরিতা, প্রকো-ষ্ঠান্তরিতা, প্রভৃতির প্রভেদ।

এই সাংখ্য দর্শনের মূল, অসংখ্য-দর্শনের ভুল। অসংখ্য রোগের সৃষ্টি, অসংখ্য শোকের বৃষ্টি।

এই জন্য, indecency, obscenity, pruriency, *scandalum magnatum, venalum* অশ্লীল, কুৎসিত, কৌরুচ, পৌরুষ, জঘন্য, নগণ্য, ধন্য, বদান্য প্রভৃতি কথার সৃষ্টি, ব্যথার বৃষ্টি, সমালোচকের নিকট ভ্রূকুটি দৃষ্টি। দর্পণে ভণ্ডামি; তর্পণে গোত্রনাম্নী। এই শ্লীলতার দায়েই বঙ্গপন্থী কবির বিদ্যাসুন্দর উদরস্থ রাখেন, সহজে উদ্গার করেন না, শনিবারের পালা পড়েন, হাসেন, তথাপি সভ্য ভাষেন! সকলই না স্ত্রী পুরুষের বৈষম্য জন্য ?

এই বৈষম্যের অনিষ্টকারিতা এখন উপপন্ন হইল; যাহাতে উপায় সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা কর্ত্তব্য, এমত স্থলে

সংস্কার সূচনা।

এই বিষম বৈষম্য একটী মহান্ অনিষ্টকর ব্যভিচার; বঙ্গপন্থী ইহার সংস্কার করিবার অযত্ন চেষ্টা করিতেছেন। এই সংস্কারের সংস্কারক নাই। এবার কার কে চৈতন্য দেব, জিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তর নাই। কোন পরামর্শ নাই, যত্ন নাই, উদ্যোগ নাই, অথচ সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে! ধর্ম্ম যাজন নাই, ধর্ম্ম প্রচারক নাই, কোন গ্রন্থ নাই, (ব্যতীত এই পঞ্চানন্দ) অথচ চারি দিকে ইহার কার্য্য হইতেছে।

কার্য্য নানাবিধ। প্রথম, ঈশ্বর পরিবর্ত্তনে। ব্রহ্মা

ব্রহ্মাণী উঠাইয়া দিয়া, শিব দুর্গা তুলিয়া দিয়া, পুরুষ প্রকৃতির ভেদ ভুলিয়া গিয়া স্ত্রীপুংভাবের বৈষম্য-চ্ছেদ করণার্থ প্রথমেই বঙ্গপন্থী ক্লীব ব্রহ্মের অবতারণা করেন। স্নেহ মায়া থাকিলে স্ত্রীত্য আইসে, কার্য্য-কারিতা থাকিলে পুংত্ব আইসে, কাযেই ঈশ্বর নির্গুণ, নিষ্কাম, নিরাকার জড় ভরত।

কিন্তু এখন আর তাহাতেও কুলায় না। বৈষম্যের এমনই অত্যাচার, যে, এহেন ঈশ্বরকেও লোকে পিতা, কেহ পিতার পিতা, কেহ খুড়ার দাদা, বলিতে ছাড়িল না। সেন সাম্যী ইহার এক অপূর্ব্ব উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন! তিনি এমন ঈশ্বরকে জননী, স্বর্গাদপি বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অচিরাৎ পিতরো, পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌ বলিবেন; তাহা হইলেই ঈশ্বরত্বে জাতিগত বৈষম্যের বিনাশ; সাম্য যোগের জয় জয়-কার।

দ্বিতীয়তঃ নাম করণে সেই সাম্য যোগ। কামিনী সেন, নিতম্বিনী মুন্সি, যামিনী গুপ্ত, ভামিনী দাস, বলিলে এখন আর কোনরূপ আকৃতিগত বৈষম্য সূচিত হয় না। রজনী গুপ্ত নর কি নারী, কেহ দূর হইতে নির্ণয় করিতে পারে না।

তাহার পর পরিচ্ছদাদিতে সাম্য সাধন। স্ত্রীলো-কের মুখাবরণ উত্তোলিত হইতেছে, পুরুষে দাড়ি রাখিয়া মুখাবরণের সংস্থান করিতেছেন তাহাতে ইচ্ছা না থাকিলেও সাম্য সাধন হয়। ফুল বাবু বুকের

দুদিকে দুটী বড় ফুল গুঁজিয়া স্ত্রী অনুকরণে ব্যস্ত, ফুল কুমারী বস্ত্র তাড়নে, অনাহারে, রুচি সংস্কার প্রদর্শন জন্য সন্তানের গর্দ্দভ-দুগ্ধ ব্যবস্থা করিয়া বন্ধ্যাচলকে ভূলীন করিয়া রাখিতেছেন, 'উঠ উঠ বিন্ধ্য রাজ' বৈষম্য-বাদী কবির আবাহনে আর কিছুই হয় না।

অতএব আকৃতি প্রকৃতিগত বিকৃতি বৈষম্য সকল অনর্থের মূল; সেই বিকৃতির তলে আঘাত করিতে বঙ্গপন্থী নিয়তই বিব্রত; আশা করা যাইতে পারে, এই নদ নদী প্রথম প্রয়াগে মিলিত হইয়া ক্রমে ব্যক্তি-গত স্বাতন্ত্র্য ভাসাইয়া নর মহাসাগরে লীন হইবে। যে কয়দিন না হয়, যেমন পুরুষাণুক্রমে চলিতেছে তেমনই থাকুক, পঞ্চানন্দের তাহাতে বিশেষ আপত্তি নাই; বোধ হয় পাঠক পাঠিকার আপত্তিও না থাকিতে পারে।

বাঙ্গালা ভাষা উঠাইয়া দিতে আপত্তি আছে।

অপামর সাধারণ এক মত হইয়া যে কাজ করিতে মনস্থ করেন, তাহার বিরুদ্ধভাব করিবার চেষ্টা করা যে ধৃষ্টতা মাত্র, তাহা আমি অবগত আছি। আর, সকলে যাহা ভালো বলিয়া বিবেচনা করে, তাহা এক জন লোকে মন্দ বলিলেই যে মন্দ হইবে, ইহাও আমি বিবেচনা করি না। এমন কথা প্রকাশ করিলে ইহাকে বুদ্ধির বিড়ম্বন মনে করিবার অধিকার সক-লেরই আছে। আজি কালি বাঙ্গালা ভাষা উঠা-

ইয়া দিবার জন্যেও এইরূপ একটা সর্ব্ববাদিসম্মত অভিপ্রায় দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং এই অভিপ্রায়ে বিরুদ্ধাচরণ করিবার চেষ্টা করাও যে অসমসাহসিকতা এবং নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। "দশ চক্রে ভগবান ভূত" এ প্রবাদও আমি অবগত আছি। কিন্তু রোগই বলুন, কিম্বা মানব প্রকৃতির শূকরত্বই বলুন, এরূপ দিগ্‌গজ পণ্ডিতদের মত সত্ত্বেও আমি বাঙ্গালা ভাষার উচ্ছেদ সাধনে সম্মত হইতে পারিতেছি না। ইহা আমার দুর্ব্বুদ্ধি হইতে পারে, দুর্ভাগ্য হইতে পারে, কিন্তু সত্য সত্য মনে যাহা হইতেছে তাহা কেমন করিয়া চাপিয়া যাইব? অধিক কি, যদি ন আইনে পঁয়তাল্লিশ আইন যোগ করিয়া স্বয়ং লাট সাহেব আমাকে তোপে উড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলেও বাঙ্গালা ভাষা উঠাইয়া না দিলে যে কিছুতেই চলিতেছে না এরূপ ধারণা করিতে আমি অক্ষম।

কিন্তু যেখানে সকলেই বলিতেছেন যে বাঙ্গালা ভাষা না উঠাইয়া দিলে বঙ্গদেশের সর্ব্বনাশ, সেখানে অবশ্যই আমার বক্তব্য বিনয়ের সহিত, ধৈর্য্যের সহিত এবং গাম্ভীর্য্যের সহিত প্রকাশ করিতে আমি বাধ্য। গুরুতর প্রশ্নে পণ্ডিতগণের প্রতিকূল কথা বলিতে হইলে সম্মানের সহিত বলা আবশ্যক তাহা আমি জানি। অতএব আমি যে সকল আপত্তি নিবেদন করিতেছি তাহার সারবত্তার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বঙ্গ-

বাসী বিদ্বানমণ্ডলী আমার ব্যবহারের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিবেন না। এই আমার ভিক্ষা।

ফলতঃ আমাকে এত মূর্খ বা বোকা মনে করিবেন না, যে, সত্য সত্যই কেতাবী বাঙ্গালা ভাষার অনুকূলে আমি বদ্ধপরিকর হইয়াছি। যাহাতে এত ষত্ব ণত্ব হ্রস্ব দীর্ঘের উৎপাত আছে, তাহা লইয়া ভদ্র লোককে বিব্রত করিতে কোন্ পামরের ইচ্ছা হইতে পারে? তবে তেলী তামলী, গয়লা মালী, চাষা ভূষো, হাড়ি ডোম্ প্রভৃতি গরিব দুঃখী লোক যে ভাষাকে অবলম্বন করিয়া কোন রূপে পাপ বাঙ্গালী জন্ম কাটাইয়া যাইতেছে, তাহা উঠাইয়া দিতেই আমার আপত্তি, ইহা আমি শতবার স্বীকার করি।

যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষা উঠাইয়া দিবার পক্ষ, তাঁহাদের প্রধান তর্ক এই যে বাঙ্গালা ভাষা বজায় রাখিলে অন্ততঃ দুইটা ভাষা শেখা আবশ্যক হইয়া উঠে। তাহা হইলেই প্রথমতঃ অকারণে অনেক বহুমূল্য সময় নষ্ট হয় এবং দ্বিতীয়তঃ ভাষার বিরোধ হেতু মনেরও বিচ্ছেদ জন্মে।

এ তর্ক যে নিতান্ত অসার ইহা বলিতে আমার সাহস হয় না। কিন্তু এ তর্কের কোথায়ও যে খুঁত নাই, তাহাও ত বলিতে পারি না। একাধিক ভাষার কথা যে বলা হয় তাহা ইংরেজীকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হয়, ইহা আমি ধরিয়া লইলাম। ইংরেজী রাজভাষা, অতএব অর্চ্চনার বস্তু, তাহা আমি মানি। কিন্তু

শুনিতে পাওয়া যায়—ইংরেজ বাঙ্গালী উভয়েই এ কথা বলেন—যে এমন দিন আসিতে পারে যে ইংরেজ-রাজ আমাদিগকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া যাই-বেন। যদি তাহা ঘটে, অথচ বাঙ্গালা ভাষার অস্তিত্ব তখন লোপ পাইয়া থাকে, তাহা হইলে গরিব বেচা-রারা দাঁড়ায় কোথায়? মনুষ্যের যে উৎপত্তিতত্ত্ব ডার্বিন্ সাহেব আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার সত্যতার প্রতি সংশয় না থাকিতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া হঠাৎ এক দিন বাঙ্গালীকে সেই তত্ত্বের প্রমাণ দিতে বসিতে হইলে এবং জানি না কত যুগ পিছু হাঁটিয়া যাইতে হইলে, বোধ করি নিতান্ত সুখের কথা হইবে না। এই কথাতেই সময় নষ্টের আপত্তি কথঞ্চিৎ খণ্ডিত হইতেছে। ফলে তাহা না হইলেও, আগা-গোড়া লোককে বাঙ্গালা ভুলাইবার জন্য যে অনেক সময় লাগিবে না, ইহাও নিশ্চিত বলা যায় না। বলিতে আশঙ্কা হয়, কিন্তু বিনীতভাবে বলা যাইতে পারে যে বৃদ্ধ পিতা মাতাকে, কালে ভদ্রে পত্র লেখা আবশ্যক হইলে Dear Papa, Dear Mamma না লিখিয়া প্রিয় বাপ, প্রিয় মা সম্বোধন করিয়া কতক সময় বাঁচা-ইতে পারা যায়, এবং সে সময় টুকু বাঙ্গালা ভাষাকে দেওয়া যাইতে পারে। এটা যে একটা গুরুতর তর্ক তাহা বলিতেছি না, তবে অন্য দশ কথার সঙ্গে ইহার বিবেচনা করিলে করা যাইতে পারে, এই মাত্র আমার বলিবার উদ্দেশ্য।

ভাষা বিরোধের যে কথা বলা হইয়াছে তাহা যে একেবারেই অসঙ্গত তাহা বলি না। কিন্তু বড় লোকে ছোট লোকে, ইতরে ভদ্রে, সুশিক্ষিত বাবুতে এবং অসভ্য চাষাতে যখন একটা প্রভেদ থাকা অত্যাবশ্যক, বিরোধ না থাকিলে প্রকৃত উন্নতির আশা করা যাইতে পারে না, তখন ভাষা-বিরোধের আপত্তি বা মনো-মালিন্যের শঙ্কা, কেমন করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদনীয় হইতে পারে? যত্ন করিয়া যাহা রাখিতে হয়, চিরদিন যাহা রাখিতে হইবে, তাহার রক্ষণপ্রণালী লইয়া এত বাছবিচার করিলেই বা চলিবে কেন? এখন ত বাঙ্গালা ভাষা জীবিত আছে—বিকারের রোগীর মত তাহার অবস্থা বটে, তথাপি জীবিত—এখন যে কারণে বঙ্গবাসীর হিতের কথা হইলে, কোন একটা দরকারী কথা হইলেই ইংরেজীতে বাদ, প্রতিবাদ, বিতর্ক, বিতণ্ডা, বিচার, বক্তৃতা করা যায়, বাঙ্গালা ভাষা উঠাইয়া দিলেও ত সে কারণের বিনাশ হইতেছে না। সাধারণ বাঙ্গালী যাহাতে না বুঝিতে পারে তাহাই ত উদ্দেশ্য, তা বাঙ্গালা উঠাইয়া দিলেই যে সকলেই ইংরেজীতে দখলীসত্ত্ব বিশিষ্ট হইয়া উঠিবে, মারুন্ আর কাটুন্ এমন বিশ্বাস ত আমার হয় না। লোকে এখনও বোঝে না, তখনও বুঝিবে না এমত স্থলে সামান্য ব্যক্তিদের যৎসামান্য ভাব বিনিময়ের পথে কাটা দেওয়াটা কি খুব সুবিবেচনার কাজ হইবে?

বাঙ্গালা ভাষার বিরোধীগণ আরও বলেন, যে বাঙ্গালা যখন মাতৃভাষা তখন শিক্ষা করিতে এত কষ্ট স্বীকার করিব কেন? অথচ লিখিতে, বুঝিতে গেলেই কষ্ট স্বীকার না করিলে উপায় নাই।

যে জাতি, গুলি ডাণ্ডা খেলিয়া, গুলি গাঁজা ফুঁকিয়া, পিতার, পিতামহের, মাতামহের এমন আরও দশ জনের বিষয় হস্তগত করে, তাহার এরূপ তর্ক করিবার অধিকার অবশ্যই আছে। কিন্তু জাতিভুক্ত সকল ব্যক্তিই এমন সৌভাগ্যশালী নয়; অনেককে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, দুই প্রান্ত এক ঠাঁই করিতে হয়। ঈদৃশ অবস্থাপন্ন লোকের জন্য বাঙ্গালাটা রাখিয়া দিলে ক্ষতি কি? যাহারা ধনবান, জ্ঞানবান, বিদ্যাবান, স্বদেশ বৎসল, বাক্য সচ্ছল, তাঁহারা এখনও বাঙ্গালা শেখেন না, তখনও শিখিবেন না। সুতরাং তাঁহাদের কোন কষ্ট নাই। তবে জোর করিয়া ভাষাটা উঠাইয়া দিয়া কাজ কি? ভাষা উঠাইয়া দিতে ইহাঁরা যে পরিশ্রম করিতে উদ্যত, সেই পরিশ্রম অন্য কার্য্যে নিয়োগ করিলে তাঁহাদের সুখ হইতে পারিবে, অভাগারাও কিছু দিনের জন্য রক্ষা পাইবে। ক্রমে বড় দরের লোকের মনোভাব চুঁইয়া চুঁইয়া ক্ষুদ্র দলের ভাবান্তর করিয়া দিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে ব্যস্ত হইয়া কাজ কি?

কেহ কেহ বলেন যে বাঙ্গালায় শিখিবার কোনও

কথা নাই, পড়িবার কোনও পুস্তক নাই, তবে এমন ভাষা থাকিতে দিব কেন ?

একথা সম্পূর্ণ সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিলে কোন ভাষাই টেঁকিতে পারে না। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই যে ভাষা মাত্রেই উঠিয়া যাউক এরূপ অভিপ্রায় কাহারও নহে। কারণ সকল ভাষারই শৈশব যৌবন আছে বলিয়াই সাধারণের প্রতীতি। বাঙ্গালার না হয় সেই শৈশব মনে করা যাউক; যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারা বাঙ্গালাকে গলহস্ত না দিয়া পুস্তকাদি লিখিলে সে ক্ষোভ নিরাকৃত হইতে পারে। তবে যদি বলেন যে লিখিয়াই যদি পড়িতে হইল, তাহা হইলে আমার না লেখাই ভালো—যদি এ কথা বলেন, আমি নাচার, নিরুত্তর।

পঞ্চানন্দী ব্যাকরণ।

বিশুদ্ধ ভাবগ্রহ না হইলে রসের উদ্বোধ হয় না। ব্যাকরণে জ্ঞান না থাকিলে ভাবগ্রহ অসম্ভব। সেই জন্যই পঞ্চানন্দের রস হৃদয়স্থ করিতে অনেকে অসমর্থ। ইহাদের উপকারার্থ সচ্চিদানন্দকে নমস্কার করিয়া পঞ্চানন্দী যে-এই ব্যাকরণ তাহা প্রণীত হইতেছে।

সংজ্ঞা প্রকরণ।

দ্বেষ, হিংসা, ক্রোধ, অভিমান, মত্ততা ও উন্মত্ততা এই ছয় পদার্থে সংজ্ঞার লোপ হয়। পঞ্চানন্দী ব্যা

রণে এই ছয় বৰ্জ্জিত। যাহারা বর্জ্জনে অক্ষম, এই ব্যাকরণের কোনও প্রকরণেই তাহাদের অধিকার নাই।

বিভাগ নির্ণয়।

ব্যাকরণের পাঁচ অঙ্গ;—বর্ণ অঙ্গ, ব্যুৎপত্তি-অঙ্গ, ভাব-অঙ্গ, ছন্দ-অঙ্গ, রস-অঙ্গ। এই পাঁচ অঙ্গে পঞ্চানন্দ সম্পূর্ণ।

১। বর্ণ-অঙ্গ; যে অঙ্গে হ্রস্ব দীর্ঘ, উত্তর পূর্ব্ব, শকার নকার প্রভৃতির বিড়ম্বনা, তাহারই নাম বর্ণ-অঙ্গ। বিড়ম্বনার কর্ত্তা নন্দী এবং তাঁহার অনুচরবর্গ।

২। ব্যুৎপত্তি-অঙ্গ; পঞ্চানন্দে যে সকল শব্দের প্রয়োগ হয়, তাহার প্রকৃতি এবং বিকৃতি যে অঙ্গে নির্দ্দেশ করিয়া দেয় তাহাকে ব্যুৎপত্তি অঙ্গ কহা যায়। ব্যুৎপত্তি সহজে হয় না, কারণ ইহা ঈশ্বরদত্ত; সেই জন্য গাধা পিটিয়া ঘোঁড়া করা অসম্ভব।

৩। ভাব-অঙ্গ; যাহাতে শব্দবিন্যাসের চাতুরি বোঝা যায়, তাহাকে ভাব বলে। ভাব দুই প্রকার; যাহারা বুঝিতে পারে, পঞ্চানন্দের সহিত তাহাদের সদ্ভাব; যাহারা অবোধ, তাহাদের সমস্তই অভাব।

৪। ছন্দ-অঙ্গ; যেখানে মাত্রার তারতম্য দেখা যায়, সেই স্থানকে ছন্দের বিষয়ীভূক্ত বলা যায়। ফকীর চাঁদের মাত্রা, নেহালিনীর মাত্রা, ভুবনমোহিনীর মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন রকম। মাত্রার দোষে বা গুণে টলিয়া পড়িলে অথবা টলাইলে ছন্দোভঙ্গ হয়। যাহারা

ছন্দোভঙ্গ করে, তাহারা স্বতঃ বা পরতঃ গবর্ণমেণ্ট হইতে লাইসেন লয়।

৫। রস-অঙ্গ; কটুকথা, বিচ্ছেদ, মান, ক্ষমা, মিলন—এই পাঁচ পদার্থ যে অঙ্গে থাকে, তাহাকে রস-অঙ্গ কহে। পঞ্চানন্দের সর্ব্বাঙ্গেই রস, সেই জন্য এই সমুদয়ে পঞ্চানন্দের অধিকার সর্ব্ববাদি সম্মত। কপালে ঘটেও সব।

বর্ণ নির্ণয়।

যাহাদিগকে লইয়া শব্দ তাহাদের প্রত্যেককে বর্ণ বলা যায়।

আদিতে চারি বর্ণ ছিল। অনুলোম, প্রতিলোম, ক্রমে ছাত্রিশ বর্ণ দাঁড়াইল; ইহার উপরেও কতকগুলি বর্ণচোরা হইল। সুতরাং এখন বর্ণ সংখ্যা উনপঞ্চাশের কম নহে।

বর্ণ বিভাগ।

বর্ণ দুই প্রকার, স্বর ও হল।

যে বর্ণ নিরাশ্রয় হইলেও কার্য্যকর, অন্যের অবলম্বন না পাইলেও এক রকমে চলিয়া যায়, তাহার নাম স্বর। পঞ্চানন্দ স্বয়ং স্বর বর্ণ।

স্বর দ্বিবিধ, তীক্ষ্ণ ও ভোঁতা। যাহা খট্ করিয়া মনে লাগে এবং ব্রহ্মজ্ঞানীরও মর্ম্মভেদ করিয়া চিত্ত-বিকার উৎপাদন করে তাহাকে তীক্ষ্ণ স্বর কহে।

সেই আক্রোশে অবশিষ্ট অংশকে ভোঁতা বলা হয়।

স্বরবর্ণ যাহাদিগকে চালায় অর্থাৎ পঞ্চানন্দ পাঠে যাহারা বিচলিত হয় তাহাদিগকে হল বর্ণ কহে। হলবর্ণ পরমুখ প্রত্যাশী হইলেও, চাষার অস্ত্র হইলেও তাহার উপকারিতা আছে; তাহার গুণে ভাষার অর্থাৎ পঞ্চানন্দের উৎকর্ষণ হয়।

বর্ণের উৎপত্তি স্থান।

১। মনের মধ্যে উদিত হইয়া কণ্ঠ, তালু, জিহ্বা, ওষ্ঠ ও নাসিকার সাহায্যে অথবা কাগজ কালি কলমের সাহায্যে স্বরবর্ণ উৎপন্ন হয়। এই স্থান ভেদ বা প্রকরণ ভেদ, অবস্থাভেদেই হইয়া থাকে; যথা, নিতান্ত বিব্রত অবস্থায় স্বর নাকী হয়।

২। গালাগালিতে লোভ এবং অর্থে তিতিক্ষা সংযুক্ত হইলেই হল বর্ণ উৎপন্ন হয়। এরূপ না হইলে চাষার হাতে পড়িবে কেন?

সন্ধি প্রকরণ।

একাধিক বর্ণ একত্র করিয়া ঘনিষ্টতা করিলেই সন্ধি হয়। সন্ধি হইলে মনের খট্‌কা যায়; যথা, শ্রীক্ষেত্রে, হোটেলে।

সন্ধি দুই প্রকার, স্বর সন্ধি ও হল সন্ধি।

১। যেখানে মনের কোরকাপ মিটিয়া পঞ্চানন্দ এবং তাহার স্বরে সম্পূর্ণ একীভাব হইয়া যায় সেই খানেই স্বরসন্ধি হয়। যথা, নবপঞ্জী।

২। হলবর্ণ যদি স্বরবর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী

হইয়া মিলিত হইলে স্বরবর্ণে পাঁচ টাকা সংযুক্ত হয় তাহা হইলে হলসন্ধি হয়। এবং হলবর্ণের পর হলবর্ণ আসিয়া পঞ্চানন্দের তহবিলে মিলিত হইলেও হলসন্ধি হয়। উদাহরণ বাহুল্য মাত্র।

টীকা।—গ্রাহকগণ কোন কারণে চটিয়া গেলেই সন্ধির বিচ্ছেদ হয়। তাহাতে ভাষাব অনিষ্ট, উভয় পক্ষের বলক্ষয়।

ণত্ব ও ষত্ব বিধান।

ইহার ধার পঞ্চানন্দ ধারেন না, ইচ্ছা থাকিলেও পরের জ্বালায় পারেন না। বাস্তবিক ষত্ব ণত্ব এক প্রকারের গর্দ্দভের সেতু; ষত্ব ণত্বের ভয়েই অধিকাংশ গর্দ্দভ বাঙ্গালা ভাষায় পারগ হইতে পারে না।

পঞ্চানন্দী ব্যাকরণে ভদ্রতা হইলে সত্ব, না হইলে নত্ব।

শব্দ নির্ণয়।

পঞ্চানন্দ পাঠে যে স্ফুট ও অস্ফুট ধ্বনি পাঠকগণ করিয়া থাকেন তাহার নাম শব্দ।

বিভক্তি নির্ণয়।

শব্দের পর বিভক্তি হয় অর্থাৎ হয় বিশিষ্টরূপ ভক্তির উদ্রেক হয় নতুবা ভক্তি বিগত হইয়া হাড়ে চটিয়া যাইতে হয়।

পদ প্রকরণ।

বিভক্তি যোগের পরেই পদের প্রয়োগ; যাহাকে

যেমন পদ দেওয়া উচিত তাহাকে সেইরূপ পদ দেওয়া যায়।

পঞ্চানন্দ তিন প্রকার পদ দিয়া থাকেন; সম্পদ বিপদ এবং এক প্রকার উপপদ, যাহার নাম অব্যয়।

পঞ্চানন্দের আবরণে যাহার নাম প্রকটিত হয়, তাহাদেরই সম্পদ, যথা মহারাণী স্বর্ণময়ী।

পঞ্চানন্দ যাহার ঘাড়ে চাপেন তাহারই বিপদ, যথা পঞ্চানন্দের সৌখিন সম্পাদক; পঞ্চানন্দের দায়-গ্রস্থ পাঠক।

যাহারা গালাগালি খান, গালাগালি দেন, অথচ একটী পয়সা ব্যয় না করিয়াও ভজনার রবিবারে পঞ্চানন্দ পাঠ করেন তাহারা অব্যয়। সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে অব্যয়ে বিভক্তি যোগ হয় না। উদাহরণ রাণী যদি গলিতে পাওয়া যায়।

বচন।

পদ প্রয়োগ করিতে হইলেই বচন আবশ্যক, বচন দুই প্রকার সুবচন ও কুবচন।

এক কথায় যাহার সঙ্গে কাজ হয়, একবার চাহিবা মাত্র যে দেনা পরিশোধ করে, তাহার প্রতি সুবচন।

অধিকাংশ লোকই বেয়াড়া, বহুবচনেও তাহাদের কিছু হয় না। অগত্যা কুবচন।

পুরুষ।

পুরুষ ত্রিবিধ। আমি নিজে উত্তম পুরুষ, তুমি

যদি ইহা স্বীকার কর তাহা হইলে তুমি মধ্যম পুরুষ। আমি তুমি ছাড়া (চক্ষুলজ্জার ভয় না থাকিলে) সকলেই কাপুরুষ (নিকটবর্ত্তী হইলে একটু লজ্জা হয়, সুতরাং সেরূপ স্থলে সেই) তৃতীয় ব্যক্তি প্রথম পুরুষ।

কারক।

যাহাদ্বারা পদপ্রয়োগ, কালে সম্পর্ক বোঝা যায় তাহাকে কারক বলে। কারক ছয় প্রকার—কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্বন্ধ, অপাদান, অধিকরণ।

যিনি আহার যোগান সুতরাং যাহার মন যোগাইতে হয় তিনি কর্ত্তা। অবস্থা বিশেষে সকলেই কর্ত্তা হয়।

দায়গ্রস্ত হইয়া যাহা করিতে হয় তাহাই কর্ম্ম, সুতরাং পঞ্চানন্দী ব্যাকরণে সৎকর্ম্ম কুকর্ম্মের প্রভেদ থাকা অসম্ভব।

যাহাদ্বারা কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইতে হয় সেই করণ। যথা, পঞ্চানন্দের উপলেখক সম্প্রদায়। যাঁহার মধ্যবর্ত্তিতায় গ্রাহকগণের সহিত পঞ্চানন্দের সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয় তিনি সম্বন্ধকারক; যথা, কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৪৪ নং রসারোড ভবানীপুর।

যাহা হইতে পঞ্চানন্দ ভয় পান, যথা, বঙ্গীয় সমালোচক; যাহার কথায় পঞ্চানন্দ চালিত হন, যথা, শুভাকাঙ্খী বন্ধু, তাহারা অপাদান কারক।

যেখানে যে দিন কার্য্য সম্পন্ন হয় সেই সেদিনকার

অধিকরণ। টেক্স প্রভৃতির যে রকম উৎপীড়ন তাহাতে বোধ হয় যে কিছু দিন পরে অধিকরণ একেবারেই উঠিয়া যাইবে।

ধাতু।

যে সকল লোকের সহিত পঞ্চানন্দের আলাপ আপ্যায়িত, দহরম মহরম, করিতে হয় তাহাদের স্বভাবকে ধাতু বলে।

প্রত্যয়।

অষ্ট ধাতুর লোকের সঙ্গে যখন পঞ্চানন্দের চলিতে হইতেছে তখন বিশ্বাস না করিলে উপায় নাই। এই বিশ্বাসের নাম প্রত্যয়।

ধাতু বুঝিয়াই প্রত্যয় করা যায়; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে প্রত্যয়ের পর অনেক ধাতুর রূপান্তর হয়।

সমাস।

এক স্থানে দুই চারিটা কথা হইলেই সমাস হয়। সমাস ছয় প্রকার।

১। সমশ্রেণীর কথা একত্র হইলে অর্থাৎ কথার উপর কথা বা যত বড় মুখ তত বড় কথা হইলেই দ্বন্দ্ব বলা যায়।

২। দ্বন্দ্বকারী উভয় পক্ষই যখন অশ্রাব্য প্রয়োগে হাট করিয়া তোলেন তখন দ্বিগু বলা যায়।

৩। দোস গুণ বর্জ্জিত কেহই নহে, অতএব সকলেই কর্ম্মধারয়।

৪। যখন পদে পদে একাকার হয়, বিভক্তির চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকে না অনুমানের দ্বারা পাত্রাপাত্র স্থির করিয়া লইতে হয়, তখন তৎপুরুষ।

৫। যাহাদের নাম লইয়া সমাস, কাজের সময়ে যদি তাহাদের কোন স্বার্থই সিদ্ধ না হয় তাহা হইলে সেরূপ স্থলে বহুব্রীহি সমাস বলা যায়। যথা, ভারত-সভা বলিলে ভারতের অনর্থ সুতরাং সভা ব্যর্থ, কেবল গলাবাজী ও কলম বাজী বোঝায়।

৬। যাহারা বাপ পিতামহের টাকা দুহাতে অপ-ব্যয় করিয়া শেষে নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় কুলা-ইতে পারে না অগত্যা অব্যয়ের ভাব প্রাপ্ত হয় তাহারা অব্যয়ীভাব। অব্যয়ীভাবের দৃষ্টান্ত শুঁড়ীর খাতায় ও ইন্‌সালবেণ্ট অদালতে পাওয়া যায়।

বর প্রার্থনা।

১। দয়াময়, তুমি আমার উপর সদয় হইয়া বর দিতে সম্মত হইয়াছ ; এখন আমি মনোনীত করিয়া লইলেই হয়। কিন্তু, দয়াময়, আমি বাঙ্গালীর ছেলে, নানা রূপে বিব্রত, বহুতর দায়গ্রস্ত ; কি বর লইব, ভাবিয়া অস্থির হইতেছি।

২। দয়াময়, এ বিপদ সাগরে তুমিই তরণী, এ তরণীতে তুমিই কর্ণধার, তুমিই আমার ভার গ্রহণ করো, যাহাতে আমার ভালো হয়,' তাহাই করো।

সকল কামনা জানাইতেছি; যেটা পূর্ণ করা তোমার সাধ্যায়ত্ত, তাহাই করো।

৩। আমাকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, বিপুল ধনের অধিপতি করিয়া দাও। আমি খানা দিব, আপনি খাইব না, খানার সময়ে খানসামাবেশে দণ্ডায়মান থাকিব, বল্ নাচ যাহা আবশ্যক হইবে করিয়া দিব, আপনি দ্বার রক্ষকের ভাবে বাহিরে থাকিব, গাড়ী ঘোড়া বাখিব, তোমার সেবায় তাহা অষ্টপ্রহর নিযুক্ত থাকিবে, তোমার নিয়োগ অনুসারে দান করিব, চাঁদা দিব, ভূগোলে জ্ঞান ও বিশ্বাস, না থাকিলেও তুমি কোনও দেশের নাম করিলেই আমি তাহার উপকারার্থে মুক্তহস্ত হইব। কানাচে হাহাকার উঠিলে শুনিব না, এ কর্ণদ্বয় তোমারই জন্য, সম্মুখে দহ পড়িলে দেখিব না, এ চক্ষুর্দ্বয় তোমারই জন্য; অন্নের গ্রাস মুখে তুলিবার জন্য হস্ত সঞ্চালন করিব না, করদ্বয় তোমারই জন্য। দয়াময় এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়, নবদ্বার লইয়া যাহা করিতে হয় করো, আমি কথাটী কহিব না। তবে, দয়া করিয়া, আমাকে উপাধিদানে কাতর হইও না, দেবপত্রে ধন্যবাদ গানে বিমুখ হইও না; আমাকে মহারাজ বলিও, আমি লোকের মাথা কামাইয়া দিয়া সকল সাধ মিটাইয়া লইব।

৪। দয়াময়, আমি তোমার বেতনভোগী ভৃত্য, অহরহ পদ সেবায় নিযুক্ত আছি, এ দেহ তোমার অন্নে রক্ষা করিতেছি। আমি ভূমিশূন্য, আমাকে

রাজা করিয়া দাও; আমি নাচ, আমাকে বাহাদুর করিয়া দাও। আমি তোমাকে অভিনন্দন দিব, তোমার যশোধ্বজা উড্ডীয়মান করিয়া পথে পথে তোমার মহিমা সংকীর্ত্তন করিব, ক্ষুদ্র সামর্থ্যে যাহা কুলাইবে, তোমার জন্য সকলই করিব। তুমিই আমার ধর্ম্ম, তুমিই আমার কর্ম্ম, তুমিই আমার গতি, তুমিই আমার মুক্তি, বাক্যে ইহা বলিব, মনে ইহা মানিব, শরীরের দ্বারা ইহার প্রমাণ দিব। সাত শ টাকার নবাবী তোমার মুখের কথায় হইতে পারে, তোমার তাহাতে লোকসান নাই আমার সমূহ লাভ; দয়াময়, আমাকে তাহা দাও।

৫। দয়াময়, আমি পেটের জ্বালায় অস্থির, কাচ্চা বাচ্ছা আছে, পরিবার আছে, তুমি আমাকে বড় চাকরি দাও। কলঙ্কের ডালি মাথায় বান্ধিয়া, ভূমি-লুণ্ঠিত হইয়া, দুই হাতে তোমাকে নমস্কার করিব। আমি তোমার একান্ত অধীন, তোমার মন যোগাইতে আমি সকলই করিব। যাহারা আমার অধীনস্থ হইবে, তাহাদের উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে পাইলেই আমার সকল অভাব পরিপূরিত হইবে। তুমি আমাকে চাকরি দাও।

৬। তোতা পাখী যাহা পারে না, আমি তাহা করিয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগ্রস্ত হইয়াছি, ওকালতীর যোগ্য হইয়াছি। দয়াময়, আমাকে মোক্তারের ভগিনীপতি, জমীদারের ভাগিনেয়, আমলার

শালীপতি ভাই কিম্বা হাকিমের জামাতা যাহা হউক একটা করিয়া দাও, আমি লোক ভুলাইয়া গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিয়া লইব। দয়াময়, এখন যে তকমা অপেক্ষা সুখতলার মূল্য বেশি তাহাতে আমার দোষ কি ?

৭। আমাকে দেশহিতৈষী করিয়া দাও ; আমি যাহা ইচ্ছা বকিতে থাকিব মাতৃ ভাষায় শ্রীমুখ কলুষিত করিব না, তোমার কোনও অনিষ্ট করিব না, আমাকে পাগলাগারদে পাঠাইয়া দিও না। আমি অক্ষম, নানা রকমে নাচার, তুমি দয়া করো ; আমি বড় হইব।

৮। দয়াময়, আমি জাতি মানি না, কারণ তাহা হইলে তোমার প্রসাদ খাইবার ব্যাঘাত হইতে পারে। আমার অভিমান নাই, তোমার পদধূলি গ্রহণ করাই আমার পরমানন্দ। আমার অহঙ্কার নাই, মস্তকে তোমার বামপদের অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করাই আমার জীবনের মহাব্রত। আমার সাহস নাই, তোমার শাসন বাহুল্য মাত্র। আমার লজ্জা নাই ; কেবল বচনে আমি অদ্বিতীয়। তুমি আমাকে রক্ষা করো।

বয়সের বিচার।

ধর্ম্মোপদেষ্টা যখন তখন বলিতেছেন "মুহুর্মুহু বয়স কমিয়া যাইতেছে, অতএব অনিত্য সংসারের চিন্তায় সতত নিয়ত না থাকিয়া হরি চরণে স্মরণ

লও"। জড়বুদ্ধি ডাক্তার বলিতেছেন, "প্রতিক্ষণে বয়স বাড়িতেছে, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ বাড়িবে। তাহার পর সব ফুরাইবে; অতএব নিয়ম পূর্ব্বক এখন খাও দাও, যাহাতে শেষ পর্য্যন্ত দেহ বজায় রাখিতে পারা যায়।

এখন সমস্যা শক্ত, প্রকৃতপক্ষে বয়স বাড়ে কি কমে?

পঞ্চানন্দ এতদ্দ্বারা জানাইতেছেন যে, যিনি যাহা বলুন, বাস্তবিক বয়স বাড়েও না, কমেও না। যাহার যখন যত বয়স তখন ঠিক ততই বটে; কমও নয় বেশীও নয়।

তবে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, যে এরূপ বয়সের হ্রাস বৃদ্ধির সমস্যা উঠিল কোথা হইতে? উত্তর দেওয়া যাইতেছে।

বয়সের হ্রাস বৃদ্ধি নাই বটে, কিন্তু বয়স স্থিতিস্থাপক পদার্থ, টানিলেই বাড়ে আবার ছাড়িয়া দিলেই কমিয়া যায়। এ হিসাবে বয়স তিন প্রকার; যথা, (১) যাহা বাড়েও না কমেও না তাহা আসল বা ঠিক বয়স। ইংরেজী নাম real age.

(২) যাহা বাড়ে তাহা পেশাদারী বয়স; পেশাদার হইতে হইলে বিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা দেখান আবশ্যক, সেই জন্য বয়স টানিয়া বয়স বাড়াইতে হয়, ইংরেজীতে ইহাকে বলে professional age.

(৩) যাহা কমে, তাহাকে বলে চাকরের বয়স।

না কমাইলে অনেককে পেনসন লইতে হয়, সেই জন্য বয়স কমিয়া যায়। ইংরেজীতে বলে official age.

(৪) আর দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিলে যে বয়স কমে, তাহাকে বলা যায় গরজের বয়স অথবা selfish age; অতএব ধর্ত্তব্যই নহে।

দশ অবতার।

হিন্দুশাস্ত্রকর্ত্তারা ইতিহাস, দর্শন বা নীতি শাস্ত্রের কথা রূপক অলঙ্কারে সাজাইয়া বলিয়া গিয়াছেন, সাদা সিধা কথায় প্রায় কিছুই বলেন নাই। মানব সমাজের উন্নতির ক্রম দেখাইবার জন্য দশ অবতারের যে কল্পনা করিয়াছেন, দৃষ্টান্ত স্থলে তাহার উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। এ টুকু বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, দশ অবতার বলিলে সেই একই পদার্থ চির-কাল বুঝিতে হইবে, তাহা নহে। শাস্ত্রকর্ত্তারা যুগে যুগে যেমন অবতার কল্পনা করিয়াছেন, পঞ্চানন্দ এই এক যুগেই সেই সমুদয় অবতার দেখাইয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। অধিকন্তু এক বঙ্গদেশেই সমস্ত বিরাজমান, সুতরাং বঙ্গের এমন সৌভাগ্যের পরিচয় দেওয়াই পঞ্চানন্দের কর্ত্তব্য।

১।—সত্য যুগের অবতার।

এখন সত্য ত্রেতা দ্বাপর নহে মনে করিয়া, যাঁহারা বঙ্গদেশে সত্যযুগের অবতার থাকা অসম্ভব বিবেচনা

করিবেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। বাস্তবিক যেখানে ন্যায় রক্ষা, অন্যায়ের শাসন হইতেছে; যেখানে মিথ্যা প্রবঞ্চনা প্রভৃতি পাপের লেশ মাত্র নাই; যেখানে ষোলো আনা পুণ্য—সেই রাজদ্বারেই সত্যযুগ।

সত্যযুগে চারি অবতার—, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ এবং নৃসিংহ। রাজদ্বারেও এই চারি অবতার আছেন।

প্রথম মৎস্য;—ইনি বঙ্গদেশের পুলিশ; গভীর জলে বাস, ক্রীড়াচ্ছলে যখন পুচ্ছ আস্ফালন করিয়া নরসমাজে ভাসিয়া ওটেন, তখন দৃষ্টিগোচর; কোথায়ও চার পড়িলে ঝাঁকে ঝাঁকে, উপস্থিত হইয়া ঘাট তোলপাড় করেন; আমিষের দোষে নিয়তই অপবিত্র, অথচ নহিলেও চলে না। কদাচ কখনও জালে লোকের আনন্দ বর্দ্ধন করেন! দুই এক জন নিষ্কর্ম্মা লোক কখনও কখনও ছিপ বঁড়শিতে ধরিবার চেষ্টা করে; কিন্তু তাহাতে প্রায়ই ফল দর্শে না, লাভের মধ্যে চিন্‌চিনে রোদে মাথার চাঁদি ফাটিয়া যায়, ও কখনও কখনও কাদা মাখা সার হয়। মৎস্যের আদর তৈলে, পুলিশেরও তাই।

দ্বিতীয়, কূর্ম্ম;—আদালতের আমলা; পিঠ বিলক্ষণ মজ্‌বুৎ, কৈফিয়তের কামাই নাই, অথচ কৈফিয়ৎ দিতে অদ্বিতীয়, গালাগালি না দেয় এমন লোক দেখা যায় না অথচ ভ্রুক্ষেপ নাই। হাত পা মুখ আছে বলিয়া মনে হয় না, অথচ ঘুশঘাস পার্ব্বনির বেলায়

হাত পা ছেড়ে নখর পর্য্যন্ত দেখাইয়া থাকেন, আর কাহাকেও কামড়াইয়া ধরিতে পারিলে, মেঘ গর্জ্জন না হইলে তাহার আর পরিত্রাণ নাই। দেবতার ডাক মানুষের আয়ত্ত নয়, সেই জন্য প্রায়ই রক্ত মাংসের অংশ দিয়া ঘরে যাইতে হয়।

তৃতীয় বরাহ;—খোদ মেজিষ্টার; যে দিকে গতি, সেই দিকেই মহাভিতির সঞ্চার, দংষ্ট্রা ভয়ে লোক শশব্যস্ত; ভয়ানক গোঁ, কাহার সাধ্য ফিরায়, কোপ হইলে ফুলের বাগান চষিয়া তাহাতে সরিষা বুনিবার যোগাড় করিয়া দেন। দূর হইতে নমস্কার করিয়া ইহার পথ ছাড়িয়া দেওয়াই সুবোধের কর্ম্ম।

চতুর্থ, নৃসিংহ;—জেলার জজ; দেওয়ানী বিচারের কর্ত্তা, কাজেই নর,—শান্ত, বিবেচনাপরায়ণ, হিতাহিত জ্ঞানের দ্বারা চালিত; দাওরায় বসিলেই সিংহ, পশু হইলেও পশুর রাজা, তর্জ্জন গর্জ্জনে সমস্ত বনভূমি থর থর কম্পবান; অথচ ক্ষুদ্র শ্বাপদগণের রাজাও শাসনকর্ত্তা বলিয়া ভয়যুক্ত ভক্তির পাত্র।

২। ত্রেতাযুগের অবতার।

রাজদ্বারের পরেই বিষয়ী সংসারের কথা বলিতে হয়। যাহার উপলক্ষে রাজদ্বারে গতিবিধি করিতে হয়, এবং শরণ লইতে হয়, সুতরাং যাহাতে পাদ পরিমিত অন্যায়াচরণ হইয়া থাকে, একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে সেই বিষয়ী সংসারেই ত্রেতাযুগ।

ত্রেতাযুগে তিন অবতার,—বামন, পরশুরাম, রাম। বিষয়ী সংসারেও এই তিন অবতার।

প্রথম, বামন;—বঙ্গদেশে ইনি উকীল নামে পরিচিত; পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইলে মনুষ্যকে হাকিম বলা যায়; যিনি উকীল তিনি হাকিম নহেন, অথচ হাকিমের আবশ্যকীয় সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইহাঁর আছে, সেই জন্য ইনি বামন। ছলনা করাই উকীলের ব্যবসায়, সে জন্য ইনি বামন। আর, ভিক্ষার ছলে দেহি দেহি বলিয়া মক্কেলের কাছে উকীল যে ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেন তাহাতে কত বলি রাজাই যে পাতালস্থ হইয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। অতএব সর্ব্বপ্রকারেই ইনি বামনাবতার, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

দ্বিতীয়, পরশুরাম,—বঙ্গদেশে জমীদার, অতুল প্রতাপ, সর্ব্বদা কুঠার হস্তে মার মার, কাট কাট, শব্দ করিতেছেন, জননী জন্মভূমির প্রতি দয়া মায়ার লেশ মাত্র নাই, কুঠার প্রহারে তদায় মস্তকচ্ছেদন করিতেছেন, অথচ ধরাপতির একান্ত অনুগত এবং অকৃত্রিম ভক্ত; (উপাধির জন্য) ক্ষত্রিয় শোণিতে পিতৃতর্পণ করিতে অসঙ্কুচিত এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

তৃতীয়, রাম;—ব্রহ্মোত্তরভোগী; কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি আছে তাহাতে দুই একটা প্রজা স্থাপন করিয়া ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের ন্যায় তাহাদের নিকট কলাটা মূলাটা লইয়া, তাদের মানমর্য্যাদা রক্ষা এবং যত্ন সম্মান করিয়া

জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে; স্বত্বরক্ষার নিমিত্ত জ্ঞাতিশত্রু জমীদারের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রূপ যুদ্ধ সজ্জা করিয়া থাকে, দেবতা ব্রাহ্মণের— সরকার বাহাদুর ও বড় লোকের—প্রতি ভক্তি প্রদর্শনে অকাতর, আর, পেট ভরিয়া খাইতে পায় বলিয়া ভুজবলবিশিষ্ট।

৩। দ্বাপরযুগের অবতার।

যাহাতে স্বার্থের সহিত দেশের মঙ্গল সমভাবে জড়িত, যাহাতে অজ্ঞতা ও সহায়হীনতা চৈতন্য এবং ক্ষমতার সহিত সমপরিমাণে বিভাজিত, এ কলিকালে সেই অর্থীসমাজেই দ্বাপর যুগ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

দ্বাপরে দুই অবতার, শ্রীকৃষ্ণ এবং বুদ্ধ; অর্থী-সমাজেও দুই।

প্রথম, শ্রীকৃষ্ণ;—বাঙ্গালা সংবাদপত্র; চতুর, মন্ত্রণ-বিশারদ অথচ স্বয়ং রাজত্ব করেন না, স্বয়ং যুদ্ধ করেন না; যাহার পক্ষাশ্রয় করেন, ধর্ম্ম সেই পক্ষেই জাজ্বল্যমান, সকল ঘটেই বিরাজ করেন, সকলের কথাতেই থাকেন। ইহাঁর জয় হউক, ইহাঁর গৃহীত-মন্ত্রের জয় হউক।

দ্বিতীয়, বুদ্ধ;—বাঙ্গালার প্রজা; সমগ্র ভূমির উত্তরাধিকারী অতএব রাজপুত্র সদৃশ, তথাপি সন্ন্যাসী, ভিক্ষুক; নির্ব্বাণ-মুক্তির প্রচারক, অন্নাভাবে মরিয়া গেলেই শান্তি, এই মন্ত্রের শিক্ষক। এখন ইহারা জাগিতেছে, অল্পে অল্পে চৈতন্য লাভ করিতেছে, সুতরাং বুদ্ধ।

৪। কলিযুগের অবতার।

কলিতে পুণ্য যৎসামান্য, কারণ ধর্ম্ম লোপ পাইবে, ধার্ম্মিক কাগজের কোপ হইবে, সমস্তই একাকার হইয়া যাইবে, ব্রাহ্মণ শূদ্রের প্রভেদ থাকিবে না, কেহ কাহারও মুখাপেক্ষা করিবে না, অথচ এক রকমে চলিয়া যাইবে। সে একাকার করিবার কর্ত্তা, অবতারের মধ্যে শেষ এবং শ্রেষ্ঠ অবতার—কল্কী অর্থাৎ স্বয়ং পঞ্চানন্দ!

বিজ্ঞাপন।

১ নং।

মহৌষধ! অব্যর্থ মহৌষধ!!

পঞ্চানন্দের এণ্টি-বোকামি-মিকশ্চার।

অর্থাৎ

বোকামি-নাশক আরক।

এই ঔষধ সেবন করিলে, নিরেট বোকামি, পুরুষানুক্রমিক বোকামি, আকস্মিক বোকামি, দৈবাৎ বোকামি, দায়ে পড়িয়া বোকামি প্রভৃতি যত প্রকার বোকামি আছে বা হইতে পারে, তাহা নিশ্চয় সারিয়া যায়। না সারিলে, কবুল জবাবের পত্র পাইলে তৎক্ষণাৎ মূল্য ফেরত দেওয়া যায়।

সঙ্গতি বুঝিয়া বারো অথবা চব্বিশ মাত্রা সেবন

করিলেই সম্পূর্ণ আরোগ্য। নিয়ম না থাকাই এবং না রাখাই ইহার নিয়ম।

যাঁহারা হাত বাড়াইয়া স্বর্গ চাহেন, ভারত-মাতাকে গাউন্ বনেট্ পরাইয়া নাচাইতে চাহেন, বাঙ্গালার বদলে ইংরেজী চালাইতে চাহেন, গলার জোরে স্বাধীন হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই মহৌষধ ব্যবহার করিয়া দেখিবেন।

যাঁহারা বিজ্ঞাপন দেখিয়া ঔষধাদি কিনিয়া থাকেন, গেজেটের অনুরোধে দান ধ্যান করিয়া থাকেন, সভ্যতার খাতিরে মদ্যপান করিয়া থাকেন, নামকা-ওয়াস্তে ময়লা-ফেলা কমিশনার হইয়া থাকেন, পিতৃশ্রাদ্ধের ভয়ে ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া থাকেন, তাঁহাদের এই মহৌষধ ব্যবহার করা নিতান্ত আবশ্যক।

আর, যাঁহারা কাগজের গ্রাহক হইয়া দাম দেন না, না বুঝিতে পারিলেও সমালোচন করিতে কাতর হন না, লিণ্ডলী মরের সপিণ্ডীকরণ করিতেছেন, সেই জন্য মাতৃভাষার ধার ধারেন না, তাঁহাদের অন্য উপায় নাই, এই মহৌষধ লইতেই হইবে।

সদর মফস্বলে প্রভেদ নাই,
ডাক মাসুলের চাপ নাই,
ছোট বড় বোতল নাই,
সমস্তই একাকার, সমস্তই সমান।
মূল্য আড়াই টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন ।

১ নং

সাধুতা ! সরলতা !! সত্য কথা !!!

আজি কালি বিজ্ঞাপনের কিছু বাড়াবাড়ি দেখা যায় ; বিজ্ঞাপন দিতে হইলেই অর্থ ব্যয় হয় । অতএব বিজ্ঞাপন দিলেই কিছু যে লভ্য হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই ।

ফাঁকি দিতে ইচ্ছা নাই, সেই জন্য সাধুর ন্যায়, সরল ভাবে, এই সত্য কথার বিজ্ঞাপন দেওয়া যাই-তেছে, যে আমার বড়মানুস হইবার অতিশয় ইচ্ছা । যাহার যেমন সঙ্গতি নগদ, নোট, মনিঅর্ডর, ডাকের টিকিট, যাহাতে সুবিধা হয় আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেই আমি অব্যর্থ বড়মানুস হইতে পারিব । বড়-মানুষ না হইতে পারি সমুদয় ফিরিয়া দিব । টাকা পাইবার অগ্রে, এবং টাকা পাইবার পরে আমার কেমন চেহারা হয়, ডাক মাসুল পাঠাইয়া দিলে, তাহার ছবি দেওয়া যাইবে ।

রসীদের টিকিট লওয়া যাইবে না । ডাকের টিকিট অথবা নোট পাঠাইলে টাকায় এক আনা বাটা দিতে হইবে ।

পঞ্চানন্দতলা । } শ্রী অর্থাকাঙ্ক্ষী এণ্ড কোং ।

পরকালের উপদেশ।

(পাদ্রি পঞ্চানন্দ কর্তৃক প্রদত্ত।)

ভ্রান্ত নর! আর কত কাল এ মোহ-জালে আচ্ছন্ন হইয়া, ইহকালের ইন্দ্রজালে বঞ্চিত হইয়া রহিবে? একবার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করো, একবার ভাবিয়া দেখো এ প্রকাণ্ড প্রশস্ত সংসারে তোমার কেহই নাই, তোমার কিছুই নাই। "আমার, আমার" বলিয়া যাহা লইয়া তুমি অহরহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছ, বাস্তবিক তাহা তোমার নহে।

ঐ যে দিব্য বস্ত্রে তোমার কলেবর আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছ, তাহা তোমার নহে,—মাঞ্চেষ্টরের। উহাতে তোমার শীত নিবারণ হইতেছে বটে, কিন্তু লজ্জা নিবারণ হইতেছে না। এখনই যদি মাঞ্চেষ্টরের কোপ হয় কিম্বা বিরক্তি জন্মে, এখনই যদি মাঞ্চেষ্টর তোমাকে বলে—আর দিব না,—তাহা হইলে তোমার গতি কি হইবে? এমন ক্ষণিক প্রেমে আর মুগ্ধ হইয়া থাকিও না। অবিনশ্বর আচ্ছাদনের উপায় করো।

তুমি কাচের দোয়াতে বিলাতি কালি রাখিয়া লৌহের লেখনীতে বিদেশজাত কাগজে লিখিয়া কর-কণ্ডূয়ন নিবৃত্ত করিতেছ; তুমি বিজাতীয় মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি সম্পাদনের প্রলোভনে অচৈতন্য হইয়া রহিয়াছ, জাহাজে পেষ্টবোর্ড আম-

দানি করাইয়া তদ্দ্বারা তোমার গ্রন্থের আবরণ দৃঢ় করিবার ভাণ করিতেছ, কলের সূচে কলের সূতা পরাইয়া পত্রের পর পত্র যোজনা করিতেছ—সত্য ; কিন্তু ভ্রমান্ধ নর ! এ সমুদায়ই ফক্কিকার ! ইহার মধ্যে তোমার কিছুই নহে। মুহূর্ত্তের জন্য ভাবিয়া দেখো,— সকলই অন্ধকার দেখিবে ! ও কি করিতেছ ? দেশলাই জ্বালিলে কি হইবে ? ও আলোকে এ অন্ধকার দূরীভূত হইবার নহে। তাহার পর, তুমি যে দেশলাই জ্বালিতেছ, তাহাও যে তোমার নহে। অজ্ঞান ! এ কথা এখনও বুঝিতে পারিলে না !

পাপের কুহক অতি ভয়ঙ্কর কুহক ! এ ছলনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য যত্নশীল হও। যে জুতা প্রকৃত পক্ষে তোমার মস্তকের উপর রহিয়াছে, ইহকালের আশু সুখে আত্মবিস্মৃত হইয়া, সেই জুতাকে তোমার চরণাভরণ বা চরণ-রক্ষণের পদার্থ মনে করিতেছ। এ জুতা তোমার নহে। কারণ তাহা তোমার সঙ্গের সঙ্গী নহে।

প্রাঙ্গণে, গৃহমধ্যে, ঝাড় লাণ্ঠান জ্বালিয়া, বিচিত্র চিত্র-শোভিত গৃহ ভিত্তিতে দৃষ্টিপাত করিয়া, ফেটন-যানে বিচরণ করিয়া, তাড়িত তারে মুহুর্মুহু তোমার আত্মীয় স্বজনের কুশল বার্ত্তা আনাইয়া, তুমি স্বীয় ধন-গৌরবে মত্ত হইতেছ, তোমার ঐশ্বর্য্য মনে করিয়া সুখানুভব করিতেছ, পরকালের ভাবনায় জলাঞ্জলি দিতেছ। কিন্তু বৃথা এই ঐশ্বর্য্য ; মিথ্যা এ গৌরব !

মুগ্ধ! যে লৌহ-সিন্দুকে তোমার কোম্পানীর কাগজ, তোমার নোট, তোমার টাকা রহিয়াছে—তাহাও তোমার নহে। মায়া-পাশ ছিন্ন করো, একবার পরকালের দিকে দৃষ্টিপাত করো।

তোমার আয় ব্যয়ের গণনা করিয়া অহঙ্কৃত হইতেছ। নির্ব্বোধ! তোমার আবার আয় কোথায়? এ কেরাণিগিরিতে তোমার যেমন অধিকার নাই, এ জমিদারিও সেইরূপ তোমার নহে। শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিন যদি এইমাত্র উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তুমি নিঃসহায়, নিরুপায়, নিরঃবলম্ব, নিসম্বল। অহরহ, ক্ষণে ক্ষণে মনে রাখিবে---যিনি দিতে পারেন, যিনি দিয়াছেন, যিনি দিতেছেন,—তিনি ইচ্ছাময়, ইচ্ছা মাত্রেই কাড়িয়া লইতে পারেন, অথবা অশেষ প্রকারে তুমি তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে পারো।

নাস্তিক! তোমার এ বিষম ভ্রম পরিহার করো, আত্মরক্ষার উপকরণ সংগ্রহ করো, যমদণ্ড হইতে অব্যাহতি-লাভের বিধান করো। অদ্যকার ক্ষণিক সুখে আপ্লুত থাকিয়া, তুমি টপ্‌পানবিসী করিয়া, গায়ে ফুঁ দিয়া, নিধুর স্বরে গলাবাজি, বা ভাঁড়ের ভণ্ডামি করিতেছ বটে, কিন্তু তোমার ভ্রমে তুমিই ভুলিতেছ; তাঁহাকে ভুলাইতে পারিবে না। তিনি তোমার গর্জ্জনে ভীত নহেন, তোমার উপহাসে কাতর নহেন, তোমার ভ্রান্ত প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন না।

অবোধ! হেলায় সব হারাইতেছ। পরকাল

তোমারই হস্তে রহিয়াছে; যাহাতে রক্ষা পাইবে তজ্জন্য চেষ্টিত হও।

বিজাতীয় বর্ণমালায়

স্বজাতীয় ভাষা লিখিবার বক্তৃতা।

(Roman-অক্ষর সভার আগামি অধিবেশনে জনৈক মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক কর্ত্তৃক যাহা পঠিত হইবে।

ভদ্রাভদ্রগণ অর্থাৎ লেডী Z এবং জেণ্টলমEন্,

বেদ বিধির উল্লঙ্ঘন করিতে পারা যায়, লোকাচার এবং দেশাচারের শীর্ষদেশে উপানৎ প্রহার করিতে পারা যায়, আত্মাকে নরকস্থ করিতে পারা যায়, কিন্তু সাহেবের অনুরোধে অবহেলা করিতে পারা যায় না, সাহেব-ঘেঁসা বাঙ্গালীকে অসন্তুষ্ট করিতে পারা যায় না, তাহা আপনারা সকলেই স্বীকার করিবেন এবং জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তে আপনারা সকলেই তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন। আমি ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ; সৌভাগ্য বলে আমার পিতৃভোগ্য অপক্ক-কদলী-সিদ্ধ-সহায়-অন্ন-রাশিকে পরিবর্জ্জন করিয়া, এখন যে কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হইয়া কণ্টক কর্ত্তরীর সাহায্যে পাদুকা-সমেত, ভগবত্যংশ স্বচ্ছন্দে উদরাগত করিবার যোগ্য হইয়া আর্য্যশাস্ত্রীয় ক্রিয়া কলাপে সমধিক সম্মান লাভ করিতেছি, তাহা আমি জানি এবং সে সৌভাগ্যের বিধাতা কে তাহাও আমি জানি। এ সমস্ত বৃত্তান্ত আপনাদের অবিদিত নাই।

তবে জিজ্ঞাসা করি, সাহস সহকারে অকুতোভয়ে আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যে স্বজাতীয় ভাষায় বিজাতীয় বর্ণমালার প্রয়োগ হইলে যদি গৌরজনরঞ্জন হয়, তবে তদ্রূপ প্রয়োগ বিধানে আমরা কেন নিরস্ত থাকিব ? আমরা কি জন্য যত্নপর হইব না ? আমাদের উদ্যম সফল হইবে না, আমরা উপহাসাস্পদ বা নিন্দাভাজন হইব, সে আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই। সৎসঙ্গই কাশীবাস—ব্যাস কাশীতে মৃত্যু হইবে বলিয়া সৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া মহাপাতকে পতিত হইব কেন?

ভদ্রগণ, যেখানে উদ্দেশ্য সাধু, সেখানে তৎপোষক যুক্তির অভাব হয় না। স্বজাতীয় অক্ষর বর্জ্জনের সংকল্প যে অতি মহান্, তৎপক্ষে স শয়ের স্থল নাই। প্রত্যেক ভাষার জন্য পৃথক্ বর্ণমালা থাকিলে বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সঙ্কীর্ণতা হয়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানবাসিগণের আচার ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন রূপ হওয়া প্রযুক্তই যে হিংসা, দ্বেষ, কলহ, যুদ্ধ বিগ্রহাদির প্রশ্রয় হইয়াছে, তাহা কে না বলিবেন? তুমি যবন, তোমাকে কন্যাদান করিব না, তোমার সহিত ভোজ্যান্নতা করিব না—এ কথা বলিলে যে দোষ,—তোমার ভাষা স্বতন্ত্র, অতএব তোমার ভাষাকে আমার অক্ষর দিব না, অথবা আমার ভাষায় তোমার অক্ষর লইব না—ইহা বলিলে যে তদপেক্ষা গুরুতর দোষ হইতেছে, তাহা কি চক্ষে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন আছে ?

"জাতিবাৎসল্য" শব্দ অভিধান হইতে, ভাষা হইতে উচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়াই উচিত। তুমি যদি জাতিবৎসল হও, তাহা হইলে তুমি মনুষ্যের শত্রু, পরম শত্রু। কারণ, তোমার হৃদয়ে পার্থক্যরূপ মোহাগ্নি প্রজ্বলিত রহিয়াছে, আর পার্থক্যই সমস্ত অনিষ্টের মূল। ভ্রান্তি পরিহার করো, প্রশস্ততা অভ্যাস করো, বদান্যতা শিক্ষা করো,—তবে তুমি নিজের উপকার করিতে পারিবে, সংসারের মঙ্গল করিতে পারিবে। যদি সাধুতা থাকে, তাহা হইলে জাতীয় পার্থক্যের বিনাশ করো, ভাষার পার্থক্যের লোপ করো, এবং যত দিন তাহা না হইতেছে, তত দিন অক্ষরের স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত করিয়াও নিজ মহত্ত্ব প্রতিপন্ন করো। অক্ষরই লিখিত ভাষার প্রাণ, সাহিত্যের অস্থি মাংস——সেই মূলে কুঠারাঘাত করো।

বিদেশী এই আর্য্য জাতির ভাষা শিখিতে পারে না, সুতরাং যথোচিত সৌহার্দ্দ্য বিদেশীর সহিত জন্মিতে পারে না। কিন্তু শিখিতে যে পারে না, তাহার কারণ কি? শুদ্ধ, বর্ণমালারূপ অন্তরায়ের দোষে। স্যর্ উইলিয়ম্ জোন্স, কোল্‌ব্রুক, মোক্ষমূলর, কাউয়েল্ প্রভৃতি ব্যক্তির নাম যাহারা করে তাহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ। পৃথিবীতে মনুষ্য-সংখ্যা নিয়তই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা বলিয়া কি হরিতালের আবশ্যকতা স্বীকার করিতে হইবে না, অথবা ব্যবহার প্রচলিত করিতে হইবে না? এক ব্যক্তিরও

যাহাতে অসুবিধা বা ব্যাঘাত হইতে পারে, তাহার অপনয়ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য ; বিকলবুদ্ধি ব্যক্তির নিমিত্তেও যত্ন করা একান্ত উচিত। বর্ণমালা লোপ করিয়া দাও, দেখিতে পাইবে পৃথিবীতে একটীও স্বতন্ত্র ভাষা থাকিবে না। তখন বিকৃতির বিলোপ হইয়া আবার প্রকৃতির জয় হইবে।

সাধারণতঃ বর্ণমালার দোষ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট। একবার দেবনাগর বর্ণমালার পৃথক বিচার করা যাউক।

ভদ্রগণ! দেবনাগর অক্ষরের সবিশেষ দোষকীর্ত্তন করিতে হইলে শীতকালের রজনীও প্রভাত হয়। সে পণ্ডশ্রমে আমি লিপ্ত হইতে ইচ্ছা করি না, কারণ, লিপ্ত হইবার প্রয়োজন নাই। দুই চারিটা মুখ্য দোষের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

আদৌ, দেবনাগরের নামেই দোষ। যে সভ্য সমাজে নর-নাগরের লাঞ্ছনা, সে সমাজে ভাষায় নাগর থাকিবে, ইহা অতি অসঙ্গত। তাহার উপর, দেবনাগর কোনও জীবন্ত ভাষাতেই প্রযুজ্য নহে। তবে, বলুন দেখি, দেবনাগর কোন্ লজ্জায় রাখা যাইবে?

আপনারা অবগত আছেন যে অন্ধকে অন্ধ বলিলে, মূর্খকে মূর্খ বলিলে সে দুঃখিত হয়, রাগ করে। সংস্কৃতজ্ঞ অনেক লোক বায়ুগ্রস্ত, তাহাও আপনারা জানেন। যে বর্ণমালার বর্ণসংখ্যা নিয়তই বায়ুসংখ্যা মনে করাইয়া দেয়, তাহার সংরক্ষণ করিতে গিয়া কোন্ মতিমান

সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি আত্মক্ষতি সাধন করিতে পারেন? আমার অনুরোধ,—আসুন, আমরা ঊনপঞ্চাশৎ সভ্যবর্গ সম্মিলিত হইয়া দুরন্ত বর্ণমালার বিনাশ করিয়া সফল-মনোরথ এবং নির্ব্বিঘ্ন হই!

দেবনাগর বর্ণমালাই ভঙ্গভাবাপন্ন হইয়া বঙ্গীয় বর্ণমালায় পরিণত হইয়াছে, সুতরাং তাহার দোষো-দেঘাষণ, বৃথা কালক্ষেপণ মাত্র। এই উভয় বর্ণমালাই দুর্ব্বল; নিজ ভাষার কার্য্য ব্যতীত অন্য ভাষার লিপি-কার্য্যে সক্ষম হইবার শক্তি ইহাদের নাই। দুর্ব্বলের মরণই মঙ্গল, অতএব এ বর্ণমালার যত শীঘ্র বিলোপ হয়, ততই উত্তম।

এখন দেখা যাউক, উপযোগিতা পক্ষে ইংরেজী বর্ণমালা কত অংশে শ্রেষ্ঠতর। বৈয়াকরণেরা বারম্বার প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে ইংরেজ জাতীয় মনুষ্যের ন্যায়, ইংরেজী বর্ণমালাও স্বাধীন। কি মনুষ্যের, কি বর্ণের, কোনও কার্য্যই ইহাদের অকরণীয় নহে, অথচ কোনও কার্য্য ইহাদের নির্দ্দিষ্টও নহে। আমাদের যেমন ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণই হইবে, জুতা বেচিতে পাইবে না, সেইরূপ 'ক' 'ক'ই থাকিবে, 'চ'র কাজ করিতে পাইবে না। কিন্তু ইংরেজের শক্তি দেখুন, প্রধান মন্ত্রী মন্ত্রণা দিতে যেমন উপযুক্ত, হল চালনাতেও সেই রূপ, বরং ততোধিক উপযুক্ত। ইংরেজী স্বরবর্ণের মধ্যে যাহাকেই লউন, কেহই নিয়মিত কার্য্যের দাস নহে;—এখন যিনি "এ," অন্য সময়ে তিনি "আ,"

কখনও বা "অ," তখনই আবার "অ্যা,"—বাস্তবিক ইহার অসাধ্য কিছুই নাই। "S" ঘরে নাই, "C" তাহার কাজ করিয়া দিবে; "K" অনুপস্থিত, সেখানেও "C" কাজ করিতেছে। কি মাহাত্ম্য! কি উদারতা! কি অমিত পরাক্রম! এমন মানুষ নহিলে কি মানুষ! এমন অক্ষর নহিলে কি অক্ষর!

আবার দেখুন। ঐ এ, বী, সী, ডি, বর্ণমালা কেবল যে ইংরেজের বা ইংরেজী ভাষার ক্রীত দাস, তাহা নহে। নানা ভাষায়, নানা দেশে ইহাদের প্রসার; আর যেখানে যেমন ইচ্ছা, শক্তি প্রদর্শন করিতেছে। অধিকন্তু অক্ষর গুলির গাম্ভীর্য্য এবং মর্য্যাদা বোধও প্রচুর;—শব্দের মধ্যে, মূলে, বা অন্তে অক্ষর বিরাজ করিতেছে, অথচ নীরব, নিঃস্পন্দ। এ শক্তি, এ আত্ম-সংযমনের ক্ষমতা অন্য কোনও বর্ণমালারই নাই। ঐ একই অক্ষর দিয়া ফরাশি লিখিতেছে, ইংরেজের তাহা অনুচ্চার্য্য, ইংরেজ লিখিতেছে, ব্রহ্মাণ্ডের তাহা অনুচ্চার্য্য। বস্তুতঃ, যতই প্রবেশ করিয়া দেখা যায়, ইংরেজী বর্ণমালার গুণে ততই মোহিত এবং বিস্মিত হইতে হয়।

সকল পদার্থই পঞ্চভূতাত্মক। স্বরবর্ণই লিপি-কার্য্যের আত্মাস্বরূপ। ইংরেজীতে পঞ্চভূতস্বরূপ পঞ্চ স্বরবর্ণ! অহো! কি আনন্দের বিষয়!

পঞ্চভূতে সংসার চালাইতেছে, আমরাও চালাইব। পঞ্চ স্বরবর্ণেই ভাষা চালাইব, তাহাতে কিছুমাত্র দ্বিধা নাই।

পর্য্যায় অনুসারে ধরিলে, প্রথমতঃ ভাষা, তাহার পর ব্যাকরণের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এখন ভাষা জানিতে হইলে অগ্রে ব্যাকরণের দাসত্ব স্বীকার করিতে হয়। স্বজাতীয় সাহিত্যের জন্য বিজাতীয় বর্ণমালার আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তাহাতে আর দোষ রহিল কোথায়? আর, যদি শাস্ত্র মানিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে পঞ্চ-স্বরাত্মক বর্ণমালাকেই যে গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য।

পঞ্চ ভূতেই সকল পদার্থ নির্ম্মিত, অথচ এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থের পার্থক্য নির্ণয়ে কোনই অসুবিধা বা ক্লেশ নাই; যে পাঁচ ভূতে উমেশ, সেই পাঁচ ভূতেই রামদাস,—তথাচ রামদাস শুইয়া আছে তাহাতে উমেশের বসিয়া থাকার ব্যাঘাত নাই এবং উমেশকে চিনিয়া লইতেও কষ্ট নাই। যত গুলি পৃথক্ পৃথক্ স্বরধ্বনির প্রয়োজন, এই পঞ্চ স্বরেই আঁকড়ি, বিন্দু, ফুট্‌কি ইত্যাদি দিয়া লইলে ততগুলি পৃথক্ স্বরই পাওয়া যাইবে, অথচ মূলে যে পঞ্চস্বর সেই পঞ্চ স্বরই রহিয়া যাইবে। এ প্রকার বিচিত্র কৌশল আর কোথায় আছে? তবে কেন দেশীয় বর্ণমালা পরি-ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইব? বর্ণের দেশীয় নাম অক্ষুণ্ণ রাখিতে ইচ্ছা থাকে, রাখিয়া দাও, কিন্তু দেশীয় মূর্ত্তি কখনই রাখা যাইতে পারে না। কোট্ পেণ্টুলুন্‌ধারী তেঁতুলে বাগ্‌দীর সম্ভ্রম রেলওয়ে ষ্টেশনে যে দেখি-য়াছে, ইংরেজী বর্ণমালায় সজ্জিত দাসুরায়ের পাঁচালীর

গৌরব সেই বুঝিতে পারিবে। এতদ্ভিন্ন, যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ তাঁহারা অবগত আছেন, যে, "কলি-শেষে এক বর্ণ হইবে যবন।" তবে কি আর বর্ণভেদ রাখা শোভা পায়? আইস ভদ্রগণ শাস্ত্র বাক্যের সার্থকতা সম্পাদনে বদ্ধপরিকর হইয়া কল্কী অবতারের সহায়তা করি। কৃতকার্য্য হইলে আমরাও ক্ষুদ্র অবতার হইতে কেন না পারিব?

উপসংহারে আর একমাত্রে কথা বলিব;—মুখে সকল বাঙ্গালীই পঞ্চশরের প্রবল প্রতাপ স্বীকার করেন, ব্যবহারেও তাহার অনুগমন করেন; কিন্তু লিখিবার বেলায় এত স্বর বাহুল্য কেন? পূর্ব্বাপর অসংলগ্নতা জন্য বঙ্গবাসীর কি লজ্জিত হওয়া উচিত নহে? গর্দ্দভের একমাত্র স্বর—অথচ সেই এক স্বরেই গর্দ্দভ ইহ জগতে অদ্বিতীয়। আইস, বন্ধুগণ, যত্ন করি, এখন পঞ্চস্বর অবলম্বন করি, ক্রমে আমরাও একস্বরে অদ্বিতীয় হইতে পারিব।

যাহা হউক, বলিয়া কহিয়া দিলেও, শিক্ষাবলে অভ্যাস করিয়াও যাহারা "Ami chalilam" দেখিলে "আমি চলিলাম" পাঠ করিতে পারিবে না, তাহারা শিবের অসাধ্য; তাহাদের জন্য আমাদের প্রতিপত্তি, আমাদের বুদ্ধিমত্তা, আমাদের দূরদর্শিতা নিবৃত্ত হইয়া থাকিতে পারে না। ভারতবর্ষের যদি কখনও প্রকৃত উন্নতি হয়, যদি কখনও বরফ্ শাম্পেনে শালগ্রামের "শীতল সেবা" হয়, তবে জানিবেন, সে আমাদের কর্ত্তৃকই হইবে।

খেপা খগেশের

টিপনী।

আমি ক্ষেপা, না তোমরা ক্ষেপা? তোমাদের যদি ফুরসৎ থাকে, তবেই আমাকে দেখিয়া এক আধবার তোমরা হাসিয়া থাকো। অথচ মাথা মুণ্ড কি যে করিতেছ, কেন যে তোমরা সদা শশব্যস্ত, তার ঠিকানা নাই। আমি সারা দিন রাত হাসি, তোমাদিগকে দেখিলেও হাসি, না দেখিলেও আপন মনে, মনে মনে হাসি। ক্ষেপা তোমরা, না ক্ষেপা আমি?

—উকীল দেখিলেই "হরি হরি বল,—হরিবোল" বলিয়া চীৎকার করিতে আমার ইচ্ছা হয়। উকীল হইলেই মানুষের আশা ভরসার, শিক্ষা পরীক্ষার, কার্য্য বীর্য্যের অবসান হয়। একটি একটি উকীল হয়, আর বঙ্গদেশ এবং বঙ্গভাষা গলা ধরাধরি করিয়া এক এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিয়া থাকে। মরণ নানা প্রকার, তাহার মধ্যে উকীল হওয়া এক প্রকার। পয়সা খরচ করিলে উকীলে কথা কয়, না করিলে কয় না। পয়সা খরচ করিলে কলেও শব্দ বাহির হয়, আর্গিনেও সঙ্গীত হয়।

—বিবাহ আর শ্রাদ্ধ একই রকম জিনিশ। লুচি মোণ্ডা, ধুম ধাম, আসা যাওয়া দুইয়েই আছে। আর, শ্রাদ্ধের সময়ে টের পায় না—যার শ্রাদ্ধ, সেই; বিবা-

হের সময়ে টের পায় না—বর। যে শ্মশানে মড়া যায়, সেখানে প্রেতের অভাব নাই, যে বাসরঘরে বর যায়, সেখানেও প্রেতিনী অর্থাৎ পেত্নীর অভাব নাই। আমি এখন চিন্তা করিতেছি, বিবাহ করি কি মরি। এখন ঝোঁক বিবাহের দিকেই। তাতে বেঁচে মরা হবে।

—লোকে পড়ে না, কেন না পড়িবার উপযুক্ত বই নাই; লোকে লেখে না, কেন না পড়িবার প্রবৃত্তি কাহারও দেখা যায় না। পৃথিবীতে যত বন্দোবস্ত আছে, তার মধ্যে এইটি আমার মনের মতন।

—চাকরির বড় ভক্ত বলিয়া বাঙ্গালীকে অনেকে অভিসম্পাত করে, ঠাট্টা করে, গালাগালি দেয়; অথচ এটা বোঝে না যে স্বাধীন কাজে অক্ষম বলিয়াই বাঙ্গালী চাকরির জন্য এত লালায়িত। স্বাধীন কাজে যে অক্ষম, তাহার কারণ এই যে সকলেই চাকরির চেষ্টায় ব্যস্ত, সুতরাং কাজ শেখে কে, শেখেই বা কখন্?

—দেবতার কাজ অনুগ্রহ কি নিগ্রহ, তাহা বলিবার যো নাই। বৃষ্টির জলে কাহারও ফুটো ঘর ভাঙ্গিয়া পড়ে, কাহারও দেয়ালের জন্য কাদা করিবার মজুর-খরচ বাঁচিয়া যায়। হিন্দুরা বলে, রাজাও দেবতা।

—ব্যারাম হইলে লোকে যে চিকিৎসা করায়, তাহার কারণ এই যে মৃত্যু আশঙ্কার স্থলে ঋণ পরি-

শোধ এবং দান ধ্যান করিয়া পরকালের পথটা পরিষ্কার রাখাই সুবোধের কর্ম্ম।

—সে দিন যোগাচার্য্য উপদেশ দিতেছিলেন যে সঙ্গে বিষয় আইসে নাই, সঙ্গে বিষয় যাইবেও না; অতএব বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করাই উচিত। যোগাচার্য্য এক ক্ষেপা, নহিলে এমন কথা বলিতেন না। বিষয় যদি সঙ্গে যাইত, অর্থাৎ আমি মরিলে যদি বিষয়ও মরিত, তবে বিষয়ের জন্য ইচ্ছা করিতাম না। কিন্তু বিষয় যে রাখিয়া যাইব! যাহা যাইবে তাহাই মাটী, যাহা রাখিতে পারিব, তাহাই ত আমার।

—সকলেই বলে সময় যাইতেছে, অতএব নিদ্রিতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাকা অবৈধ। পাগল আর কি? সময় কি একা যায়? সকলকে সঙ্গে করিয়াই সময় যায়। তুমি যখন নিদ্রিত, তখনও তুমি সময়ের সঙ্গে যাইতেছ। বিশ্বাস না হয়, বরাবর ঘুমাইয়া থাকিয়া দেখ, তুমিও সময় মত মরিবে। যে বলে সময় কাহারও হাত ধরা নয়, সে মিথ্যা বলে। সময়ের সঙ্গে এত হাত ধরাধরি যে ছাড়াইবার যো নাই।

—মানুষ স্বভাবতঃ বস্ত্রচ্ছদ-বিহীন। ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই মনুষ্যের আদি বাস; ক্রমে সভ্যভব্য হইয়া শীতপ্রধান দেশে গমন করিয়াছে। অতএব যাহারা ভারতবর্ষে জন্মে, তাহারা জানোয়ারবিশেষ।

—বৃহৎকাষ্ঠে দোষ নাই, তবে জাহাজে চড়িয়া

বিদেশ গেলে জাতি যায় কেন? জাতি নাকি খুব পুরাতন প্রাচীন সামগ্রী, তাই বোধ হয় সমুদ্রের জলে লোণা ধরিয়া নষ্ট হইয়া যায়।

—সকলেই যদি চিন্তাশীল হয়, আর সকলেই নিজ নিজ চিন্তা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে ঘোরতর অনিষ্ট হয়, সাহিত্য বিজ্ঞান লোপ পায়, পড়া শুনা কেহ করে না, অবশেষে সমস্ত লোকই মূর্খ হয়। নবদ্বীপে মূর্খ, গয়াতে ভূত—থাকাটা দরকার।

—আমি প্রবৃত্তির দাস, নাকি প্রবৃত্তি আমার দাস, তাহা আজিও স্থির করিতে পারিলাম না। ছানাবড়া দেখিলে, খাইতে ইচ্ছা করে, এস্থলে প্রবৃত্তি আমাকে চালিত করিতেছে; আবার সর্ব্বপ্রথম ছানাবড়া যখন খাইতে হইয়াছিল, তখন প্রবৃত্তিও করিয়া লইতে হইয়াছিল, সেখানে প্রবৃত্তিই আমার দাস। কথাটা খুব শক্ত, কিন্তু তত দরকারি নয়। অথচ এমনি ভাবনা ভাবিয়া পৃথিবীর অর্দ্ধেক লোক আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া থাকে।

খেপা খগেশের

টিপনী।

২।

সব যাইবে, নাম থাকিবে। উত্তম কথা; কিন্তু পৃথিবীই যদি যায় তাহা হইলে পৃথিবীর কি নাম থাকিবে?

—বিচ্ছেদই স্বাভাবিক; আত্মীয়তা, সদ্ভাব, প্রণয় বা মিলন কেবল ভণ্ডামি অথবা কাজ হাসিল করিবার ফিকির মাত্র। পৃথিবীতে আসিবা মাত্রেই পরমাত্মীয় জননীর সঙ্গে বিচ্ছেদ, মরিবার সময়ে পৃথিবীর সঙ্গে বিচ্ছেদ; আর এই দুইটিই স্বভাবসিদ্ধ কাজ। তবে, নাট্যশালার অভিনয় করিবার জন্য যত যাহাই দেখাও। আসলে সব ফাঁকি।

—বিদ্যা শিক্ষা এবং চৌর্য্যক্রিয়াতে কোনও প্রভেদ দেখিতে পাই না। পরের ধনে স্বার্থসাধন উভয় কর্ম্মেরই অভিপ্রেত। তথাপি যে, লোকে চোরের উপর এত রাগ করে, সেই জন্যই বিদ্বান অপেক্ষা অর্থশালীর সম্মান এত অধিক হইয়া পড়িয়াছে।

—উপার্জ্জনের প্রধান উপায় অনিচ্ছা প্রদর্শন; খাইতে বসিয়া আর লইব না বলিলেই, পরিবেষ্টা পীড়াপীড়ি আরম্ভ করে। আহারে মানুষের প্রয়োজন নাই বলিয়া আমেরিকায় এক ব্যক্তি দিনকতক উপবাস

করিয়াছিল ; তাই দেখিয়া লোকে তাহাকে এত অর্থ দিয়াছে, যে এখন তিন পুরুষেও আর তাহার অন্নচিন্তা হইবে না।

কৃষিজীবীদের ভূমির উপর বড়ই মায়া ; যে কৃষিজীবী সে চাষা ; চাষা বলিলে গালাগালি হয়, অসভ্য বুঝায়। পাছে কেহ অসভ্য বলে, এই ভয়ে অনেক লোক জন্মভূমির প্রতি মমতা প্রদর্শন করে না।

—যিনি বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দেন, সকলে তাঁহাকে মহাত্মা বলিয়া সম্মান ও ভক্তি করে। তবে যে এত রিফু করিয়া, ছেঁড়া যুড়িয়াও দর্জীর গৌরব নাই, তাহার হেতু এই যে দর্জী ধনবন্ত নহে, পেটের দায়েই অস্থির। বাস্তবিক যত প্রকার পাপ এবং যত প্রকার অপরাধ আছে, সমুদায়ের চেয়ে পেটের দায় গুরুতর।

—অবিশ্বাস যদি সংসারে এত অধিক প্রবল না হইত, তাহা হইলে লেখাপড়ারও এমন আদর হইত না।

—দোকানদার লোক অতিশয় মূর্খ। সে দিন একটু কাপড়ের দরকার হওয়াতে, আমি এক দোকানে গিয়া কাপড় চাহিলাম ; দোকানদার আমার নিকট টাকা চাহিল। টাকা আমার নহে, কাহারই নহে, টাকা রাজার, সুতরাং আমি হাতে করিয়া দিলেও আমার টাকা দেওয়া হইবে না, এই কথা দোকানদারকে বুঝাইয়া দিয়া আমি টাকা দিতে অসম্মত হইলাম, কিন্তু তথাপি তাহার ভ্রম গেল না। এমন মূর্খের সহিত ব্যবহার না করাই শ্রেয়ঃ ভাবিয়া আমিও আর

কাপড় লইলাম না, রাগ করিয়া চলিয়া আসিলাম। কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন রিপুদমনেই মনুষ্যত্ব; রাগ একটা রিপু। আবার দোকানদারের কাছে যাইব কি না, ভাবিতেছি।

—অগ্নিকে সর্ব্বভুক বলে, সেটা ভুল। জলে তেলে একত্রে দিলে অগ্নি তেলটুকু চুষিয়া লয়, জল পড়িয়া থাকে। অগ্নি সর্ব্বভুক নয়, সারগ্রাহী বটে।

—আপনার সুখ্যাতি আপনি না করিলেই অখ্যাতি হয়। তুমি একটি টাকা আমাকে দিলে, তাহার বদলে আমি তোমাকে সতরো আনা পয়সা দিলাম। যদি চারি পয়সা অতিরিক্ত দানের কথা নিজ মুখে আমি বলিয়া দিই, তবে আমি সদাশয় লোক; যদি সে কথাটা না বলিয়া দিই, তাহা হইলে সকলেই বলিবে আমি বিষয়বুদ্ধিহীন বোকা।

—মনের মত না হইলে সত্য কথাও সত্য বলিয়া বোধ হয় না। দুষ্টেরই শাসন করা বিধি, নির্ব্বোধের শাস্তি হইতে পারে না; কিন্তু চোর যদি বলে যে আমি বোকা নহিলে চুরি করিব কেন, আর চুরি যদি করি, তবে ধরা পড়িব কেন? তাহা হইলে, কথাটা যদিও সত্য কিন্তু বিচারকের মনোমত হয় না, সেই জন্য তিনি সে কথায় বিশ্বাস না করিয়া, চোরকে দুষ্ট বলিয়াই সিদ্ধান্ত করেন। ফলে এই হয় যে, যে আসল বোকা সেই দুষ্ট আর যে আসল দুষ্ট সে বোকা প্রতিপন্ন হয়।

—যাহার যাহা নাই, সে তাহাই ভিক্ষা করে। কিন্তু কাণাতে চক্ষু ভিক্ষা করে না। সুতরাং জানা গেল, যে, যাহা কিনিতে মেলে না, তাহা ভিক্ষা করিলে পাওয়া যায় না, সেই জন্য, কেহ তাহাও ভিক্ষা করে না। অতএব ভিক্ষা করাই ভুল, প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনিয়া আনাই কর্ত্তব্য।

বিদ্যাকে অমূল্য ধন বলে কেন? ঘরের পয়সা খরচ আর শরীর মাটি না করিলে বিদ্যালাভ হয় না। যদি বলো মূল্য দিলেও অনেকে পায় না, তা এমন অনেক জিনিশই ত পাওয়া যায় না? বাজারে আলুর আমদানি নাই তাহা বলিয়া কি বলিতে হইবে যে আলু অমূল্য ধন?

সুশিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের সুখের তারতম্য!

(চতুর্থ ভাগ চারুপাঠ হইতে উদ্ধৃত)

পরমকারুণিক পরমেশ্বর মানবজাতিকে যে বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন, অহং সুশিক্ষিত বঙ্গীয় যুবক তাহার এক মাত্র অধিকারী। তুমি অশিক্ষিত বর্ব্বর তোমার এ সমস্ত গুণ না থাকা প্রযুক্ত তুমি নিয়ত দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণাজালে জড়িত হইয়া যৎকথঞ্চিৎরূপে জীবন যাপন করিতেছ মাত্র। তোমার

ঐশ্বর্য্য নাই, তোমার আধিপত্য নাই, তোমার গাড়ী ঘোড়া নাই, তোমার ঝাড় লাণ্ঠান নাই, তোমার এ সমস্ত কিছুই নাই, আমার আছে! তোমার সেই জন্য দুর্ভাগ্য, আমার সৌভাগ্য।

দেখ আমি স্কুল কলেজে নাম লেখাইয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়া এখন হাকিম হইয়াছি, আমার সহাধ্যায়ী বন্ধু বাবু উকীল হইয়াছেন। আমি মাসান্তে মোটা মাহিয়ানা পাইতেছি, আমার বন্ধু অজস্র অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন। আমাদের সুখের সীমা কি? আমাদের এখন ভাবনা নাই, চিন্তা নাই, কষ্ট নাই; পৃথিবী ভাসিয়া গেলেও আমাদের ভাবনা নাই। তুমি মনে করিতেছ যে হাকিমকে ভূতের খাটুনি খাটিতে হয়, সকল সাহেবের মন যোগাইয়া চলিতে হয়; তুমি মনে করিতেছ যে উকীল পয়সার গোলাম, লাঙ্গুলে তৈল মর্দ্দন না করিলে ইহার দিন পাত হয় না, অতএব ইহাদের জীবন বড়ই দুঃখময়। কিন্তু তুমি বোকা তাই এরূপ মনে করিতেছ। যদি সত্য সত্যই ইহা দুঃখের কারণ হইত, তাহা হইলে চাকরির জন্য দেশ শুদ্ধ লোক লালায়িত হইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিত না। ওকালতির আশায় মাথা কুটিয়া মরিত না। বাস্তবিক তুমি যাহাকে, নির্বুদ্ধিতা হেতু, কষ্ট মনে করিয়া থাকো, তাহা সৌভাগ্য, ভোগের উপাদেয় চাট্নি মাত্র, তাহাতে সৌভাগ্যের সুস্বাদ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

একটু পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবে যে সুশিক্ষিত হইবার নিমিত্তেও বিশেষ কোনও ক্লেশ পাইতে হয় না। আমরা পরীক্ষা দিয়া উপাধি হাসিল করিয়াছি সত্য, কিন্তু যে ইংরেজী ভাষায় পরীক্ষা দিয়াছি প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহার পিণ্ডান্ত করিতেছি; যে গণিত, ইতিহাস, বিজ্ঞানে পরীক্ষককে তুষ্ট করিতে হইয়াছিল, তাহা সঙ্গে সঙ্গে বুড়ীগঙ্গার জলে বিসর্জ্জন দিয়া এখন আমরা নিশ্চিন্ত হইয়াছি, অথচ পক্ষান্তরে মাতৃভাষার পদসেবা আমাদিগকে করিতে হয় নাই, মাতৃভাষাও সাহস করিয়া কখনও আমাদের নিকট-বর্ত্তিনী হইতে পারে নাই। সুশিক্ষিতের প্রধান সুখ স্বাধীনতা, আমরা অহরহ সে সুখ ভোগ করিতেছি।

আমরা যখন শয্যা ত্যাগ করিয়া বহির্ব্বাটীতে আগমন করি, তখন খানসামা তেল মাখাইয়া দেয় খানসামা স্নান করাইয়া দেয়, খানসামা কোঁচান কাপড় পরাইয়া দেয়; আমরা জড়ভরতের মত কেবল সুখেরই অনুভব করিতে থাকি; হস্তপদাদির পরিচালন মাত্র করিয়াও সহজে সুখের জীবন বিড়ম্বিত করি না! অপরাহ্নে আমরা যষ্টি হস্তে ভ্রমণ করি, সে বায়ু সেবনের জন্য; সন্ধ্যার পর পাঁচজনে একত্র হই, সে মদমত্ত হইয়া খোশগল্প বা খেমটানাচের জন্য। আহার বিহারের জন্য আমাদের ভাবিতে হয় না, আমরাও ভাবি না। পড়া শুনা আমাদের আর করিতে হয় না, আমরাও করি না। দেশের দুঃখ আমাদিগকে দেখিতে হয় না

আমরাও দেখি না। দেশের কথায় আমাদিগকে থাকিতে হয় না, আমরাও থাকি না। এখন আমরা কেবল খাই দাই, নিদ্রা যাই, প্রবৃত্তি হইলে প্রকৃতির কল্পনায় কাল কাটাই। বাস্তবিক আমাদের কোনও বালাই নাই।

কিন্তু অশিক্ষিতের দুরবস্থা দেখ! অশিক্ষিত ব্যক্তি নিয়তই পরের অধীন। যে অশিক্ষিত ব্যক্তি নিরেট মূর্খ, সে পেটের দায়ে অস্থির। শুনিতে পাওয়া যায় যে, এই সকল দুর্ভাগ্য মনুষ্য মাটি কাটিয়া, বা অন্য প্রকারে খাটিয়া খাটিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলাইয়া থাকে। অহো! কি বিভীষিকা! এ সকল লোকের মরিয়া যাওয়াই উচিত। ইহারা নাকি একেবারে কাণ্ডজ্ঞানহীন, সেই জন্যই বোধ হয় এ জীবনভার বহন করিয়া থাকে!

আর এক প্রকার অশিক্ষিত ব্যক্তি আছে, যাহারা বিদ্যালয়ের অভ্যন্তর দেশ দেখিয়া থাকিলেও, কিছু মাত্র শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহাদিগকে অর্দ্ধ শিক্ষিত বলা যায়। ইহারা ইংরেজী পড়িয়াছে, সে নাম মাত্র, কারণ ইংরেজীতে ভুল করিয়া পত্রাদি লিখিতে পারে না, অথবা শুদ্ধরূপে লেখেও না। এরূপ শিক্ষা কেবল শর্করবাহি বলিবর্দ্দের ভার বহনরূপ বিড়ম্বনা মাত্র। অধিকন্তু ইহারা দেশীয় ভাষার চর্চ্চা করিয়া প্রকৃত শিক্ষা লাভের ফল হইতে বঞ্চিত থাকে, এবং তদ্ধেতু স্বার্থের অনিষ্ট সম্পাদন করিতেও কুণ্ঠিত

বা লজ্জিত হয় না। ইহাদের শুভ পরিণামের আশা সুদূরপরাহত।

সাধারণত, উভয় দলের অশিক্ষিত ব্যক্তিরই এই এক ভয়ানক দোষ আছে যে, ইহারা স্বাধীনতার মূল্য বোঝে না, পরের অপেক্ষা না করিয়া কোন কাজ করিতে পারে না। ইহাদের মনোমধ্যে একটা চিন্তার উদ্রেক হইলে পাঁচ জনে মিলিয়া তাহার সম্বন্ধে বিতণ্ডা উপস্থিত করে, নহিলে কোনও প্রকার মীমাংসা করিতে পারে না। কিন্তু আমাদের ভাব নানা প্রকার। আমরা সময় বুঝিয়া সাহেব সুবার সেবা করি বটে, কিন্তু আত্মার যাহাতে তৃপ্তি নাই, এমন কার্য্যের জন্য কনিষ্ঠাঙ্গুলী পর্য্যন্ত সঞ্চালিত করি না। আমরা শরীরের সেবা করি, মনের সন্তোষ বিধান করি, বাক্যের সার্থকতা করি, অর্থাৎ যাহাতে বাক্যে অর্থাগম হয়, তাহার চেষ্টা করি! আমরা সুশিক্ষিত সুতরাং বুঝিতে পারি যে—

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্।"

—আমরা চুলে পমেড্, গায়ে জামা, পায়ে বুট, হাতে ছড়ি, বুকে ঘড়ি সযত্নে সঞ্চয় করিয়া সম্মানের সংযোগ করিয়া লই। কিন্তু অশিক্ষিতগণ পরের জন্যই সদা ব্যস্ত। তাহাদের পরকাল অনিশ্চিত, ইহকাল খাঁটি মাটী, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিদ্বজ্জন সমাগম।

সুখই স্বর্গ, আর যেখানে সুখ সেই স্বর্গ। যেখানে বিদ্বৎ-মণ্ডলী, যেখানে একপ্রাণ বহুজনের সমাগম, সেখানে যাহার সুখ না হয়, সে পামর, সে হতভাগ্য ; —তাহার অদৃষ্টে কুত্রাপি সুখ নাই, তাহার স্বর্গ লাভ কখনই ঘটিবে না, তা বাঁচিয়া থাকিতেই কি, আর মরিয়া গেলেই কি ?

যিনি কমলার কৃপাসত্ত্বেও ভারতীর চিহ্নিত সেবক, যিনি দুর্লভ মানব জন্মে দ্বিজেন্দ্র বলিয়া বরেণ্য, তাঁহার আতিথ্যে স্বর্গ সুখ লাভ করা যায়, ইহা বিচিত্র নহে। তাহার উপর, যেখানে বাল্মীকির কাব্যপ্রভা, যেখানে মূর্ত্তিমতী প্রতিভা, যেখানে সঙ্গীতের নিসর্গ শোভা— সে যদি স্বর্গ না হয় তবে স্বর্গের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ করিতে হয়।

পঞ্চানন্দ স্বর্গবাসী হইলেও এখন নরলোকে বিরাজ করিতেছেন ; সুতরাং মানবস্বর্গেও তিনি ইন্দ্রত্ব করিতে গিয়াছিলেন। বিদ্বজ্জন সমাগমে তিনি মর্ত্ত্যের পরম সুখ লাভ করিয়াছেন। ধরাধামে কি কি উপাদানে স্বর্গ সংগঠিত হয় তাহার পরিচয় পঞ্চানন্দ পাইয়াছেন ; অজ্ঞান তিমিরান্ধের জ্ঞানাঞ্জন শলাকা স্বরূপ এই লৌহলেখনী দ্বারা তদ্বৃত্তান্ত বিবরিত হওয়া আবশ্যক।

যেখানে সমাগম, সেই খানেই সভা; যেখানে সভা, সেই খানে সভাপতি। কালের জ্যেষ্ঠ পুত্র, বঙ্গের গণপতি এই জনসমাজে সমাগত হইয়াছিলেন, ইহা বলাই বাহুল্য। মণিমুক্তা বিভূষণে স্বয়ং সঙ্গীত স্বীয় রাজশ্রী প্রদর্শনে, সমাগত বিদ্বজ্জনের মনোমোহন করিয়াছিলেন, ইহাও বলা নিষ্প্রয়োজন। বিদ্বানের বল বিজ্ঞান; সুতরাং রসায়ন রূপ ধারণ করিয়া বিজ্ঞানের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। দেবভাষা, নাগরবেশে আশু উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া লম্বশাটপটাবরণে সভার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। শীতল ভাবে মেধা স্বীয় পুরুষকার দেখাইতেছিলেন; কল্পনা সঙ্গে কাহিনী সেখানে মৃদু মন্দ হাসিতেছিলেন। পাছে এত শোভা সমষ্টি সন্দর্শন করিয়া মানব নয়ন ঝলসিয়া যায়, সেই জন্য নেত্র রোগ-ধন্বন্তরীও নিজ বিপুল কলেবর সঞ্চালনে ত্রুটি করেন নাই।

এতদ্ভিন্ন বিভাকরাদি নানা গ্রহ, জাতীয়ত্ব প্রভৃতি বিবিধ উপগ্রহ, কুলাচার্য্য ডার্বিনের পরম পূজ্য স্বকৃত ভঙ্গ কুলতিলক সম্প্রদায় তথায় উপদ্রব করিতে উপেক্ষা করেন নাই। আর যেখানে এত উপসর্গ, সেখানে সাধারণীর অক্ষয়চ্ছায়া স্থূল স্বর্গের অপ্সরাস্থানীয় হইয়া সকলকে বিমুগ্ধ করিতেছিলেন, ইহাতে কাহার না আনন্দ হইবার কথা? এমত অবস্থায় সুকণ্ঠ সঙ্গীত এবং আকণ্ঠ সন্দেশে পঞ্চানন্দ যে নিরানন্দের বিনাশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য, আইস ভাই,

প্রবন্ধ শেষে জয়ধ্বনি করিয়া ছাপাখানায় কাপি পাঠাইয়া দেওয়া যাউক।

গোরাচাঁদ।

(ঐতিহাসিক নবাখ্যান)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একটা গুরুতর সামাজিক সমস্যার মীমাংসা।

নব বিধানের রহস্য ভেদ শুনিয়া সমগ্র বঙ্গদেশ আন্দোলিত; রাজকুমার আলবার্টের মধ্যম পৌত্রের প্রপিতামহী জুলুভূমি হইতে অনুচ্চার্য্যনামা বন্যজন্তু আনাইয়া জীবতত্ত্ব বিষয়ক বিজ্ঞানের পরিধি বাড়াইতেছেন দেখিয়া, বিরাট-লাট-রাজপ্রতিনিধি পুণ্যভূমি আর্য্য-ভূমিতে একটী কাবূলী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া সুচারুরূপে তাহার সেবা পরিচর্য্যার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন; এবং এবম্বিধ বহুবিধ ঐতিহাসিক ব্যাপার পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নৈসর্গিক নিয়মাবলীর অবিকলতা প্রতিপন্ন করিতেছে; এমন সময়ে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শত একাশীতিতম অব্দের প্রথম এপরিল দিবসে বেলা ছয়টার পর গোরাচাঁদের বাড়ীতে ভরপুর মজলিশ জমিয়া গেল।

কোমলপ্রাণ পাঠক! বীরপ্রসবিনী পাঠিকে!

প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম প্রকরণটা একটু কঠিন হই-য়াছে বলিয়া কিছু মনে করিবেন না। যখন বিদ্যার বেগ সম্বরণ করা যায় না, তখনই লেখকেরা গ্রন্থারম্ভ করে, সুতরাং ভাষার জোয়ারের মুখে জঞ্জাল দেখা যাইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? আমি পাঠক মহা-শয়ের স্বজাতি-বাৎসল্যের—পাঠিকা ঠাকুরাণীর গুরু-জন-ভক্তির—দিব্য করিয়া বলিতেছি, ইহার পর যাহা লিখিব অতি প্রাঞ্জল নির্ম্মল ভাষাতেই লিখিব। দন্ত-হীন ব্যক্তির স্বাদ বোধ অল্প; সেই জন্য গোড়াতে এক মুঠা এক মুঠা চাল ভাজা ছোলা ভাজা দিয়া আপ-নাদের অভ্যর্থনা করিলাম। আমি দরিদ্র,—আতা, রাতাবি কোথায় পাইব? যদি অঙ্কুরেই অপ্রীতি না জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে আসিতে আজ্ঞা হউক, আমার এ ভুনির দোকানে যাহা কিছু আছে সকলই দেখাইব।

বাগবাজারের ঘোষ পাড়ার একটা গলিতে প্রবেশ করিয়া সূর্য্যদেব অদ্যকার মত রাত্রিবাসের জায়গা খুঁজিতেছিলেন; একটা প্রকাণ্ড নারিকেল গাছের পশ্চিম দিকের পাতাগুলা তাই দেখিয়া হাসিতেছিল; পূর্ব্বদিকের পাতা গুলার স্বভাব কিছু নম্র, আস্তে আস্তে অল্প অল্প মাথা নাড়িয়া ম্লান মুখে তাহাদিগকে হাসিতে বারণ করিতেছিল। ইত্যাদি। এ সমস্ত কবি কল্পনা; লেখকের বর্ণন শক্তির পরিচয় মাত্র। প্রকৃত কথা পশ্চাৎ বলা যাইতেছে।

যেখানে সেই নারিকেল গাছ, তাহার উত্তর দিকে ইটের প্রাচীর, তাহার উত্তরেই গলি ; তাহার পরেই দরজা দিয়া উত্তরমুখে প্রবেশ করিলেই গোরাচাঁদের বাড়ী। বাড়ীর বর্ণন করিয়া আর কষ্ট দিব না, ফলে বাড়ী খানা তুমহল। নির্ভয় চিত্তে, আমার সঙ্গে অন্দর মহলে প্রবেশ করিলেই দেখিতে পাইবেন, পূর্ব্বদ্বারী একতলা ঘরের দরদালানে পাড়ার মহিলাদের মজলিশ বসিয়া গিয়াছে। উপরে এই মজলিশের কথা বলিতে গিয়াই বর্ণন কণ্ডূয়নে বিরত হইয়া উঠিয়াছিলাম।

রামী, বামী, শামী, অলকা, তিলকা, মেনকা, বিমলমণি, কমলমণি, সূর্য্যমণি, হেবোর মা, পুঁটীর মা, খোকার মা প্রভৃতি ছোট বড় মাঝারি বয়সের বিস্তর মহিলা সেই মজলিশে উপস্থিত। কেহ গা আদুড় করিয়া, কেহ পা ছড়াইয়া, কেহ আধ ঘোমটা টানিয়া, —নানা ভাবে নানা মহিলা বসিয়া আছেন। আর, কেহ বা দুয়ারের শিকলি ধরিয়া, কেহ বা এক পায়ে ভর দেয়ালে ঠেসান দিয়া, কেহ বা আঁচলের খুঁটে বাঁধা চাবির রিঙ আঙ্গুলে ঘুরাইয়া অন্যমনস্কা হইয়া,—কত জন কত ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছেন ; কেহ বাসরের গান ভাবিতেছেন ; কেহ নূতন অপেরার নূতন টপ্‌পাটা বার বার মনে মনে আওড়াইতেছেন ; কেহ অপরের নূতন ধরণের বেশ বিন্যাস প্রণালীটা মৌন-সমালোচন করিতেছেন ; কেহ বা গোরাচাঁদের বনিতাকে সাহস দিতেছেন, কেহ বা কল্পিত বহুদর্শিতার

সুপারিশে তাঁহার আশঙ্কা বাড়াইতেছেন। ফল কথা, নানা রকমে নানা জনে কথা কহিতেছেন; হাসির উপদ্রবে, নিষেধের তাড়নায়, পরামর্শের গম্ভীরতায়, রোদনের শান্ত অভিনয়ে, নিতান্ত অগ্রাহ্য নয়, এমন তর একটা গোলযোগ সেখানে হইতেছে। মজলিশের উপস্থিত বিষয়—গোরাচাঁদের বনিতা আসন্নপ্রসবা।

যশোর জেলার পূর্ব্ব প্রান্তে অপ্রসিদ্ধনাম এক পল্লীগ্রামে গোরাচাঁদের বনিতার বাপের বাড়ী; নাম, বসুমতী। নামটা ঊনবিংশ শতাব্দীর উপযুক্ত নয় মনে করিয়া গোরাচাঁদ স্বীয় উত্তমার্দ্ধকে বিকল্পে বসন, বস্‌নী বা বসী বলিয়া সম্বোধন করিতেন, প্রাণান্তেও বসুমতী বলিতেন না। আমি কিন্তু এ নিয়মের অধীনতা স্বীকার করিব না, যেখানে যেমন সুবিধা, সেখানে সেই নাম করিয়া গোরাচাঁদ গৃহিণীর পরিচয় দিব।

বসুমতীর বয়স উনিশ বৎসর মাত্র, বর্ণ গৌর, এমন কি চুলগুলি পর্য্যন্ত খব কাল নয়; গড়ন দীর্ঘাকার, একহারা, তবে সংপ্রতি তেহারা বলিয়াই মনে হয়; কপাল ছোট; চক্ষু দুটি ডাগর, কিন্তু কোলে বসা; নাক সুদীর্ঘ, টিকলো, সরু; গাল দুখানি মরা মরা, উপর ঠোঁট খুব পাৎলা, নীচের খানি পুরু, থুতনী খুব অল্প। বসুমতীর সুর চড়া, কিন্তু মিহি, অল্পেই নাকিতে ওঠে। এ হেন বসুমতী আসন্নপ্রসবা সেই মজলিসে বসিয়া আছেন, কদাচ দুই একটী কথা কহিতেছেন, কিন্তু এত গোলে তাঁহার কথা ধরা যাই-

তেছে না। যাঁহারা দেখিতে, দেখা করিতে বা দেখা দিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা নিজে নিজে কথা কহিয়াই পরিতুষ্ট ; সুতরাং বসুমতীর কথা বুঝিলেও তাঁহাদের কোনও ক্ষতি হইতেছে না।

গোরাচাঁদ বাড়ীতে ছিলেন না। " স্ত্রী উত্তোলনী" সভার অদ্য বিশেষ অধিবেশন ; সুতরাং সভাপতি গোরাচাঁদ বেলা একটার সময়ে সেইখানেই গিয়াছিলেন। স্ত্রীর অবস্থা মনে ছিল না, বাড়ীতে এ মজলিস বসিবে তাহারও সংবাদ পান নাই, কাজে কাজেই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘরে ফিরিয়া আসিলেন না। পাড়ার মেয়েরা গোরাচাঁদকে বড় ভয় করিত, আজি বাহিরে গোরাচাঁদের বিলম্ব হইবে টের পাইয়া মেয়েরা তাঁহার বাটীতে আসিয়া জুটিয়াছিল। এমত অবস্থায়, সন্ধ্যার পর গোরাচাঁদ যখন বাড়ী আসিলেন, তখন মজলিশের কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

গোরাচাঁদের পরিচয় দিবার এই সুযোগ হইয়াছে, অতএব পাঠক পাঠিকাগণের সহিত তাঁহার আলাপ করাইয়া দেওয়া যাউক।

বর্ণচোরা আমের দোষ বা গুণ এই যে, ভিতরে পাকিয়া পচিবার উপক্রম হইলেও, খোসা যে সবুজ সেই সবুজই রহিয়া যায়। বয়সের হিসাবে গোরাচাঁদও বর্ণচোরা আম ; পঁচিশের উপর পঞ্চান্ন পর্য্যন্ত সকল বয়সই গোরাচাঁদের হইতে পারিত ; কেবল এক বুড়ি মা বাড়ীতে থাকাতেই গোরাচাঁদের বয়স

চল্লিসের নীচে রাখিতে পাড়া প্রতিবাসী বাধ্য হইয়াছিল। নবদূর্ব্বাদলশ্যাম,—(ইহার ভাবার্থ যাহাই হউক)—বিলক্ষণ খর্ব্বাকৃতি, প্রশস্ত চতুষ্কোন ললাট, স্থূল নাস, প্রবল হনুমন্ত, বর্তুলাক্ষ, গুম্ফবিভীষিত নিষ্পিষ্ট ওষ্ঠাধর, বিরল অথচ দীর্ঘ শ্মশ্রু শোভিত চিবুক, মস্তকে ধূসর কাশ্মারার ক্যাপ্, গলায় দুহাত লম্বা কম্ফর্টর, আধ-চীনে-আধ-বিলাতী কালো আলপাকার কোর্ট এবং সাদা জিন্ কাপড়ের পেণ্টুলনপরা, হাতে পিচের মোটা ছড়ি, পায়ে গরাণহাটার ডবলস্প্রিং জুতা—পুষ্ট না হইলেও হৃষ্ট গোরাচাঁদ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার হৃদয়াকাশের চাঁদ (বসন) কাতর মুখে, কাতর ভাবে বসিয়া একাগ্রচিত্তে স্বায় দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠ দেখিতেছেন। ভীত, চিন্তিত, বা বিস্মিত না হইয়া গৃহিণীকে কিছু না বলিয়া এবং কোনও জিজ্ঞাসাও না করিয়া গোরাচাঁদ নিকটবর্ত্তী হইয়া বসুমতীর হাত ধরিলেন এবং শুদ্ধ হস্ত বলের অনুরোধে তাঁহাকে শয়ন গৃহে লইয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। বসুমতী মুখ তুলিয়া চাহিল কিন্তু কথা কহিল না।

গোরাচাঁদের মা রান্না ঘরে ছিলেন, জুতার শব্দে পুত্রের আগমন বার্ত্তা জানিতে পারিয়া ত্রস্ত ব্যস্ত ভাবে উপস্থিত হইয়া পুত্র পুত্রবধূকে তদবস্থ দেখিতে পাইলেন।

জননীকে দেখিয়া গোরাচাঁদ বিরক্ত হইলেন।

বসুমতীর হাত ছাড়িয়া দিয়া, স্বীয় বাম কটিতটে বাম হস্তের মণিবন্ধ স্থাপন করিয়া, দক্ষিণ হস্ত ঈষৎ তুলিয়া, সোজা অথচ একটু ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া গোরাচাঁদ বলিলেন—"যাও! তোমার রান্না ঘরে যাও!—কর্ত্তব্য পালন আগে; বিশ্রাম কি আমোদ, তার পর! রুটী হয়েছে?—হয় নাই; ডা'ল হয়েছে?—হয় নাই; চচ্চড়ি হয়েছে?—হয় নাই; মাছ ভাজা হয়েছে? হয় নাই!—আমি জানি, নিশ্চয় জানি, এ সব কিছুই হয় নাই। তবু তুমি কাজ ফেলে, আমার কাছে আমোদ কর্‌তে এলে! ছি! ছি!" মাকে সম্বোধন করিয়া এই পর্য্যন্ত; আপনাব আপনি খুব স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া বলিলেন——"মা মনে করে, যে মা হ'লেই বুঝি সাত খুন মাফ! এই এলুম একটা কাজ করে'; কোথায় দুটো মিষ্টি মুখের কথা শুনে মন তুষ্ট কর্‌ব, পরিশ্রমের অবসাদ বিনাশ কর্‌ব, না বুড়ী এসে সুমুখে দাঁড়ালেন! এদের কি বিবেচনার লেশ মাত্র নাই?"

মা থতমত, ভীত, সঙ্কুচিত! বলিলেন—"না বাবা; এই বৌমার অসুখ করেছে, তাই বল্‌তে এলুম, বলি যদি কারুকে ডাক্‌তে টাক্‌তে হয়, তা হ'লে—"

"তা হ'লে তোমার সাত গুষ্টির পিণ্ডি, আর আমার বাবার মাথা। তা হ'লে আবার কি?—যাও, যাও, বিরক্ত করো না।"

আহা পরের জন্যে বাছার আমার আহার নিদ্রে নাই। খেটে খুটে এয়েছে—" বিড় বিড় করিয়া এই

রূপ বলিতে বলিতে গোরাচাঁদের মা, কর্ত্তব্য পালনের স্থান রন্ধনশালায় পলায়ন করিলেন।

তখন গোরাচাঁদ আবার পূর্ব্বভাব অবলম্বন করিয়া, প্রেয়সীর হাতে ধরিয়া, একটু উৎকণ্ঠা, একটু আগ্রহের স্বরে বলিলেন—"অসুখ হয়েছে? কি অসুখ, বসন? তোমার অসুখ করেছে? তোমার?"

বসন উত্তর দিতে বিলম্ব করিল। গোরাচাঁদ বসনের হাতে ধরিয়া বসনকে টানিয়া ঘরেব ভিতর লইয়া গেলেন; খাটের উপর বসনকে সবলে উপবেশন করাইলেন।

বসুমতীর ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল; নয়ন নদের পঙ্কিল জলে কপোল-ভূমি ভাসিয়া গেল!—"তোমার বসীর কি হয়েছে, তা', কি তুমি জানো না?" স্বল্প-ভাষিণী বসুমতী প্রত্যেক শব্দের পর এক এক দীর্ঘশ্বাস, অথবা কণ্ঠরোধ সূচক অব্যক্ত ধ্বনি সহকারে কয়েকটী শব্দ প্রয়োগ করিয়া ক্ষান্ত হইল। গোরাচাঁদ মাথার টুপি খুলিতেছিলেন; খোলা হইল না, টুপির সঙ্গে হাতের যোড় লাগিয়া গেল।

"আমি ত জানি না যে তোমার কোন অসুখ করেছে। তোমার অসুখ জান্‌লে কি আমি এমনি স্থির হ'য়ে থাকবার লোক? তোমার জন্যে আমি নদীর জল, গাছের পাতা, আকাশের নক্ষত্র তন্ন তন্ন করে' তোলপাড় কর্‌তে পারি, স্বর্গ মর্ত্ত আন্দোলিত কর্‌তে পারি——আর, আমার সেই বসনের, আমার

হৃদয়ের সেই বসীর, আমার সেই তোমার অসুখ জেনেও আমি হিমাচলের মত শীতল, অচলভাবে বসে' থাক্‌ব, এও তোমার বিশ্বাস হয়?""

বসুমতী দেখিলেন বেগতিক; এখন যে এই প্রণয়-সরোবরের লহরীলীলা দেখিয়া তিনি সুখানুভব করিবেন, এমন অবস্থা তাঁহার নয়। কাজে কাজেই আর বাক্যাড়ম্বরের দিকে না গিয়া সাদা কথায় বলিয়া উঠিলেন—"আজ বুঝি আমার ছেলে হ'বে। একটু একটু ব্যথা উঠেছে।"

গোরাচাঁদ। "এই বুঝি অসুখ?"

বসুমতী। "দত্তদের বাড়ীর মেয়েদের কথা শুনে অবধি আমার আরও ভয় হচ্চে। ওমা! তা হ'লে আমি কি কর্‌ব?"

বসুমতী আবার কাঁদিয়া ফেলিল। দত্তদের বাড়ীর মেয়েরা ভয় দেখাইয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে সর্ব্বাগ্রে পুলিসে খবর দেওয়া উচিত কি না; বসুমতীর ব্যথা উঠিয়াছে, ডাক্তারকে প্রথমেই ডাকিয়া আনা উচিত কি না; যে জন্য, যে স্ত্রী পুরুষের সাম্য সংস্থাপন জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই ব্রত সার্থক করিবার এই সুযোগে কাজ হাসিল করিবার চেষ্টা করা উচিত কি না—এই মানসিক বিতণ্ডায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গোরাচাঁদ একটু মৌনী হইয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে, শেষ চিন্তাই শ্রেষ্ঠ চিন্তা, এই সার করিয়া প্রফুল্ল ভাবে, হাসি হাসি মুখে বলিলেন—

"বেস্ হয়েছে! তোমার এই যে অসুখের কথা বল'ছ, এ চমৎকার হয়েছে। তোমার কষ্ট পাবার দরকার নাই, আমি স্বয়ং সন্তান প্রসব কর্‌ব; তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে' খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমোও গে। আমি রইলুম, ছেলে প্রসবের ভারও আমার রইল।"

বসুমতী অবাক্!

"সে কি? তুমি প্রসব কর্‌বে কি?"—তা যদি হ'ত, তবে আর ভাবনা কি বলো?" অনেক কষ্টের উপরেও একটু হাসিয়া, বসুমতী এই কথা কয়টী বলিল।

"তা যদি হ'ত?—কেন? যদি কেন? তা' হ'তেই হ'বে। তুমি যেটা অসম্ভব মনে কর্‌ছ, সেটা আমার মতে একটুকুও অসম্ভব নয়।—হা আমি স্বীকার করি, যে, এপর্য্যন্ত পুরুষে কুত্রাপি প্রসব করে নাই। কিন্তু এর কারণ কি? কারণ, শুদ্ধ পুরুষের অত্যাচার, স্ত্রীজাতীর বিড়ম্বনা, আর তোমাদের অর্থাৎ স্ত্রীলোকের কু অভ্যাস। আগে রেলের গাড়ী ছিল না, তাই বলে' কি রেলের গাড়ী হ'ল না? আগে কেবল পুরুষেই বই পড়ত, স্ত্রীলোকে রাঁধাবাড়া কর্‌ত—এখন কি তা উল্‌টে যায় নি? কু-অভ্যাস, সমস্তই কু-অভ্যাস, আর কু সংস্কার, আর অত্যাচার। আমাকে যদি মা বাপ ছাড়্‌তে হয়, বাগবাজার ছাড়্‌তে হয়—সেও স্বীকার, তবু এবার তোমাকে আমি প্রসব হ'তে দিচ্ছি না। আমি ফরাসডাঙ্গায় গিয়ে বাড়ী কর্‌ব, সেখানে নিজে প্রসব করব—তবু তোমাকে আর কষ্ট সহ্য

করিতে, একমাত্র স্ত্রীজাতিতে বিড়ম্বিত হ'তে দিব না।”

বক্তৃতা করিতে করিতে, গোরাচাঁদ প্রাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুত্রের ভাব দর্শনে গোরাচাঁদের মা কাতর ভাবে কাঁদিয়া উঠিলেন, তাঁহার হাতের এক গোছা রুটী উননে পড়িয়া পুড়িতে লাগিল, পাড়ার লোক একে একে উপস্থিত হইতে লাগিল। মহা এক হুলস্থুল ব্যাপার, কিন্তু গোরাচাঁদের বিরাম নাই, নিবৃত্তি নাই। বাস্তবিক সদ্‌বক্তার, সুকবির, প্রতিভাশালী ব্যক্তি মাত্রেইরই গুণই এই; ইহাঁরা তন্ময় হইয়া বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়েন। নহিলে প্রতিভা কি? অসাধরণতা কোথায়?

অনেকক্ষণ পরে গোরাচাঁদের চটকা ভাঙ্গিল; তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, অনেক লোক উপস্থিত হইয়াছে; বুঝিতে পারিলেন যে আপনি বক্তৃতা করিতেছেন; আর কথাটা না কি নিজ গৌরবের কথা,—তাই মনে মনে একটু ইতস্তত করিয়া গোরাচাঁদ বুঝিতে পারিলেন, যে শুদ্ধ বক্তৃতার ইন্দ্র-জালে জড়িত এবং বিমোহিত হইয়াই এত লোক সমবেত হইয়াছে। গোরাচাঁদ সিদ্ধবক্তা;—জনতাই তাঁহার ঘর বাড়ী, জনতাই তাঁহার অস্থি মাংস; মৎস্যের যেমন জল, নক্ষত্রের যেমন আকাশ, অগ্নির যেমন ইন্ধন, জনতাও গোরাচাঁদের তদ্রূপ; সুতরাং গোরাচাঁদ বিস্মিত হইলেন না, সস্মিত বদনে হতবুদ্ধি

জননীকে বলিলেন—"মা, এক গেলাস জল নে এস দেখি,"—বলিয়া সেই স্ত্রীবহুল লোক-সমুদ্রে নয়ন সঞ্চালন পূর্ব্বক দেখিলেন, সংবাদপত্রের লেখক তাহাতে ভাসিতেছে কি না। দেখিলেন, কিন্তু বৃথা! যে হেতু, সংবাদপত্রের স্বসম্পর্কীয় নরনারী কেহ তথায় ছিল না। সংসারের দোষই এই; শিয়রে সময় মত ইতিবেত্তা থাকে না বলিয়া আমাদের কত কত সোণার স্বপ্ন স্বপ্নেই বিলীন হইয়া যায়!

জননী জল আনিবার অভিপ্রায়ে ঘরের ভিতর গিয়া দেখিলেন যে, বৌমা বিছানায় পড়িয়া ছটপট করিতেছেন এবং কাতর ভাবে—"মাগো মরুচি গো, আর বাঁচলাম না গো" ইত্যাদি শব্দ করিতেছেন। সুতরাং জলের কথা ভুলিয়া বৌমার শুশ্রূষা করিতে বসিয়া গেলেন। অভ্যাস দোষেই হউক, কুল-ধর্ম্মের গুণেই হউক, বসুমতী যে তখন বিলক্ষণ কষ্টভোগ করিতেছিল, তাহার আর কথাটী নাই; এবং গোরা-চাঁদের মা যে সে কষ্ট বুঝিতেছিলেন, তাহারও সংশয় নাই। সুতরাং প্রিয় পুত্রের পিপাসার কথা ভুলিয়া যাওয়াতে তিনি যে একটা খুব গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলেন, এ কথা বলিতে আমরা প্রস্তুত নহি।

জল আসিল না দেখিয়া গোরাচাঁদ অতিশয় ত্যক্ত হইলেন। বক্তৃতা ব্যাপারের দুইটা প্রধান অঙ্গ—সংবাদপত্রের লিপিকর এবং জলের গেলাস—অনু-

পস্থিত দেখিয়া উপস্থিত মহিলা মণ্ডলীর উপর গোরা-চাঁদ কটূক্তি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

"তুই মাগীরেই তো যত দোষের গুরু! আপনি ভালো হবি না, পরকেও হ'তে দিবি না।—তোরা আপনার নাক কাটিস, কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করিস্। সৎকার্য্যে যোগ দান,—আপনাদের উপকারের কথাতে উৎসাহ—দূরে থাক্, বাপ পিতামহের ব্যাভারের উল্লেখ করে' আবার আমাদেরই টিটকারি করাটুকু আছে। এখানে তামাসা দেখতে এয়েছেন,—আমার—চোদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ দেখতে এয়েছেন। বেরো আমার বাড়ী থেকে! বেরো, বল্লুম বেরো! এক্ষণি বেরো! নইলে এক এক কিলে তোদের নাক ভেঙে গেঁতো করে' দেবো, জানিস নে?"

স্ত্রীলোকেরা গোরাচাঁদকে ভয় করিত, তাহা উপরে বলা হইয়াছে। কেন তাহারা ভয় করিত, তাহাও এখন জানা গেল। তিরস্কারের তাড়নায় রমণীগণ দিগ্‌দিগন্তরে পলায়ন করিল।

সেই রাগের ভরেই গোরাচাদ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, জননীর উপস্থিতির প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"বসন! এই তোমাকে শেষবার জিজ্ঞাসা কর'ছি তুমি আমাকে প্রসব কর'তে দিবে কি না?"

"বসন" নিরুত্তর! পূর্ব্ববৎ এ পাশ, ও পাশ, হা হুতাশ করিতে লাগিলেন।

"বাবা গোরাচাঁদ—" বলিয়া জননী মুখ ব্যাদান করিতে না করিতে, একবার তীব্র দৃষ্টির পর এক লম্ফ প্রদানে গোবাচাঁদ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন; এবং সেই রাত্রি নয়টার সময়ে স্ত্রীর দুরভিসন্ধির প্রতি-বিধান কল্পে কিংকর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য সভাগৃহ উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। মনে মনে সংকল্প করিয়া চলিলেন যে, স্ত্রী পুরুষের সাম্য বিধান জন্য আবশ্যক মত বল প্রয়োগ করাও বিহিত, সভায় এইরূপ অব-ধারণ করিয়া, সভার কার্য্য বিবরণে ইহা লিপিবদ্ধ করাইয়া লইবেন। নচেৎ এ সমস্যা পূরণের উপায়ান্তর নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[পাঠক পাঠিকার মরণ বাঁচন গ্রন্থকর্ত্তারই হাতে।]

তখন দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি উত্তীর্ণ হইয়াছে। এমন যে কলিকাতা সহর, তাহাও এক প্রকার নিস্তব্ধ হইয়াছে; এত যে জনস্রোত, তাহাও যেন শুখাইয়া, শীর্ণ হইয়া, সঙ্কুচিত হইয়া বালুকারাশি মধ্যে অন্তর্ধান হইয়াছে। (পাঠক মহাশয় সমীপেষু,—জনস্রোতের অনুরোধ আমি অবশ্য মানি; কিন্তু এস্থলে বালুকা-রাশি যে কোন্ পদার্থের উপমান তাহা আমি অবগত নহি)। কেবল কদাচ কোথায়ও একখানা ভাড়াটে গাড়ী ভয় দেখাইবার জন্য বিকট শব্দ সহকারে দ্রুত-

প্রায় অশ্ব-যুগলের অনুধাবন করিতেছে; অশ্বদ্বয়ও প্রাণের দায়ে একমনে একভাবে চলিয়াছে। অনেকে ভূত মানে না, কিন্তু ভুতকে বড় ভয় করে; রাত্রিকালে সন্দিগ্ধ স্থল দিয়া যাইতে হইলে ভয়ে দৌড়িতে পারে না, থামিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতেও সাহস করে না। ভাড়াটে গাড়ীর ঘোড়ার অবস্থাও সেইরূপ। কোনও কোনও স্থানে বেড়ার গায়ে, দেয়ালের গায়ে, রেলিঙের গায়ে ঠেস দিয়া চক্ষু মুদিয়া আন্ধারিয়া লাণ্ঠান হাতে এক এক জন পাহারাওয়ালা দুইটী পরমতত্ত্বের ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছে; এক, সার্জন সাহেব এ পথে না আইসে; অপর, একটা চোর কিম্বা মাতাল গায়ে পড়িয়া ধরা দেয়। যাহারা পাখা টানে আর যাহারা পাহারা দেয়, তাহারা ইহকাল পরকাল এক সঙ্গে রক্ষা করে,—ধ্যান ছাড়ে না, অথচ কাজ ভোলে না। ইহা ছাড়া, পথের ধারে কিন্তু দোতলার উপরে কোথায়ও বাঁয়া তবলা, মানুষের গলা প্রভৃতি হইতে ওয়াক্ ওয়াক্ মিশ্রিত অনির্ব্বচনীয় শব্দে নেশায় তরর্ ক'লকাতার বিরক্তি সম্পাদন করিতেছে। ঘুমাইয়াও কলিকাতা ঘুমাইতে পাইতেছে না।

ফলে আমি প্রকৃতি বর্ণন করিতে বসি নাই, পটও আঁকিব না। গোরাচাঁদ না কি সভাস্থল হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছেন, তাই ঐতিহাসিক নবাখ্যানের সার্থকতা রক্ষা করিবার জন্যই এত বাক্য ব্যয় করিতেছি। আপনারা সেটা ভুলিবেন না।

তত রাত্রিতে সভায় গিয়া গোরাচাঁদ দেখিলেন, সভাগৃহের দ্বার রুদ্ধ, সুতরাং প্রবেশ করিবার উপায় নাই। যে সে লোক হইলে হতাশ্বাস হইয়া এই খানেই রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিত। কিন্তু গোরা-চাঁদের অধ্যবসায় অপ্রতিহন্য, সঙ্কল্প অটল, সাহস দুর্জয়। অসাধ্য সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু গোরাচাঁদের অভীষ্ট বিচলিত হইতে পারে না। অনেক উত্তম উত্তম উপমা দিয়া এ বাক্য সমুজ্জ্বল করিতে পারিতাম, কিন্তু প্রয়োজনাভাব। যে অসম্ভবকে বাস্তব করিতে বদ্ধপরিকর, তাহার প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে উপমা প্রয়োগ করা ধৃষ্টতা ত বটেই, পূর্ণ বাতুলতা।

স্ত্রী-উত্তোলনীর সম্পাদকের বাড়ী গোরাচাঁদ স্বয়ং গেলেন, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া সভ্যদের বাড়ী বাড়ী গিয়া আবশ্যক সংখ্যা পূরণ করিয়া সকলে মিলিয়া সভা-তলে উপনীত হইলেন।

অসাধারণ সভার এই অসাধারণ অধিবেশন খুব জমিয়া গেল, ইহা বলাই বাহুল্য। ক্রমে প্রস্তাব, বক্তৃতা, বাদ, অনুবাদ, প্রতিবাদ, বিতর্ক, বিতণ্ডা—কত বলিব? আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি ক্ষুদ্র মানব, কেমন করিয়া সে বাক্যসাগর মসীরেখায় অঙ্কিত করিব? সাহারার মরুভূমি যদি কাগজ হইত, মিশরের শিখা-মন্দির যদি লেখনী হইত, ভূমধ্যসাগর যদি দোয়াত হইত, তাহা হইলেও এই সভার, এই রজনীর কার্য্য-বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে সাহস করিতাম কি না, বলা

যায় না। আমার বর্ত্তমান অবস্থায়, উপস্থিত উপকরণ লইয়া ত কোনও মতেই নয়। আপনারা এই স্থলে একটা বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন; উপরে যে দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা ভারত ছাড়া। পাণ্ডিত্য থাকিলে, আর পাণ্ডিত্য দেখাইতে হইলে এরূপ নহিলে হয় না। ফল কথা, আমি সে কার্য্যবিবরণ এখানে তুলিতে সাহসী হইলাম না; সদ্য সদ্য তাহা না পড়িলে যাঁহার সংসার অচল হইবে, তিনি সভাসম্পাদকের খাতায় পড়িয়া আসিতে পারেন; আর, অপেক্ষা করা যদি চলে, তবে আগামী কল্য মন্তব্য সমেত সংবাপত্রে পাঠ করিতে পারিবেন।

স্ত্রী পুরুষের সম্যক্ সাম্য বিধান জন্য গোরাচাঁদ যথাবিধি প্রস্তাব করিলেন; যথাবিধি গোরাচাঁদের সে প্রস্তাব গৃহীত, অনুমোদিত, অবলম্বিত এবং সভার পুস্তকে লিখিত আকারে পরিণত হইল, এটুকু বলা আবশ্যক। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী, জয়ের পূর্ব্বে যুদ্ধও অবশ্যম্ভাবী, নহিলে জয় কিসে? অতএব গোরা-চাঁদের প্রস্তাবে বাধা উপস্থিত করিয়া, তাহার বিরোধ চেষ্টা করিয়া কেহ যে নিজ দুর্ব্বলতা, অসমসাহিকতা প্রকাশ করিয়াছিল, ইহা না বলিলেও চলে। অন্ততঃ এখন, এখানে না বলিলে চলে।

সেই জয়ে উল্লসিত হইয়া, সভাভঙ্গের পর দ্বিপ্রহর রাত্রি অতীত করিয়া গোরাচাঁদ কর্ণবালিস রথ্যা অব-লম্বনে বাটী যাইতেছিলেন। তাহাতে সুকিয়ার গলির

মোড়ের সম্মুখে গ্রন্থকারের সহিত দেখা। সেই কথাটা জানাইবার জন্য আবার এ প্রয়াস। অনেক কথা বলিতে ভুলিয়াছি ; তন্মধ্যে এক কথা এই যে, মির্জা-পুর রথ্যার কোনও এক স্থানে স্ত্রী-উত্তোলনীর কার-খানা প্রতিষ্ঠিত ছিল ; সেই ধড়াচূড়াবন্ধা গোরাচাঁদ সেই স্থান হইতে বাড়ী যাইতেছিলেন। আর এক কথা এই যে, গাড়ী ভাড়ার পয়সা সঙ্গে ছিল না বলিয়া গোরাচাঁদ একাকী পদব্রজে যাইতেছিলেন। এই অর্থাভাবে এই ইতিহাসের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়, গোরাচাঁদ গাড়ী হাঁকাইয়া যাইতে পারিলে আমরা সঙ্গে যাইতে পারিতাম না। অতএব ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আমার, এবং গোরাচাঁদের সঙ্গে সঙ্গে চলুন।

যাহাদের মানসক্ষেত্রের পরিসর অল্প, এরূপ ক্ষুদ্র প্রাণ মনুষ্যগণ উল্লাসে উন্মত্ত হইয়া উঠে। কিন্তু গোরাচাঁদ বিরাট পুরুষ, উন্মত্ত হইলেন না ; তাই বলিয়া অন্তরের তরঙ্গ বিক্ষোভে তিনি যে একটুকুও বিচলিত হন নাই, এমন বলিতে পারি না। প্রাকৃতিক বলের সংঘর্ষ একেবারে পরিহার্য্য নহে, ভূকম্পে ভূধরও টলিয়া যায়। সুতরাং গোরাচাঁদ চলিতে চলিতে এক একবার দণ্ডায়মান হইবেন, থাকিয়া থাকিয়া অঙ্গভঙ্গী সমেত সবলে দক্ষিণ হস্তের সঞ্চালন, বামকরতলে দক্ষিণ করমুষ্টি সশব্দে প্রহার করিবেন, ইহা আশ্চর্য্য নহে। এক পার্শ্ববর্ত্তী পাদপন্থা হইতে অপর দিকের

পাদপস্থায়, আবার এধার হইতে ওধার,—বার বার গোরাচাঁদ এপ্রকার করিয়া চলিতেছিলেন, তাহাও আমি অস্বীকার করি না, অস্থির মতিতে পদ বিক্ষেপ অস্থির ইহা ছিল, তাহাও আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু ইহার কারণ ছিল।

সভাতে গোরাচাঁদ কৃতকার্য্য, সিদ্ধকাম হইয়াছেন, সভার নির্দ্ধারিত প্রতিজ্ঞা অবগত হইয়া বসুমতী আর আপত্তি করিতে পারিবে না, সহজেই পুরুষত্ব লাভে সম্মত হইবে, সমগ্র নারীকুল বাধ্য হইয়া দায়ে পড়িয়া সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবে, ইহা চাপিয়া রাখিবার আনন্দ নহে। এখন, এই গৌরবের কথা, এই আনন্দের কথা দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ঘোষিত হইবে বটে, কিন্তু অদ্য রাত্রিতেই "বঙ্গ মশালে" এতদ্বিষয়ক প্রবন্ধ লেখাইতে যাওয়া কর্ত্তব্য কি না, গোরাচাঁদ ইতস্তত করিতেছিলেন। কাজে কাজেই তাঁহাকে সর্পগতি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, কাজে কাজেই মাঝে মাঝে থমকিয়া দাঁড়াইতে হইতেছিল। গোরাচাঁদ একবার ভাবেন "বঙ্গ মশালের" বাড়ী যাই, অমনি রাস্তার ডান ধারে উপস্থিত; আবার মনে করেন, "বঙ্গ মশাল" হয় ত এতক্ষণ ঘুমাইয়াছে, অমনি দাঁড়াইয়া মাথা কাঁপাইয়া চিন্তা; তখনি স্থির করেন আত্মগৌরব পরমুখে ব্যক্ত হইলেই ভাল, সঙ্গে সঙ্গে বেগে রাস্তার বাঁ ধারে আসিয়া পড়েন; ক্ষণে আবার যুগপৎ সমস্ত ভাবের

সমাবেশ হয়, তখন এক পা তুলিতে এক পা পড়িয়া যায়, দু পা আগে হাঁটিতে এক পা পাছে সরিয়া যায়, যেখানকার সেই খানে পা থাকিতে দেহ-প্রতিমা দুই বার বামে, দুই বার দক্ষিণে হেলিয়া যায়। ফলত গোরাচাঁদের সেই আপাত দৃশ্যমান অস্থিরতার কারণ ছিল, ইহা আমি দেখাইলাম। সে কারণ "বঙ্গ মশাল"। "বঙ্গ মশাল" যে বঙ্গ দেশীয় বঙ্গভাষা বিরচিত, বঙ্গোন্নতির কেন্দ্রীভূত "জগদ্বিখ্যাত" সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র, এ কথা যে না জানে, মহারাজা, রাজা এবং রায় বাহাদুরের তালিকা হইতে তাহার নাম খারিজ করিয়া দেওয়াই উচিত। আবশ্যক হইলে "বঙ্গ মশাল" সম্বন্ধে অন্য কথা পশ্চাৎ।

উপরে বলা হইয়াছে—বৃথা কথা আমি বলি না—রাস্তার ধারে স্থানে স্থানে পাহারাওয়ালা ছিল। এক জন পাহারাওয়ালা একটা আলোক স্তম্ভে নির্ভর করিয়া মুদিত নয়নে ভাবনা করিতেছিল যে, ব্রজবাসিনী গোপীগণের ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া নবনী চুরি করিয়া কিষণজী বড় উত্যক্ত করিতেছেন, যশোদামাইর খাতিরে কেহ কিছু বলিত না, আর তেমন হুঁসিয়ার পাহারাওয়ালাও সে আমলে ছিল না। এখন এই 'কম্পানির' মুলুকে আমার সামনে পড়িলে কিষণজী যেই ননীর ভাঁড় হইতে হাতটী তুলিতেন, অমনি খপ্ করিয়া—ভগবৎ ধ্যানমগ্ন পাহারাওয়ালা সত্য সত্যই দক্ষিণ হস্তখানি বাড়াইয়াছে, এমন সময়ে, দৈবের বিচিত্র সমাবেশ,

গোরাচাঁদের দেহখানি সেই হাতখানির প্রান্তদেশে উপস্থিত! সুতরাং সংস্পর্শ; ফল, উভয়েরই ধ্যান-ভঙ্গ। একভাব হইতে ভাবান্তর প্রাপ্তির কারণ নির্দ্দেশ করিতে বড় বড় দার্শনিকগণ সমর্থ হন নাই, সুতরাং কিষণজী ভাবিতে ভাবিতে পাহারাওয়ালা কেন যে "শ্বশুরা" বলিয়া উঠিল, আমি কেমন করিয়া জানিব, কিন্তু বলিল—"শ্বশুরা"। গোরাচাঁদও "বঙ্গ মশাল" ভাবিতেছিলেন, সহসা বলিয়া উঠিলেন—"ক্যা হ্যায়"। চিত্তবৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাতেই নাটকের উৎপত্তি, শব্দের উপর শব্দ পড়িলেই গোলযোগের উৎপত্তি; এ কি না নৈসর্গিক নিয়ম, তাই এ স্থলেও ইহার কার্য্য হইল। পাহারাওয়ালা পূর্ব্বে কেবল শ্বশুরা বলিয়াছিল, এখন বলিল—"শ্বশুরা, বাউরা, মাতোয়ারা"। অগত্যা গোরাচাঁদের মুখে "যও" অর্থাৎ সরিয়া যাও ধ্বনিত হইল। পাহারাওয়ালা পুনরপি বলিল "চলো থানা পর" এবং সর্ব্বাঙ্গ চঞ্চল করিল। গোরাচাঁদও ইংরেজী ভাষায় উত্তর দিয়া সর্ব্বাঙ্গ অধিকতর সঞ্চালন করিলেন। ফল হইল উভয়ের বেগে গমন, অগ্রে গোরাচাঁদ, পশ্চাৎ পাহা-রাওয়ালা; ক্রমে রীতিমত নরদৌড়, সঙ্গে সঙ্গে শব্দ—"পাকড়ো চোর—মাতোয়ারা" ইত্যাদি।

দৌড়! দৌড়! দৌড়! নিরপরাধ পরহিতপরায়ণ গোরাচাঁদ জানেন না যে কেন দৌড়িতেছেন, তথাপি দৌড়! সাহস নাই এমন নয়,—এত রাত্রিতে সভা

সংগ্রহ, সভা হইতে একাকী প্রত্যাগমন, ভীরু লোকে পারে না। শরীরে বল নাই এমন নয়,—জ্বরের উচ্ছিষ্ট প্লীহাগর্ভ বঙ্গবাসী সহজে এত বেগবান হইতে পারে না, তবু দৌড়! ভ্রম বশতঃ দৌড়। পাহারাওয়ালা দৌড়িতেছে, সেও ভ্রমবশত দৌড়। সংসারে কয়জন ফিরিয়া দেখে? সংসারের গতিকই এই।

ইহাঁরা দৌড়ুন, কিন্তু পাঠকপাঠিকা এখন নিতান্তই গ্রন্থকারের হাতে। এখন আমি মারিলে মারিতে পারি, রাখিলে রাখিতে পারি; এখন একমাত্র আমার দয়ার উপরে নির্ভর। এই জন্যই গ্রন্থকারের এত সম্মান, লোকে গ্রন্থকারদের এত ভয় করে। নিত্য নিত্য দেখিতে পাও না, দক্ষিণা দিয়া হাসি হাসি মুখে গ্রন্থকারের করকবলিত হইয়া কত সুশীল সুবোধ পাঠক শেষে কান্দিয়াও নিস্তার পান না? অতি কোমল শয্যায় সবলে শোয়াইয়া দিলেও যাহার অস্থি-ভঙ্গের সম্ভাবনা, এমন কোমলপ্রাণা, পাঠকের ভাল-বাসার ধন, নায়িকাকেও উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে তুলিয়া এই ফেলি, এই ফেলি করিয়া গ্রন্থকার ছাড়িয়া দেন; বহু অশ্রুপাত, বহুতর বিচ্ছেদ, বহুতর দুঃখ ভুঞ্জাইয়া আশার সুখপ্রান্ত সংস্পর্শ করাইয়া বীর ধীর শান্ত নায়ককেও গ্রন্থকার ভদ্রাসনের খিড়কির বাঁধা ঘাটের নিম্নে অতল সাগর তলে নিমজ্জমান রাখিয়া ভদ্র লোকের মত সরিয়া দাঁড়ান। গ্রন্থকারের এই রীতি। এক্তেয়ার আছে বলিয়াই এই কার্দ্দানি। আমিও ত গ্রন্থকার।

গোরাচাঁদ অনন্তক্ষেত্রে ব্যাপিয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত পাহারাওয়ালা তাড়িত হইয়া দৌড়িতে পারেন; মুহূর্ত্ত মধ্যে পাহারাওয়ালার করাল কবলে কবলিত হইতে পারেন; অথবা বিপদ-প্রশান্তমহাসাগরে সন্তরণ লীলা দেখাইয়া পাঠকের অলক্ষিতে, পাঠিকার অতর্কিতে বেলা ভূমিতে পদার্পণ করিয়া হাস্য রাশি বিকীর্ণ করিতে পারেন। পারেন বটে, কিন্তু আমি রাজি হইলে ত? সেই জন্যই বলিয়াছি পাঠক পাঠিকার মরণ বাঁচন গ্রন্থকর্ত্তারই হাতে।

এখন আপনাদের ধৈর্য্য পরীক্ষা করিবার জন্য আমি একবার বিশ্রাম লভিব: আপনারা ভাবিতে থাকুন।

দিশাহারা।

"তুমি কার কে তোমার,
কারে বলো রে আপন?"

নববিধানের সেন মহাশয়কে এই কথা জিজ্ঞাসা করা যাইতেছে। "সাধারণী" একবার এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিল

"আমি তার, সে আমার,
তারে বলিরে আপন।"

সর্ব্বনামে "সাধারণী" সন্তোষ হয়; পঞ্চানন্দের হইবে কেন? তাই এ কথাটা তোলা গেল।

তুমি গড়িয়াছ গির্জ্জা, নাম রাখিয়াছ মন্দির, দাঁড়াও পুল্‌পিটে, বলিয়া থাকো সেটা বেদি; যীশুখ্রীষ্টের নাম গাইয়া তুমি পাদরি ভুলাইয়াছ; হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে তুমি পথের পথিক ভুলাইয়াছ; খোল করতাল, ডোর কৌপীনে তুমি গোঁড়া গোস্বামীর চক্ষে ধূলি দিয়াছ; আবার শঙ্খ ঘণ্টা হুলুধ্বনি দিয়া নববিধানের ধ্বজদণ্ডের বরণ করাইয়া তুমি হিন্দু কুলবধূর মন মোহিত করিয়াছ! বাবাজী! বলো দেখি, ইহার মধ্যে তুমি কার, আর তোমারই বা কে?

তোমার চক্ষে সোণার চশমা, চুলে বাঁকা টেড়ী, পরণে গেরুয়া; পদ্মকুটীর-অট্টালিকায় বাস করিয়া তুমি সন্ন্যাসী; স্ত্রী-পরিবারে বেষ্টিত থাকিয়া তুমি বৈরাগী; কন্যার জন্য সৎপাত্রের ভাবনা ভাবিয়া তুমি যোগ সাধনে নিমগ্ন; রেলের গাড়ীর গদীমোড়া কামরায় ভ্রমণ করিয়া তুমি দারিদ্র্য ব্রতাবলম্বী;— বাবাজী, সত্য বলিতেছি, তোমাকে চিনিতে পারিলাম না, সেই জন্য সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছি, "তুমি কার, কে তোমার?"

সামাজিক নিয়ম সমূহে যে সকল দোষ আছে, তাহার সংশোধন জন্য তুমি বিশেষ ব্যগ্র। জাতিভেদ, সম্প্রদায় ভেদ, অতিশয় অনিষ্টজনক জানিয়া সমস্ত একাকার করিবার জন্য তোমার বিশেষ যত্ন। জিজ্ঞাসা করিতেছি, সেই জন্যই কি পরের মেয়ে আইবুড় রাখিবার আইন করাইয়া সকাল সকাল

আপনার মেয়েকে রাজরাণী করিয়া দিলে? সেই জন্যই কি হিন্দুর ছত্রিশ জাতির উপর নিজের একটা দল? আর ঝগড়া করিয়া আরও একটা ভাঙ্গা দল বাড়াইয়া বোঝার উপর শাকে আটি করিয়া দিলে? বলো দেখি বাবাজী, তুমি বাস্তবিক কোন্ দলের, আর তোমার আসল মত খানাই বা কি?

তুমি পৌত্তলিক, এমন কথা কেহ বলিতে পারে না; অথচ তোমার মন্ত্র তন্ত্র আছে, তাহাতে বাবা ভগবান, মা ভগবান পৃথক পৃথক আছে; ভগবানের পদ্ম আঁখি, রাঙ্গা চরণ আছে। তুমি মুসলমান, তাহাও বলিবার যো নাই, তবু মক্কা মদিনায় মহম্মদের কাছে তোমার তীর্থ ভ্রমণে যাওয়া টুকু আছে। তুমি খ্রীষ্টান নও, কিন্তু খ্রীষ্ট পুরাণের ব্রত পর্ব্বের অনুষ্ঠানে তোমার ত্রুটি দেখি না। কত বলিব? আমি হত-ভম্ব হইয়াছি, তুমিই আমাকে দিশাহারা করিলে।

তোমাকে চিনিতে পারিলাম না বলিয়া আমার ভয় হইয়াছে। ভয় হইয়াছে বলিয়া একটা অনুরোধ করিতে চাই। সুলভ সমাচারে দেখিয়াছি তুমি নব-বিধানে “সীতা উদ্ধার” করিয়াছ, এখন অনুরোধ এই, প্রাচীন বিধানে যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, নব-বিধানে যেন লঙ্কা কাণ্ডটা আর করিও না। কথা টা রাখিবে?

আমি কে, আর আমি কার।

[বেকার লোকের লেখা।]

এই প্রশ্ন আপনি উত্থাপন করিয়াছেন। যে হেতু মৌন সম্মতি লক্ষণ; আমি উত্তর দিতে বাধ্য হইলাম। বিল্ববৃক্ষবিহারী মহাপুরুষ ব্রহ্মদৈত্যেরা দৈত্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির মুখেই প্রকট হইয়া থাকেন, কিন্তু অদ্য স্বয়ং মহাপুরুষই কথা কহিতেছেন।

আমি কার? এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর এই; আমি সকলকার। আমার মনে বিকার নাই, তাই কেহ কেহ আমাকে নির্ব্বিকার বলেন। ব্রজেন্দ্র নন্দন গোকুল-বিহারীর মত আমি সখি সখা, পিতা মাতা সকলকার। আমি সখা মজুমদারের দ্বারী ভ্রাতা, কোকিল বিহারীর হস্তের ছড়ি, কন্যা রাজনারীর পরম হিতকারী এবং কোমল কুটিরবাসিনী গৃহিণীর জীবনবারি। আমি কাঙ্গাল এবং ধনীর, মূর্খ এবং জ্ঞানীর। আমার চক্ষে শ্বেত কালো সমান, শিকাশির ব্রাহ্মণ এবং শ্মশ্রু-অধর মুসল-মান আমার উভয় তুল্য। কি উচ্চ কুচরাজ, কি আমা পুকুরের ব্রহ্মমন্দিরের মস্তক, কি কলমীর কুটি-রের প্রাচীর, আর কি ধানিটোলার গাছঘর, আমার চক্ষে ইতরবিশেষ শূন্য। বিশুদ্ধ শ্বেত স্ফটিক রচিত নয়নাবরণ মধ্য দিয়া আমি সকলি শ্বেত নির্ম্মল দেখিয়া থাকি।

আমি কে? আমি কে? আমি সব। আমি চন্দ্র, আমি পাপবৈদ্য। আমি ধর্ম্মধ্বজী—ধর্ম্ম যুদ্ধে সেনা নায়ক, আমি মহাসেন। আমি নিদানে; আমি মোক্ষ মুক্তি প্রদানে; কেবল কন্যা সম্প্রদানে, শালগ্রাম দেখিয়া এক্ষণে নববিধানে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

আমি সুন্দর গৌরাঙ্গ। বঙ্গে কত রঙ্গ করিলাম তাহার সীমা নাই। আমি যোগীর চক্ষে সন্ন্যাসী—সহধর্ম্মিনীর অগ্রে রাস রসিক এবং জামাতার অগ্রে রাজ সচিব। আমায় সকলে একচক্ষে দেখে না। ভাবুক ভেদে আমার অনেক রূপ। কেহ আমাকে কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণের মত চতুর মনে করেন। যার চিত্ত শ্রীবাসের তুল্য প্রশস্ত, তিনি আমাকে অধম তারণ জ্ঞান করেন। কথাই আছে "মতি কি মন" জগতীতলে যত মাথা তত মত—কাজেই আমার সম্বন্ধে নানাবিধ কথা উঠিয়া থাকে। কিন্তু আমি আগে যেই, আমি পরেও সেই, আমি কিছু আর এই নয়। আমি মন্দিরে, ময়দানে, মসজীদে এবং লোকের মনে। আমি খোল করতালে, খঞ্জনী এবং হারমোনিয়ামে। আমি আর কত বলিব, আমিই কলিকাতায়, আমিই শিমলায়, আমিই মুঙ্গেরে, আমিই গাজিপুরে, আমি সর্ব্বত্রে সর্ব্বগামী এবং ছেলে বুড়ো সকলের অন্তর্যামী।

কলিকাতার সিঁদুরে পটী আমার আদ্যলীলার স্থল। শ্বেতাঙ্গধাম হুদুর সিন্ধুপার তামসতীরে

আমার মধ্যলীলা হয়। আর শেষ লীলা এইক্ষণ শিবদহ সন্নিকট—ললিত গৃহে।

আমার প্রথম লীলার পারিষদ দ্বারকানাথ সুত দেবেন্দ্র দেব। দ্বিতীয় লীলার পারিষদ অনেক। দেশী এবং বিদেশী—তন্মধ্যে সাহেব জনসারই অতি প্রধান ছিলেন। আর এই শেষ লীলায় ত্রৈলোক্য শুদ্ধ অনেক বয়স্য এবং শিষ্য।

পূর্ব্বে আমি বক্তা হইয়া বায়ু দ্বারা জীবের ধর্ম্মায়ুর মঙ্গল সাধিতাম। এক্ষণে বায়ু ছাড়িয়া অন্যতর ভূত, জলের আশ্রয় লইয়া তদ্দ্বারাই শান্তির কার্য্য সাধন করিতেছি। মস্তকই কুলকুণ্ডলিনীর বাসস্থল, তাই লোকের মস্তকে জলসেচনা আরম্ভ করিয়াছি; আর যেমন চিকিৎসকেরা এলোপেথি ছাড়িয়া হুমোপেথী এবং হাইড্রোপেথী ধরিয়াছে, আমিও তেমনি আত্মার রোগ সম্বন্ধে জলসেক জলপড়া অবলম্বন করিয়াছি। জাহাজে ইংরেজ এসে গঙ্গাজলকে অপবিত্র করায়, আমি আমার পবিত্র কুটীরের পুষ্করিণীর জলের আশ্রয় লইয়াছি। দেখা যাগ, এই ধর্ম্ম হাইড্রোপেথিতে কত দূর কার্য্য হয়।

মান!

"প্রাণ অতি তুচ্ছ গণি, প্রাণাধিক মান।" হে রাম! এমন কুশিক্ষাও কি আর আছে! এমন ভ্রমপূর্ণ কথাও লোকে উপদেশ স্থলে বলে! কোথায় অমূল্য,

অতুল্য, পরম যত্নের, পরম সমাদরের প্রাণ—আর কোথায় ছেঁড়া ন্যাকড়া মান! ছি ছি! প্রাণের কাছে, ধনের কাছে, মানের কথা কি তুলিতে আছে?

যেমন গামছা ধুতি, ছড়ি ছাতি, তেমনি মান;—দাম দিলেই পথে ঘাটে, হাটে মাঠে যত চাই, ততই পাই। তাই যে খুব দরে চড়া, দাম কড়া, তাহাও নয়; টাকা কড়ি ত কথাই নাই, একটু ভাণের বদলেই মান পাওয়া যাইতে পারে। "আপনার মান পাপনার ঠাঁই"—কেবল যার যত্ন নাই, সাধ নাই, ইচ্ছা নাই, তারই মান নাই। নহিলে মানের জন্য আবার ভাবনা?

হারাধন মান হারাইয়াছে, আর হারাধনের মুখ দেখাইবার যো নাই;—হয়, ইহা স্বার্থপর শঠের কথা, নয়, বুদ্ধিহীন ঘটের কথা; যাহারই হউক, ভদ্রলোকের অগ্রাহ্য, শুনিবার যোগ্যই নহে। কিছু পাইয়া, কিম্বা কিছু পাইবার আশায় যদি হারাধন এই অকিঞ্চিৎকর মান দু দিনের তরে হারাইয়াই থাকে, তাহাতে ক্ষতিটা এমন কি হইল? আজি মান গিয়াছে, আবার কাল্ মান হইবে; তবে আর মুখ দেখান বন্ধ হইতে গেল কেন? জুতার সুখতলা হারাইলে ত কেহ বলে না যে, না ভাই তুমি সুখতলা হারাইয়াছ, তোমার আর লোকের সম্মুখে বাহির হওয়া উচিত হয় না। সুখ-তলার অভাবে তবু পায়ে লাগে।' আর, মানের

অভাবে ?—কৈ আহারেরও ব্যাঘাত নাই, নিদ্রারও বিঘ্ন নাই।

শঠের কথা বলিতেছিলাম, আর নিপট নির্ব্বোধের কথা বলিতেছিলাম। ইহারা বলে, মান গেলেই সব গেল। খাটি জানিবে, বুদ্ধি শুদ্ধি থাকিতেও যে ব্যক্তি এমন কথা বলে, সে বড় সহজ লোক নয়; হয় সে মানের দালাল, খরিদদার যুটিলেই তাহার লাভ; নয় ত সে কোন্ দালালের হাতে পড়িয়া আপনি ঠকিয়া এখন বারেন্দ্রগিরি ধরিয়াছে; তোমাকেও ঠকাইয়া আপনার পর্য্যায়ে বসাইবার—ভুক্তভোগী করিবার—চেষ্টায় আছে। তাই বলিতেছি, ইহারা স্বার্থপর শঠ, ইহাদের কথায় ভুলিও না, ঠকের কাছে ঠকিও না। যাহাতে মানের দর বাড়ে, মানের কদর বাড়ে, তাই করাই ইহাদের বৃত্তি ব্যবসা। আর, নির্ব্বোধের কথা ছাড়িয়া দাও, ইহারা কবির দলের দিন মজুরির দোয়ার, গান বুঝুক আর নাই বুঝুক, প্রাণপণে চেচাইয়া দিলেই ইহারা বাহাদুরি মনে করে। ডার্বিন বলিলেন—বানরের বংশেই ক্রমে মানুষ হয়; নির্ব্বোধের দল ধূয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল—ঐ কথাই ঠিক, আমরা দেখিয়াছি আমাদের সাক্ষাৎ বাবা বানর ছিলেন। তাই বলিতেছি, নির্ব্বোধের কথা ছাড়িয়া দাও। তাহাদিগকে যাহা ধরাইয়া দিবে, তাহাই তাহারা ধরিবে। এই এত কাল কেহ বলে নাই, আমি আজি নূতন বলিতেছি—মান নিতান্ত অপদার্থ সামগ্রী;, দেখিও

আভাস পাইবা মাত্র কাকের পালের কলরবের * মত এখন ঐ রবই শুনিতে পাইবে—মান অতি অপদার্থ সামগ্রী।

ফলে শঠের কাছে সাবধান! কি রাজদ্বারে, কি কারাগারে, ইহারা সর্ব্বত্রই আছে: সেই পঞ্চমের উপর গলা চড়াইয়া ডাকিতেছে—চাই মা—ন, বড় মান, খুব মান সম্মান। ডাকুক, তায় ভুলিও না, তোমার সর্ব্বস্ব কড়িয়া লইবার ফিকির। তমঃস্থক লিখিয়া তোমার কাছে কেহ কর্জ্জ করিতে আসিলে তোমাকে "মহামহিম শ্রীলশ্রীযুক্ত—সম্বোধন করে; তুমি তখন মনে করিতেছ সে ব্যক্তির অপমান, আর তোমার সম্মান, উভয়েরই সীমা নাই: কিন্তু তোমার লাভ—কাগজ, তাহার—টাকা। বল দেখি, কে ঠকিল? বল দেখি, মান ভাল, না অপমান ভাল? তাই বলিতেছি যে, যে টাকা কয়টি রাখিয়া দিতে পারিলে, তোমার সংবৎসরের অন্ন চিন্তা কমিবে, মান কিনিতে যেন তাহা হাত ছাড়া করিও না, বুঝিলে ত? তোপ মারিলেও—না! আপনি বাঁচিলে হাজার তোপ! সেই রূপ আঁখর দিয়া বলিলেও ভুলিও না; কীর্ত্তন গাইবার সময়ে আঁখর দেয়, মন ভুলাইবার জন্য; তাহা ত

* কাকগুলা কি গরু যে কাকের পাল বলা হইল? আমাদের মোটা রসিকের ভাষার বাঁধুনী যেমন, ন্যায়শাস্ত্রের পাথনীটা তেমন নয়। পঞ্চানন্দ।

জান? আমার কথা না শুনিলে আখেরে কাঁদিতে হইবে।

মান যে কত সুলভ, মান যে আপনার হাতে, সেটা একটু দেখাইয়া দিই; নহিলে তোমার হৃদয়ঙ্গম হইবে না। চেয়ে চিন্তে একটু লম্বা কোঁচা, পায়ে মোজা, ফর্সা জামা, আর ভৃত্য শ্যামা—সঙ্গে করিয়া যেখানে যাইবে, সেই খানেই তোমার মান; তুমি আপনার আপনি বাবু বলিলে বাবু, বাহাদুর বলিলে বাহাদুর, রাজা বলিলে রাজা; তাহাতে তোমার অন্য বাবুগিরি চাই না, কাজে বাহাদুরি চাই না, সত্যিকার প্রজার পুরী চাই না। চাই কি, ভাল মানুষকে ভেড়া করিয়া তুমি দশ টাকা নগদও হস্তগত করিতে পার। আবার, সেই টাকাতে কত ইয়ার, কত ডিয়ার লইয়া কত বালাখানায় টপ্‌পা গেয়ে, কি পথের খানায় ধাক্কা খেয়ে কত কারখানাই তুমি করিতে পার। তুমি জঘন্য নগণ্য জীব, তবু সকলেই তোমার নাম করিবে, সেও ত মান। আর যদি সে সময়ে সম্মান নাই হইল, তাহাতেই বা কি? তোমার নেশা ছুটিলে চোখ ফুটিলে, দেখিতে পাইবে, তুমি যে ছিলে সেই; মোদ্দা জামাটা যেন সদ্য পাটভাঙ্গা হয়। ধোপাকে ভার দিও, সে দুটী পয়সায় তোমার সঙ্গ দোষ, চরিত্র দোষ, সকল দোষ ধুইয়া দিয়া দিয়া তোমার পুরাতন মান ইস্তিরির জোরে খাড়া করিয়া দিবে; তোমার সেই নিখুত নির্ভাঁজ নির্ম্মল মান লইয়া আবার তুমি চৌঘুড়ি

হাঁকাইয়া, চোখ রাঙ্গাইয়া, বুক ফুলাইয়া চলিয়া যাইবে, কেহ পাশে আসিলে চাব্‌কে দিয়া আবার তুমি বাহবা লইবে। মান ত ধোপার হাতে ; আর ধোপা ত ছু পয়সার চাকর! মানের জন্য আবার ভাবনা ?

বাঙ্গালা দেশে কেহ ইতিহাস লেখে না, কেহ ইতিহাস পড়েও না। সেটার প্রতি কখনও লক্ষ্য করিয়াছ ? আমি বোধ করি, এ বড় সুবুদ্ধির বন্দোবস্ত। ইতিহাসে পুরাতন কথা লেখা থাকে ; কাজ কি বাবু সে কথায় ? এখন, এই উপস্থিত মুহূর্ত্তে আমার যদি গাড়ি ঘড়ি, চেইন ঘড়ি, হুইপ্ ছড়ি, চশমা দাড়ি সমস্তই থাকে, তাহা হইলে কাল্ আমার কি ছিল, আমিই বা কে ছিলাম—সে খোঁজ খবরে দরকার কি ? বাস্তবিক দরকার কিছুই নাই ; আর দরকার যাহাতে নাই বাঙ্গালীও তাহাতে নাই। বাঙ্গালী ত অজ্ঞান নয়। "ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ"—যে জাতির ইষ্ট মন্ত্র সে কি কখনও অজ্ঞান হয় ?

বাস্তবিক মানের জন্য ভাবিতে নাই। মান তোমারও নয়, মান অমারও নয় ; মান যায়ও না ; ফল কথা মান মানীর, যখন যাহার মানে দরকার, তখনই তার মান! মানের সঙ্গে যখন চিরন্তনের বাঁধা সম্বন্ধ কাহারই নাই, তখন মানের জন্য প্রাণ দেওয়া, ধন দেওয়া, দূরে থাকুক, এমন যে ফক্কিকার জিনিশ ফাঁকি, তাহাও সকল সময়ে দিতে নাই। কালে ভদ্রে ফাঁকি দিয়া

কি ঝুটা মিছা কহিয়া যদি মান পাওয়া যায় ক্ষতি নাই। কিন্তু ঐ বস্!

ঠাকুরদাদার কাহিনী।

এক থাকেন রাজা, তিনি খান খাজা, বাস করেন আমড়ার বাগনে। কোটা বালাখানা, বাগ বাগিচা, দীঘী পুষ্করিণী, হাতী ঘোড়া, গাড়ী পাল্কী, লোক লস্কর—এ সব যে কত তা বলিয়া ওঠা যায় না। রাজার ভাণ্ডার, কুবেরের ভাণ্ডার। ফল কথা, ভূ-ভারতে এমন রাজা আর ছিল না।

রাজা বয়সে যেমন নবীন, জ্ঞানে তেমনি প্রবীণ। রাজা হইলেই তার যেমন সুয়া দুয়া দুই রাণী থাকিতেই হয়, এ রাজার তা ছিল না;—এক রাজপাটে এক পাটরাণী। এখন রাজরাণী হওয়া না কি খুব জোর কপালের কথা, তোমার আমার ভাগ্যে ঘটিয়া ওঠে না, এই ভেবে রাজা বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। পারিষদ্বর্গ এক দিন বিকাল বেলায় দেখে যে, ফুল-বাগানের পদ্ম পুকুরের পাথরবাঁধা ঘাটে ধরাসনে বসিয়া, গালে হাত দিয়া, বিমর্ষভাবে রাজা মৌনী হইয়া রহিয়াছেন।

পারিষদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ পারিষদ, চুপি চুপি পা টিপে টিপে পেছুন দিক দিয়া রাজার সমীপবর্ত্তী হইয়া চুপ্ করিয়া দুই হাতে রাজার চক্ষু চাপিয়া ধরিল।

রাজা তখন এক মনে ভাবিতেছিলেন, তাঁহাকে উঠি-লেন ; পারিষদ তবু চক্ষু ছাড়িল না। কাজে কাজেই রাজাকে পারিষদের হাতে হাত বুলাইয়া দেখিতে হইল, লোকটা কে ? হাত বুলান শেষ করিয়া, একটু রাজ-হাসি হাসিয়া রাজা বলিলেন—ঠাওরাইতে পারি-লাম না।

তখন সেই হাতের মালিক ফিক্ করিয়া একটু হাসি ছাড়িয়া দিয়া, রাজার সম্মুখে দাঁড়াইল, জিজ্ঞাসা করিল—বলি, মহারাজ, একা বসে এত ভাবনাটা হচ্ছিল কিসের ?

চোখ ধরাতে রাজার ভাবনা গিয়াছিল, এই কথায় আবার সেই ভাবনা ফিরিয়া আসিল, রাজা বলিলেন—প্রিয় সখে! ভাবি কি সাধে ? ভাবনা আসিয়া পড়ে, তজ্জন্যই ভাবিতে হয়। পরের দুঃখ ভাবিতেছি।

পারিষদ এতক্ষণ গম্ভীর ভাবে রাজার বাক্য সকল শ্রবণ কুহরে প্রবেশ করাইতেছিল, ফুরাইলে পর, উচ্চ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না, অপিচ বলিল—মহা-রাজা সসাগরা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর রাজা আপনি, আপ-নার আবার ভাবনা ? ধনাগারে ফাঁক নাই, হীরা মণি মাণিক্যে পরিপূর্ণ ; শরীরে ফাঁক নাই, রূপযৌবন পরিচ্ছদাদিতে শোভা উছলিয়া পড়িতেছে, গীত বাদ্য মাংস মদ্য সমস্ত বয়স্য কিছুরই অভাব নাই। আমি ভাবিতেছি, ভাবনা কোন পথ দিয়া কোথায় প্রবেশ করে ? না মহারাজ, আজ অন্য কোন নিগূঢ় কথা

আছে, আমাকে বলিবেন না, সেই জন্য এই সকল ওজর করিতেছেন।

পারিষদের এই শ্লেষসূচক বাক্য পরম্পরা শ্রবণ মাত্র, রাজা অতিমাত্র ক্ষুণ্ণ হইয়া খিন্ন চিত্তে উত্তর করিলেন—প্রিয় বয়স্য, তোমার নিকট আমার গোপনীয় কি আছে? তুমি আমাকে অবিশ্বাস করিয়া অবিচার করিতেছ। সত্য সত্যই আমি পরের দুঃখ ভাবিয়া কাতর হইয়াছি।

উভয়ে মন্ত্রণা গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাজা একে একে দুঃখ জানাইতে লাগিলেন, পারিষদ যথাক্রমে তাহার প্রতিবিধান ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করিল।

বিস্তীর্ণ রমণীকুল মধ্যে একজন মাত্র রাজরাণী হইতে পারে, অন্যের সেই সৌভাগ্য সম্ভবে না। ইহাই রাজার এক নম্বর পরদুঃখ।

মীমাংসা অতি সহজ। পারিষদ বলিল—মহারাজ, এ দুঃখের নিবারণ ত আপনারই হস্তে রহিয়াছে। বাক্য এবং ব্যবহারে আপনি ঘোষণা করুন যে, যাহার রাজরাণী হইবার সাধ আছে, আপনি তাহারই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন; আপনার পাটরাণীর প্রতি একাগ্রতা পরিত্যাগ করুন; তাহা হইলে সৌভাগ্য-কামিনী রমণী মাত্রকেই রাণী নির্ব্বিশেষে অশন ভূষণ সম্প্রদান করিয়া পরদুঃখ নিরসন এবং আত্ম ভাবনা বিসর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবেন, তাহাতে সংশয় দেখি না।

সাধু! বয়স্য, সাধু, বলিয়া মহারাজ প্রিয় বয়স্যের করমর্দ্দন এবং শিরশ্চুম্বন করিলেন। এত সহজে এক চিন্তার পার পাইয়া, আর এক চিন্তার উন্মেষণ করিলেন! বলিলেন—বয়স্য, আমার প্রজাবর্গ অতি দরিদ্র, কোনও প্রকারে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে; কিন্তু তাহাদের চরিত্র বড় দূষিত, গণিকা এবং মদিরাতে তাহাদের ধনক্ষয় হয় এবং তাহারা সপরিবারে কষ্ট পায়; ইহার উপায় কি ?

এই দ্বিতীয় দফার দুঃখও অকিঞ্চিৎকর ; পারিষদ প্রস্তাব করিল—মহারাজ, এ জন্য চিন্তা কি ? ব্রহ্মাণ্ডের এই দ্বিতীয় দফার দুঃখও অকিঞ্চিৎকর ; পারিষদ প্রস্তাব করিল—মহারাজ, এ জন্য চিন্তা কি ? ব্রহ্মাণ্ডের বারবিলাসিনীগণকে আপনি আশ্রয় প্রদান করুন; প্রত্যহ সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাহাদিগকে রাজপুরী মধ্যে আনয়ন পূর্ব্বক নিশাশেষে বিদায় করিয়া দিউন; তাহাদের জীবিকা জন্য বৃত্তি ব্যবস্থা করিয়া দিউন; এবং তাহাদের মনোভঙ্গ নিবারণ জন্য রাজপ্রাসাদে সুরাচ্ছত্র সংস্থাপন করিয়া দিউন। মহারাজ, এ প্রকার নিয়ম হইলে শৌণ্ডিকের ব্যবসায় বিলুপ্ত হইবে না, অথচ নিশাকর ও নিশাচর প্রজাবর্গের ধনবৃদ্ধি ও ধর্ম্মোন্নতি হইবে, আপনি ধর্ম্মযাজক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবেন এবং আপনার যশোরাশি দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া ধরণী মণ্ডলে বিঘোষিত হইতে থাকিবে,

বমের শব্দের ন্যায় দূর দূরান্তরে আপনার নামের শব্দ শোনা যাইবে।

তখন রাজার মনে তিন নম্বরের চিন্তা উদ্রিক্ত হইল। যে পণ্ডিত, যে বিদ্বান তাহার সম্মান সকল রাজ্যে সকল রাজাই করিয়া আসিয়াছেন ; কিন্তু বিদ্যা পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্যের ফল। এমন অবস্থায় মূর্খ বর্ব্বরগণকে ঘৃণা করা, তাহাদের সহবাস বর্জ্জন করা অতি নিষ্ঠুরের ধর্ম্ম। বয়স্য, কি বলো ?

পারিষদ তৎক্ষণাৎ এ প্রশ্নের সারোদ্ধার করিয়া দিল। যোড় হস্তে বলিল—মহারাজ, আমিও ঐ কথা অনেক দিন ধরিয়া মনের মধ্যে তোলপাড় করিয়া আসিতেছি। আমাদিগকে স্থান দিয়া এ প্রশ্নের মীমাংসার পথ আপনি অনেকটা পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু তবু এত দিন মনের কথা ভাঙ্গিয়া বলিতে আমার সাহাস হয় নাই। আজ যাই আপনি উথ্থাপন করিলেন, এখন আর কোরকাপ না রাখিয়াই সব বলিয়া ফেলিব। পণ্ডিত আর ভদ্র বেটারাই এত কাল আদর যত্নের একচেটে করিয়া ছিল ; সেই বিক্রমাদিত্যের আমল থেকে ঐ কথাই শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু মহারাজ, আপনি যথার্থই আজ্ঞা করিয়াছেন—বিদ্যা আর সভ্যতা সুকৃতির ফলেই হয়। সুতরাং মূর্খদিগকে দেবতায় মারিয়াছে বলা উচিত, তাহার উপর মানুষে মারিলে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হয়। মহারাজ আপনি নিয়ম করুন, যে যার পেটে

কালির দাগ আছে, তাহাকে রাজভবনের ত্রিসীমার মধ্যে আসিতে দেওয়া হইবে না, তাহা হইলেই বিধাতার যন্ত্রণাটা আর থাকিবে না ; হেসে খেলে সকল লোকেই আপনার জয়জয়কার করিবে। বাস্তবিক মহারাজ লোকের চরিত্র শোধনের যে উপায় করা হইয়াছে, তাহার পর ভদ্রলোককে এ দিকে ঘেঁষিতে দিলে, আবার যাকে তাই হ'বে, লাভের মধ্যে স্থানটা ভালো। যে যথার্থ ভদ্রলোক, সে সহজেই এ মুখো হবে না! আর যে নামে ভদ্র, তার সম্বন্ধে অর্দ্ধচন্দ্র বিধান হইলেই সমস্ত নির্ভয় নিঃসংশয়।

রাজা বলিলেন—বয়স্য, সুন্দর কথাই বলিয়াছ। কিন্তু লোকের স্বভাব আমি বিশেষ অবগত নহি, তাই একটা আশঙ্কা হইতেছে, আমার নামে বম্ ফুটিবে ত?

পারিসদ নিবেদন করিল—মহারাজ বলেন কি? বম্ ত বম্ আপনার নামে তোপের শব্দ হইবে, লোকের কাণ ঝালা পালা হইবে. দুষ্ট পড়শীর বাস্তু-ভিটায় ঘুঘু চরিবে, চারি দিকে হুলস্থূল পড়িয়া যাইবে। মহারাজ আপনি রাজা, শাস্ত্রে বলে—

"মহতী দেবতা রাজা নর রূপেণ তিষ্ঠতি।"

অর্থাৎ কি না রাজা ত মানুষ নয়, দেবতা; সংসারে কেবল লীলাখেলা করিতেই আসা। তা আমি বুক ঠুকিয়া বলিতেছি, আপনার লীলার কেহ অন্ত পাইবে না।

তারপর এই নিয়মে রাজা ঘরকন্না কর্ত্তে লাগলেন, অতএব আমার কথাটী ফুরুল, নোটে গাছটী ইত্যাদি।

স্ত্রী স্বাধীনতা।

কামিনী সুন্দরী বসু বিকাল বেলায় আফিস হইতে বাসায় আসিলেন। বৈঠকখানার বারাণ্ডায় এক খানা চেয়ারে পা ঝোলাইয়া বসিলেন। তামাম সাজা ছিল, মেনকা খানসামানী আলবোলার নলটা কামিনী বসুর হাতে তুলিয়া দিল; তিনি মৃদুমন্দ ভাবে টানিতে লাগিলেন। এ দিকে মেনকা সেই অবসরে জুতা যোড়াটী, মোজা যোড়াটী খুলিয়া লইল, চটী জুতা পরাইয়া দিল, গাউনের বন্ধ ছন্দ খুলিয়া দিল, দিয়া শাড়ী খানি হাতে করিয়া সসম্ভ্রমে এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তামামাকের আশ মিটিলে, কামিনী সুন্দরী বসু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শাড়ী খানি মেনকা বাড়াইয়া দিল, তিনি গাউন ছাড়িয়া শাড়ী পরিলেন। অন্দরের এক ছোঁড়া চাকর সেই সময়ে সম্মুখের উঠান দিয়া পুকুরের ঘাটে একটা গেলাস ধুইতে যাইতেছিল, কামিনী সুন্দরীকে দেখিয়া কোচার আঁচলটা মাথায় টানিয়া দিয়া মাথা হেঁট করিয়া চলিয়া গেল।

ক্ষণকাল পরেই মুখ হাত ধুইয়া কামিনী সুন্দরী বসু অন্দরে প্রবেশ করিলেন। কামিনী সুন্দরীর

যৎসামান্য বাহির-ফটকা রোগ ছিল। তা থাকুক কিন্তু পরিবারের প্রতি তাঁহার অযত্ন ছিল না। আফিসের ফেরত রোজকারের টাকার অধিকাংশই বাটীর ভিতর গিয়া দিতেন, আর সেই সময়ে দুটা খোসগল্প করিয়া দিবসের অবসাদ নষ্ট এবং অর্দ্ধাঙ্গের মন তুষ্ট করিতেন। পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ তাহাতেই আহ্লাদে অধীর।

কামিনী সুন্দরীর পরিবার একহারা, গৌরবর্ণ, দিব্য ফুটফুটে ছোকরাটী। তাঁহার সুন্দর ভ্রমরকৃষ্ণ গোঁফ রেখাঙ্কের অবস্থা ছাড়াইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও লতাইয়া পড়ে নাই, হরিতালের কল্যাণে গালপাট্টা প্রকট হইতে পারে নাই, মাথার আলবাট কাটা টেড়ি কোঁচার কাপড়ে অর্দ্ধাবৃত। পরিবারের নাম ভৈরব দাস, কিন্তু কামিনী সুন্দরী আদর করিয়া তাহাকে ভয়ী বলিয়া ডাকেন। ভয়ী,—কামিনী সুন্দরী বসুর দ্বিতীয় পক্ষের সংসার।

দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার সচরাচর যেমন প্রবল হয়, মুখর হয়, প্রগল্‌ভ হয়, ভৈরব সেরূপ নহেন। কামিনী সুন্দরী বসুর প্রথম পক্ষের এক কন্যা আছেন, কিন্তু ভৈরবের ব্যবহারে সেটী যে সপত্নীর কন্যা তাহা কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারে না,—ভৈরব এমনি শান্ত এমনি সৎস্বভাব, এমনি স্নেহময়। এ হেন ভৈরবকে কামিনী সুন্দরী বসু ভাল বাসিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? অদ্য দশ অঙ্গুলে দশটা হীরার আঙটী,

হাতে চুড়ি, বালা, গলায় চিক, কোমরে সোণার চন্দ্রহার, আরও (নাম জানি না) কত কি অলঙ্কার সুকোমল শরীরের নানা অঙ্গে পরিয়া, জল খাবারের থালা সম্মুখে সাজাইয়া রাখিয়া ভৈরবী বসিয়া আছেন, এমন সময়ে কামিনী সুন্দরী হাসিতে হাসিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। আসনে বসিয়া কামিনী সুন্দরী বস্ত্রে বলিলেন—"কি ভর্তা ; আজ যে বড় বাহার দেখচি! শরীরটে বাঁধা দিয়েছি, প্রাণটা কেড়ে নিয়েচ, এখন কি নেবে?"

ভৈরব ঈষৎ লজ্জিত হইয়া, মৃদু হাস্যে ভুবন ভুলাইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—প্রাণনাথিনি! আমার বাহার ত তোমারই নিমিত্তে। আমায় যতদিন তুমি ভালবাসিবে, যতদিন তোমার অনুগ্রহ থাকিবে তত দিনই আমার বাহার। এখন সাহস আছে, ভালবাস তাই এ বাহারও আছে ; বারণ কর, আর বাহারও করিব না।" এই কথা বলিতে বলিতে ভৈরবের চক্ষু যেন ছলছল করিয়া আসিল।

কামিনী সুন্দরী তখনও আহারে প্রবৃত্ত হন নাই। তাড়াতাড়ি ভৈরবের মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন,—"ছি ছি ভর! আমি কি তোমার মনে কষ্ট দিতে ও কথা বল্লুম! রোজ রোজ এমন সাজগোজ দেখি না, সেই জন্যেই রহস্য করে' একটা কথা বল্লুম! তুমি আমার উপর রাগ কর্‌লে?"

পত্নীর সোহাগে কোন সাধ্ পতির মন না গলিয়া

যায়? ভৈরব পরিহাসের স্বর অবলম্বন করিয়া বলিলেন—"তোমার মন বুঝিবার জন্য অমন করিলাম, তাহাও বুঝিলে না! আজ ওবাড়ীর দাদা একবার দেখা কর্‌তে চেয়েচেন, তাই মনে করেচি যে তুমি যদি বল তবে একবার তাঁর সঙ্গে দেখাটা করে আসি"।

কামিনী সুন্দরী বসুর ইচ্ছা নয় যে এমন সময়ে ভৈরব কোথাও যান। তিনি ভৈরবকে ভালবাসিতেন বটে, কিন্তু সে ভালবাসায় ঈর্ষ্যা ছিল না এমন কথা আমরা বলিতে প্রস্তুত নহি। ভৈরবের কথার উত্তর না দিয়া কামিনী সুন্দরী বসু বলিলেন—"তোমাদের বৌয়ের স্বভাবটা বড় খারাপ হোয়ে যাচ্ছে। সে দিন মন্দাকিনীদের বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়ে কি চলাচলিটেই না কর্‌লে? আবার শুন্‌চি যে মেচোবাজারের জীবনকৃষ্ণের বাড়ীও যাতায়াত আরম্ভ করেছে, কেউ কেউ বলে তাকে বাঁধা রেখেচে। সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন।" অদ্য সন্ধ্যার পর জীবনকৃষ্ণের বাড়ীতে কামিনী সুন্দরী বসু এবং তাহার ইয়ারিণীদের যে মজলিস্ হইবার কথা আছে, ভৈরবকে তাহা আর বলিলেন না। হয় ত, পাছে ভৈরব আপন দাদার মুখে কিছু ইঙ্গিত পায়, সে ভয়েও তিনিও কথা চাপিয়া গেলেন।

তাহাতে কিন্তু ভৈরব দাস বুঝিলেন না। দাদার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য একটু পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়া দিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কামিনী সুন্দরী বসুর মনে ঈর্ষা ছিল; কেন, বলা যায় না, কিন্তু আজ সেই ঈর্ষা সন্দেহে পরিণত হইল। ভাল করিয়া জল খাওয়াও হইল না, একটা বিশেষ কায আছে বলিয়া ওজর করিয়া কামিনী সুন্দরী বসু তাড়াতাড়ি বাহির বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিবার সময় ভৈরবের জল ধারা ভৈরবের কপোলদেশ অভিষিক্ত করিতেছে দেখিয়া আসিলেন; তাহাতে চিত্ত আরও উদ্ভ্রান্ত হইল।

পাঠ প্রকোষ্ঠে বসিয়া কামিনী সুন্দরী বসু অনেক চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু চিন্তার অবসান না হইয়া বাহুল্যই হইতে লাগিল। তখন সেই খান-সামানী ম্যানকাকে ডাকিলেন। ম্যানকা মনের গতি জানিত, সুরাপূর্ণ ডিকাণ্টার, গেলাস, জল, বরফ সম্মুখে রাখিয়া দিয়া কথাটী না কহিয়া, আবার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দুষ্ট লোকে বলে, মদ আনিবার সময়ে মেনকা এক গণ্ডূষ আপন গলায় না দিয়া আনিত না, এবং গন্ধের আশঙ্কাতেই কথা কহিত না। কিন্তু সে দুষ্ট লোকের কথা। সে কালে পুরুষেরা স্বাধীন ছিল, তখন বাবুদের খানশামারও ঐ অপবাদ শুনা যাইত।

দুই গেলাস মদ ক্রমে ক্রমে কামিনীসুন্দরী বসুর উদরে পড়িল, তাহার পর নিজ গুণে নিজ মূর্ত্তি ধরিয়া দুই গেলাসই তাঁহার মাথায় গিয়া উঠিল।

তখন কামিনীসুন্দরী বসু কয়েক বার দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া, তাহার পর দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া তথা হইতে উঠিয়া গেলেন। যাইবার সময়ে "জীবন কৃষ্ণ নাচে ভাল" এই কথা কয়টী অর্দ্ধস্ফুট স্বরে তাঁহার মুখ হইতে বিনির্গত হইল।

চল পাঠিকে! কামিনীসুন্দরী বসুর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও যাই—(উচ্ছন্নে?)

চিঠির মুসবিদা।

[সেকেলে উকীলদের একটা খ্যাতি ছিল, এখনও অনেক জায়গায় আছে যে, তাঁহারা মুসবিদা করিতে অদ্বিতীয়। হাল ধরণের উকীলগণ হাত পা নাড়িতে ভাল, নজীর দেখাইতে ভাল, কিন্তু বিদ্যা ঐ পর্য্যন্ত; মুসবিদার ত তাঁহারা যম।

পঞ্চানন্দ সেকেলে। অগত্যা যাবদীয় সংবাদপত্র ও প্রবন্ধপত্রের সম্পাদকবর্গের অনুনয় বিনয়ে বাধ্য হইয়া, অনেক দিন ধরিয়া একখানি পত্রের মুসবিদা করিতে তিনি ব্যস্ত ছিলেন। সেই জন্য কিছুকাল তদীয় দরজা রুদ্ধ ছিল, তোমরা তাঁহার শ্রীচরণ-রাজি সন্দর্শন করিতে পাও নাই।

পত্রখানি এখন প্রস্তুত। প্রত্যেক পত্রসম্পাদক সমীপে প্রেরণ করিতে হইলে বহু ব্যয়, বিলম্ব এবং বিড়ম্বনার সম্ভাবনা। তাই, নিম্নে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া

দেওয়া যাইতেছে। আবশ্যক অংশ সম্পূর্ণ করিলেই কাজে লাগিবে।]

মহামহিম মহিমার্ণব

শ্রীলশ্রীযুক্ত (নাম, এবং পুচ্ছ থাকিলে পুচ্ছের পরিচয় বসাইতে হইবে) মহোদয়

অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন

বরাবরেষু।

সযোড়হস্ত সকাতর সবিনয় নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ। পরং মহাশয়ের মহারাজোন্নতি (অথবা রাজোন্নতি, রায়োন্নতি, বাহাদুরোন্নতি, অভাবে বাবুন্নতি. যেখানে যেমন বসাইতে হয়) নিয়ত শ্রীশ্রীগবর্ণমেণ্ট সমীপে প্রার্থনা করিতেছি, তাহাতে এ দেশের এবং এ দাসের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল জানিবেন।

মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া যৎকিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখিয়াছেন, তাহাতে বীণাপাণি বাগদেবী নিতান্ত উপকৃত এবং চিরচরিতার্থ হইয়াছেন, ইহা বলাই বাহুল্য। যে হেতু ভবদীয় লেখা পড়া শিক্ষা শুদ্ধ বদান্যতা মাত্র।

কাজে কাজেই মহোদয়ের নামের জ্যোতিঃ ভূমণ্ডলের উত্তর মহাকেন্দ্র হইতে দক্ষিণ মহাকেন্দ্র পর্য্যন্ত বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, দেশের তমোরাশি অপসৃত হইয়াছে। এখন সূর্য্যদেব থাকিলেও চলে, না থাকিলেও চলে।

আপনার সম্বন্ধে অত্যুক্তি অসম্ভব। বানরকে নাই দিলে মাথার উপর চড়ে। আমারও সেই দশা ঘটিয়াছে।

বিলাস ভোগই আপনার উপযুক্ত কার্য্য। তাহা বিসর্জ্জন দিয়াছেন দেখিয়া ভবদীয় শ্রীঅক্ষর সংযুক্ত পত্র (প্রাপ্তে বা অপ্রাপ্তে) মূঢ়বুদ্ধি অসমসাহসী স্বার্থান্ধ আমি সাহস বাঁধিয়া [বঙ্গদর্শন বা বান্ধব, সাধারণী বা সঞ্জীবনী এইখানে বসাইবে] লইয়া মহাশয়ের দ্বারস্থ হইয়াছি। আপনার অসীম কৃপা, অসাধারণ সহিষ্ণুতা, সেই জন্য আপনি আমাকে সার্দ্ধচন্দ্রে বিতাড়িত করেন নাই; অপিচ কখনও কখনও অতি সুদুর্লভ অবসর পাইলে মোড়ক খুলিয়া, মলাট তুলিয়া অভ্যন্তরে শুভ দৃষ্টি পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। এ আনন্দ প্রকাশ করি কাহার কাছে? এ গৌরব বোঝে কে?

ফলে আপনি এবম্প্রকারে আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহা জন্ম জন্মান্তর ব্যাপিয়া শতমুখেও ব্যক্ত করা যায় না। এই সঙ্গে যদি আর একটু উপকার করেন—লুব্ধের আশার নাকি সীমা নাই, তাই বলিতেছি—আরও একটু উপকার যদি করেন, তাহা হইলে আপনার অনুগ্রহে ঋণসাগরে আমি একেবারে তলাইয়া যাইতে পারি।

পাপিষ্ঠ কাগজ বিক্রেতা অত্যন্ত অর্থলোভী; মহাশয়ের মন যোগাইবার অভিসন্ধিতে, সেই কাগজে ভব-

দীয় গুণ গরিমার বর্ণন করিবার নিমিত্ত আমি তাহাদের নিকট কাগজ লইয়া থাকি। কিন্তু এমন মহাব্রতের গৌরব তাহার' বোঝে না, তাহারা সর্ব্বদা পেটের দায়েই অস্থির, 'হা অন্ন হা অন্ন করিয়া আমাকে বিব্রত করিয়া তোলে; তাহাতে একমনে মহোদয়ের গুণ চিন্তনের ব্যাঘাত হয়। বিধর্ম্মী পাষণ্ড দপ্তরি কাটিয়া ছাঁটিয়া, বান্ধিয়া যুড়িয়া ভবদীয় অনুগ্রহ লাভে জন্ম সার্থক না করিয়া বেতন চায়। মহাশয়েরই পদসেবার জন্য শোষক রাজা ডাক হরকরাগিরি ব্রতাবলম্বন করিয়াছে অথচ টিকেট বিক্রয় ছলে শোষকতা ছাড়িবে না। আর, ক্ষমা করিবেন বলিয়া ফেলি, উদর নামে আমার যে এক শত্রু আছে, সেও মহাশয়ের কাজে বাধা দিয়া থাকে। বক্তৃতা করিয়া হউক, সভা করিয়া হউক, বিলাতে ভগ্নদূত পাঠাইয়া হউক কিম্বা "পারিলেমন্দে" দরখাস্ত করিয়াই হউক, যে কোনও প্রকারে এই দুষ্ট সম্প্রদায়ের শাসন যদি করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে মহানুভবের নিকট "বিনি মূলে" চির-বিক্রীত হইয়া থাকি।

বাস্তবিক শপথ করিয়া বলিতেছি এই অন্যায় অন্তরায়গুলি না থাকিলে আমার [অমুক] পত্র প্রকাশ করিতে তিলমাত্র নিয়ম ব্যত্যয় হয় না; এবং আপনার অকৃত্রিম সাহিত্যানুরাগ এবং স্বদেশবাৎসল্য অপ্রতিহতভাবে লীলা করিতে পাইয়া জগৎ সংসারকে তোলপাড় করিয়া তুলিতে পারে।

বক্তৃতা, সভা ইত্যাদি নিয়ে যদি আপনার নিতান্তই অমত হয়, তাহা হইলে ভদ্রলোকের মত দামটা ফেলিয়া দিলেও চলিতে পারে। তাহাতে আমার ঘোর স্বার্থপরতা এবং নীচাশয়তা প্রকাশ পাইবে স্বীকার করি, কিন্তু আপনার দোষ কি? না হয় মনে করিবেন, এ কাগজখানাও সাহেব চালিত ইংরেজী কাগজ, অথবা এ টাকা কয়টা সাহেব চাহিত সৎকর্ম্মের চাঁদা, কিম্বা শুঁড়া খাতার দেনা কিম্বা ইত্যাদি। আপনার "ইত্যাদি" অনন্ত, আমি কি তত জানি, না প্রকাশ করিতেই পারি!

মহাশয়ের কুশলেই এখানকার কুশল। অধিক লিপি বাহুল্য। নিবেদন ইতি।

দাসখৎ

[নাম বসাও]

অধ্যক্ষ [বা কার্য্যনির্ব্বাহক]

বিদেশভ্রান্ত যুবকের পত্র।*

প্রিয় মহাশয়,

যাহারা বিদেশে গিয়া থাকে বঙ্গীয় সমাজে তাহাদের নানা কলঙ্ক রটনা করে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য আমা-

---

* আশঙ্কিত ভ্রান্তি নিরসনার্থ জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে এস্থলে ভ্রান্ত অর্থে কৃত ভ্রমণ বোধব্য ইতি। পঞ্চানন্দ।

দের অর্থাৎ বিদেশ দর্শনকারী যুবকগণের অপেক্ষা স্বদেশের মঙ্গল কামনা কে অধিক করিয়া থাকে? তবে যে আপনাদের সহিত আমাদের আচার ব্যবহার মেলে না সে মহাশয়দের দুর্ভাগ্য। এ বিষয়ে অনেক দেখিয়া শুনিয়া আমি যাহা স্থির করিয়াছি, তাহা ক্রমে ক্রমে আপনাকে লিখিয়া পাঠাইব। ভরসা করি, আপনার ইহাতে উপকার হইবে।

আমার স্মরণ হইতেছে যে, এক বৎসরের কিছু বেশী হইবে আমি ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, এ পর্য্যন্ত আমি বাঙ্গালা ভাষা ভুলিয়া যাই নাই। ফলতঃ এ দেশের লোকের আচার ব্যবহার এ প্রকার অদ্ভুত যে তাহা দেখিয়া আমি বিস্ময় সংবরণ করিতে পারি নাই। তাহার সবিশেষ উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি।

গত ১লা এপ্রেল যখন আমি জাহাজ হইতে প্রিন্‌সেফ ঘাটে নামিলাম সেই দিন প্রথমেই এক অপূর্ব্ব দৃশ্য আমার চক্ষের উপর পড়িল। আমার সাজ সরঞ্জাম জাহাজ হইতে নামাইবার জন্য বাহকের প্রয়োজন হইয়াছিল; বলিলে বিশ্বাস করিবেন না, কিন্তু সত্য সত্যই কতকগুলা কৃষ্ণবর্ণ অসভ্য মনুষ্য—পরে জানিয়াছি ইহাদিগকে কুলী বলে—খাঁটী উলঙ্গ হইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। কেবল তাহাদের কটী দেশে বোধ হয় তিন ফুট সাড়ে তিন ফুট অতি মলিন কাপড় জড়ান রহিয়াছে, যাহার গন্ধ এখনও

পর্য্যন্ত আমার নাকে ঘুরিতেছে। তাহাদের পায়ে জুতা নাই; গায়ে কাপড় নাই, মাথায় টুপি নাই। যাহা হউক, কোনও প্রকারে আমার ঘৃণাকে জয় করিয়া তাহাদের সাহায্যে এক ঠিকা গাড়িতে আমার দ্রব্য সামগ্রী সমেৎ আমি অধিষ্ঠিত হইলাম। বিদেশে থাকিতে যে ভদ্রলোকের সহিত আমার পত্র লেখা-লেখি হইত, তাঁহার বাসস্থানের গলির নাম এবং নম্বর বলিয়া দিলাম কিন্তু চালক কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিন্তু চালক কিঞ্চিৎ বক্সিসের প্রতিশোধ স্বরূপ— এদেশে ইহাও এক লক্ষ্য করিবার কথা, অধিকাংশ লোকেই, সম্মানযোগ্য বর্জ্জন অবশ্যই আছে, বক্সিসে বড় অনুরক্ত—আমার বন্ধুর বাটীর সম্মুখে আমাকে নামাইয়া দিয়া বাধিত করিল। আমার স্মারক পুস্তকে তাহার নাম লিখিয়া রাখিয়াছি।

বন্ধুকে দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিলাম কিন্তু এত কাল পরে দেখা হইয়া যে সুখ হইবে মনে করিয়া-ছিলাম তাহার পরিবর্ত্তে বিষম দুঃখ হইল। বন্ধুও সেই কুলীদের ন্যায় উলঙ্গ। তবে ইহাঁর কোমর হইতে পা পর্য্যন্ত যেমন বেশী ঢাকা তেমনি এ দিকে আবার কাপড় এত সূক্ষ্ম যে দুঃখের কথা কি বলিব, যতক্ষণ বন্ধুর নিকটে ছিলাম, একবারও তাঁহার দিকে পূর্ণ দৃষ্টি করিতে পারি নাই। বিড়ম্বনার উপর বিড়-ম্বনা। আমি বন্ধুর সহিত কথা বার্ত্তা কহিতেছি এবং আমার সঙ্কোচের ভাব কোনও প্রকারে অপনীত করি-

তেছি, এমন সময় বন্ধুর দুইটী পুত্র সেইখানে আসিয়া উপস্থিত। একটীর বয়ঃক্রম চারি ও পাঁচ বৎসরের মধ্যে, আরএকটীর আড়াই বৎসর। কিন্তু ভগবান জানেন তাহাদের কাহারও গাত্রে যদি এক আঁস সূতো থাকে! অথচ যে পরিমাণ বহুমূল্য ধাতু দ্রব্য তাহাদের শরীরে ছিল তাহাতে আমি বিবেচনা করি যে ইংলণ্ডের কোন এক বৃহৎ কৌণ্টীর সমস্ত দরিদ্র লোককে বস্ত্রাবৃত করিতে পারা যায়। আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না, উঠিয়া চলিয়া আসিলাম। স্বদেশীয় স্বজাতি প্রভৃতি কথা উত্তম বটে, কিন্তু তাই বলিয়া শ্লীলতার উপর, সভ্যতার উপর, আক্রমণ করিবার অধিকার কাহারও নাই।

বঙ্গদেশের ইতিবৃত্ত।

মার্সম্যান সাহেব লিখিয়াছেন ভারতবর্ষের যে অংশে বাঙ্গালা লেখে এবং বলে তাহাই বঙ্গ অথবা বঙ্গদেশ।

এখন আর এ সংজ্ঞায় চলিবার যো নাই। যে বলিতে পারে, সেইংরেজী বলে, কটু কাটব্য বলে, যাহা ইচ্ছা তাহাই বলে, কিন্তু বাঙ্গালা প্রাণান্তেও বলে না। আর যে বলিতে পারে না, সে ত মুখচোরা; তাহার ইহকাল নাই পরকাল নাই, চাকরি যোটে না, ব্যবসা ফলে না, সুতরাং তাহার পক্ষে বাঙ্গালা

অবাঙ্গালা একই কথা। আর বাঙ্গালা কেহ কেহ লেখে বটে কিন্তু বড় একটা বিকায় না। অতএব মার্স-ম্যান সাহেবের আমল আর নাই, ইহা অগত্যা স্বীকার করিতে হইল।

ফলে ইহাতে তাদৃশ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কারণ বাঙ্গালা না থাকিলেও, বাঙ্গালী উচ্ছন্নে গেলেও বঙ্গদেশ থাকিবে। এমত অবস্থায় তাহার ইতিবৃত্ত লেখা যাইতে পারে।

বঙ্গদেশে এক্ষণে যে সকল মনুষ্য বাস করে তাহারা দুই জাতিতে বিভক্ত; কতক পুরুষ জাতি, কতক স্ত্রী জাতি।

এই পুরুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম, রাজ-পুরুষ; দ্বিতীয়, রোজকেরে পুরুষ; তৃতীয়, কাপুরুষ।

যাহারা দণ্ডমুণ্ডকারী, অসিচর্ম্মধারী, ইডেনোদ্যান-বিহারী ফেটনযান-সঞ্চারী, বামাঙ্কসহকারী তাহারা বিশিষ্ট রাজপুরুষ! আর, যাহারা অসিতচর্ম্মধারী হইলেও স্মিতবদন-বিকাশকারী, প্রাপ্ত পদ-কল্যাণে নরান্তকরূপে কাষ্ঠাসন-বিহারী, অধম-জন-মনভীতি-সঞ্চারী, মনোমোহন-গৌর-পদ-লেহন-সুখ জন্য সদা অহঙ্কারী—তাহারা অবশিষ্ট রাজপুরুষ।

যিনি প্রশস্ত রমণীকুল মধ্যে কেবল গৃহিণীতে অনু-রক্ত, গৃহিণীর ভক্ত, জনক-জননী ভ্রাতা-ভগিনীতে বিরক্ত, শ্যালক-শ্যালিকা-বলে-শাক্ত, যিনি বিস্তীর্ণ রাজ-নীতি ক্ষেত্রে বিজাতীয় বক্তৃতা প্রসক্ত, দেশ সমেত

লোক যজ্জন উত্ত্যক্ত, শাক চচ্চড়ি পরিবর্ত্তে যিনি গো-মেষ-মহিষ-মটন মুরগীতে আসক্ত, তিনি রোজকেরে পুরুষ।

এই উভয় সম্প্রদায়কে আমরা বারবার নমস্কার করি।

বাকি যাহারা বাজে নিষ্কর্ম্মা লোক চাষ বাস করে, দোকান পসার করে, টেক্স দেয়, গালি খায়, তাহারা যেমন কাপুরুষ আমরাও তদ্রূপ। অতএব ইহাদিগকে দূর করিয়া দাও। এই গলগ্রহ বহিতে হয় বলিয়াই রোজকেরেরা বাঙ্গালাকে স্বর্গে তুলিতে পারেন না। তন্নচেৎ এতদিন বঙ্গদেশের স্বর্গপ্রাপ্তি, গয়াকৃত্য পর্য্যন্ত হইয়া যাইত।

বঙ্গদেশে এখনও স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচলিত হয় নাই। ক্ষুদ্রারা হাট বাজার করে, সত্য; মহতীরা তীর্থ ভ্রমণ করেন, সত্য; কিন্তু মেজবউ বাড়ীতে চেয়ারে উপ-বেশন করিয়া কাব্য রসাস্বাদন করিতে পারেন না, কোণের বউ গাত্রাবরণ উন্মোচন করিতে পারেন না, বিলাসিনী বারে বসিয়া থাকিতে পান না, মিত্র স্বজনের পাণি-পীড়ন করিতে পারেন না, চটুল চরণে নাচিতে পান না—তবে আর কোন্ মুখে বলিব স্বাধীনতা আছে।

বঙ্গদেশে কি কি হয়।

পর্য্যপ্ত পরিমাণে ধান্য হয়, মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষ হয়, কালেজে ডাক্তার হয়, বাহিরে হাতুড়ে হয়, ঘরে ঘরে

ম্যালেরিয়া হয়, বালকের বিবাহ হয়, বালিকার বৈধব্য হয়, কবি হয়, কাব্য হয়, আর মাথা মুণ্ড যথেষ্ট হয়।

অন্যান্য বিবরণ দ্বিতীয় চালানের সহিত পাঠান যাইবে।

ধরম সিংহের নান্‌খাতাই।

না—ন্‌ খাতা—ই!

ইহকাল আছে, পরকাল—আছে, বেদ—আছে, বাইবেল—আছে, কোরাণ্‌—আছে, আবেস্তা—আছে।

না—ন্‌ খাতা—ই!

খোল—আছে, করতাল—আছে, নাড়া—আছে, নাড়ী—আছে, ভেক—আছে, ভিখ্‌—আছে, ঝোলা—আছে, ঝুলী—আছে, রং—আছে, তামাসা—আছে।

না—ন্‌ খাতা—ই!

চসমা—আছে, ঝাড়—আছে, লণ্ঠন—আছে, কোট—আছে, কুটীর—আছে, বালাখানা—আছে, মন্দির—আছে, দর্পণ—আছে।

না—ন্‌ খাতা—ই!

এক—আছে, অনেক—আছে, হরি—আছে, চৈতন্য—আছে, ঈশা—আছে, মুসা—আছে, নাচ—আছে, গান—আছে, আদ্দাশ—আছে, স্বপ্ন—আছে।

না—ন্‌ খাতা—ই!

পৌত্তলিকতা—নাই।

প্রত্ন-তত্ত্ব।

(প্রেরিত পত্র।)

মান্যবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন্দ, মান্যবরেষু।

প্রিয় মহাশয়,

আমি দেখিতেছি যে বঙ্গদেশের এবং বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি কর্ম্মে আপনি অতিশয় যত্নপর হইয়াছেন। ইহাতে আপনি অবশ্যই ধন্যবাদার্হ, কিন্তু কি কি বিষয়ে বিশেষ রূপে মনোযোগ বিধান করা উচিত, তাহার নির্ব্বাচন করণে আপনার ভ্রম হইতেছে দেখিয়া আমি দুঃখিত হইয়াছি।

রাজনীতি বিষয়ে আপনার হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই; সে কার্য্যের জন্য অনেকগুলি সভা হইয়াছে; এবং তাহাদের দ্বারা প্রচুরের অতিরিক্ত কার্য্য হইয়াছে স্বীকার করিতেই হইবে। রাজনীতির আন্দোলন এক্ষণ বিলাসের বস্তু বলিলেও বলা যায়।

ধর্ম্মের জন্যেও আর চিন্তার কারণ নাই। যে হারে ধর্ম্মের সংখ্যা এখন বাড়িতেছে, বোধ হয় এরূপ চলিলে, প্রত্যেক ভারতবাসী একটী একটী পৃথক ধর্ম্মের অনুসরণ করিতে পারিবে; এক জনকে অপরের ধর্ম্মের ভাগ চাহিতে হইবে না।

সমাজের কথায় ভদ্রলোকের থাকাই, আমার মতে অকর্ত্তব্য। সমাজে এত বিভিন্ন প্রকার লোক আছে, তাহাদের মধ্যে এত বিভিন্ন প্রথা সকল প্রচ-

লিত আছে, এবং সেই উপলক্ষে এত জঘন্য কার্য্য আচরিত হয়, যে, তাহাতে লিপ্ত হইতে গেলে ভদ্রের ভদ্রত্ব রাখা অসম্ভব। তবে আহার নিদ্রা প্রভৃতি প্রাকৃতিক কার্য্যাদি সম্বন্ধে কোনও উন্নতির, বিধান করিতে হইলে অবশ্যই ক্বচিৎ কখনও কিছু বলিতে পারেন।

ভাষার এক মাত্র অভাব ভিন্ন অন্য কোনও অংশে খর্ব্বতা পরিলক্ষিত হয় না। সে অভাবের কথা পশ্চাৎ সবিস্তার লিখিতেছি। এই দেখুন, ইতিহাস যথেষ্ট, বোধ হয় এ মার্শমানের ভারতবর্ষের ইতিহাসের কিছু কম দশ বারো খানা অনুবাদ, চুম্বক, প্রশ্নোত্তর প্রভৃতি আছে। একটু হিসাব করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, যে ইংরেজী ভাষায় যত ইতিহাস আছে, বাঙ্গালা ভাষায় তাহার দশ বারো গুণ বেশী ইতিহাস হইল।

কাব্যেরত কথাই নাই। কাব্য এখন ছাঁচে ঢালিয়া লইলেই হয় কিম্বা কলে প্রস্তুত করিয়া লইলেও হয়। আদি রসে—প্রেম, প্রণয়িণী, বিরহিণী, নবীন পল্লব, শিশির, নিশির; করুণ রসে—ভারত, জননী, নিদ্রা, সন্তান; বীভৎস রসে—ছাই, ভস্ম; রৌদ্র রসে—দাপট, সাপট, মহাভৈরবী, মেঘগর্জ্জন, শ্মশান; বীর রসে—জাগো, উঠো,—ইত্যাদি কয়েকটা কথা মনের আগুনে গলাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া দিলেই কাব্য, সুতরাং এ অংশে কিছ মাত্র অপ্রতল নাই।

উপন্যাসেরও কল আছে; ইংরেজীর মাথা মুণ্ড কলের ভিতর গুঁজিয়া দিলেই খাসা খাসা উপন্যাস বাহির হইয়া আসে।

নাটক আরও প্রচুর; যেখানে দেখিবেন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি এক উদ্দেশে সমবেত হইয়া হাসিতেছে, কাঁদিতেছে, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে এবং যে যাহার পারে বুকে ছুরী মারিয়া মরিতেছে, সেইখানে জানিবেন নাটক। দোকানে যেমন মুড়ী মুড়কী, বাঙ্গালায় তেমনি নাটক।

বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি কিছু-রই অভাব নাই; যে সে পাড়াগাঁয়ের বাঙ্গালা বিদ্যা-লয়ে গিয়া দেখিবেন ৮। ১০ বৎসরের কচি ছেলেদের এ সমস্ত কণ্ঠস্থ।

সুতরাং ভাষা বিষয়েও তাদৃশ কষ্ট পাইবার প্রয়ো-জন নাই। এক অভাব আছে যে বলিয়াছি, সে প্রত্ন-তত্ত্ব সম্বন্ধে। প্রাচীন কথা যে সকল লুপ্ত প্রায় হই-য়াছে, তাহার উদ্ধার করাই আবশ্যক, তৎপক্ষে যত্ন করাই মনুষ্যত্ব, তাহাতে নিরবচ্ছেদে লিপ্ত থাকাই মাহাত্ম্য। আমি এক জন প্রত্নতত্ত্বখোর।

এ সম্বন্ধে বহুতর প্রবন্ধ আমার লেখা আছে; মধ্যে মধ্যে পাঠাইয়া আপনার উপকার করিতে আমি কুণ্ঠিত নহি। এবার একটী পাঠাই, পত্রস্থ করিয়া বাধিত হইবেন।

শ্রীর, রা।

পাঁচী ধোপানী।

অশোকের স্তম্ভের পূর্ব্বে কি পরে পাঁচী ধোপানীর আবির্ভাব হয়, তৎসম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মত-ভেদ আছে (১)। প্রসিদ্ধ চৈনিক পর্য্যটক হোয়েন্থ সাঙের পূর্ব্বে কামৃৎশ্চটকা বাসী জিনকৃষিহা (২) যে সময়ে ভারতবর্ষে পরিভ্রমণ করেন, তৎকালে পাঁচী ধোপানী জীবিত ছিলেন না, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে ; কারণ, জিনকৃষিহার গ্রন্থে তাহার নামের উল্লেখ নাই, দায়োদোরস সেকুলস্ (৩) এ কথা স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন (৪)। ইহাতে অনুমান হয় যে, যীশুখ্রীষ্টের জন্মের অষ্টাদশ শতাব্দী পূর্ব্বে কিম্বা পরে (৫) পাঁচী ধোপানী জীবিত ছিলেন। পণ্ডিতবর বাবরের এই মত (৬)।

---

(১) *Vide* Keith Johnston's Atlas ; also, Rámáyana, Vol. V., pp. 49-72, by J. Talboys Wheeler.

(২) *Vide* Gulliver's Travels, a voyage to the Houyhnhnms, cap, VI, p. 199.

(৩) Diod. Sec. fasc. IX leaf 320 ; মহ ভাষ্যম্ শঙ্করাচার্য্য প্রণীতম্, দশম অধ্যায় ত্রয়োবিংশ শ্লোক।

(৪) "Chiomikron charasso datur Jinkriska phaino manon non" &c. leaf 29 *passim*.

(৫) বারাণসাস্থ পুস্তক, দ্রাবিড়ের মূর্ত্তয়ে স্বামীর হস্তলিখিত পুস্তক, Schlegel কর্ত্তৃক মুদ্রিত Greek Recension, Ryehouse Plot by Titus Oates—এই সকল গ্রন্থ মিলাইয়া দেখিয়াছি, কিন্তু উল্লিখিত পাঠান্তরের মীমাংসা করিতে পারি নাই ; কোনও গ্রন্থে 'পূর্ব্বক' কোথায় 'পূর্ব্ব,' কোথায় 'পুর' কোথাও বা 'পর' লিখিত আছে।

(৬) Barber's Ain-i-Akberi ; Ass. recherche Vol. 9—19, *passim*.

প্রকৃতপক্ষে পাঁচী ধোবানী নামে কোনও ব্যক্তি ছিলেন কি না, অনেকে সে সংশয় করিয়া থাকেন। বন্ হম্‌বোল্‌ডট্‌ (৭) বলেন যে উক্ত নাম পৌরাণিকদিগের কল্পিত; মাংস পুরাণে (৮) যদিও পাঁচী ধোবানীর নাম পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তাহাতে পাঁচী ধোবানী স্ত্রীলোক বলিয়া বর্ণিত আছে, অথচ ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরে পাঁচী ধোবানীর নামে এ পর্য্যন্ত স্থানের নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের আচার ব্যবহার বিষয়ে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্ত্রীলোকের নাম এতাদৃশ প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় মহিলাগণ কেহ কখনও অবিবাহিতা থাকিতে পারেন নাই; পাঁচী ধোবানী বিধবা স্ত্রীলোক বলিয়া অনুমান করিলেও তাহার নাম পাঁচী ধোবান্যা হইত। অদ্যাপি "দেব্যা" "দাস্যা" শব্দে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ফ্রেডরিকো পেলিতি (৯) এতদুত্তরে বলেন যে মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তীকালে স্ত্রীলোকের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল, এরূপ বিশ্বাস করিবার ভূরি ভূরি কারণ

---

(৭) "Hlafden ver gottzgirjen moller grahferlunzig trinnstöpkter. An Llandder vrost matod utan sulfra och die; phos pohs."—Tandstickor Hohenzollern, p. 99.

(৮) "পাঁচা পঞ্চাননা দশার্দ্ধী বিংশতেশ্চতুরাংশৈকাংশী" মাংসপুরাণ, ১০ম পটল, ১৩শ সুক্ত। অপিচ,—"পঞ্চিকা পঞ্চিশা চৈতা মধ্যে বামার্দ্ধভাজিকা। গারদা ক্রৌঞ্চমালীনে নর্ম্মাদো পিণ্ডবাসিন" ইতি। ঋগ্বেদ, পঞ্চাশত্তম ব্রাহ্মণ।

(৯) Sezoine Italien Indiciy Frederico Peliti, "E cosa

আছে (১০)। নতুবা "স্বৈরিণী" "স্বাধীন ভর্ত্তৃকা" প্রভৃতি শব্দের সার্থকতা হয় না। পাঁচী ধোবানী প্রকৃতপক্ষে একজন মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বিনী রমণী, সেই জন্যই তাহার উপাধি পরিবর্ত্তিত হয় নাই; বিশেষতঃ তিনি হিন্দু বিধবা হইলেও 'ধোবানী' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্টে তদ্বিরুদ্ধ অনুমান করা সঙ্গত হইতে পারে না। যে হেতু অধ্যাপক মোক্ষমূলর ভট্ট নিঃসন্দিগ্ধ রূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে "মিত্র" উপাধি ব্রাহ্মণদিগের হইতে পারে।

যাহাই হউক পাচী ধোবানী ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই (১১)। তবে তিনি স্ত্রী কি পুরুষ(১২) তাহা এত দীর্ঘকাল পরে নির্ণয় করা অসম্ভব। অনেক জীবিত পুরুষকে স্ত্রীলোক বলিয়া ভ্রম হয়, এবং এ প্রকার স্ত্রীলোকও দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাকে

---

standi vel pruchere chi mon fan tarado e mulatto par cosi suza in &c. pp. 337.

(১০) (a) "Cum cogitur nos interprationis Seluco adhuc sunt similibaris tam tandro mutando non alicutibur parlos: si dicunt inter rationes suum" Don Giovanni, Ecloga novum. (b) Ass. Res. Bom. 99 MS (c) M. Bardèlot: "Une marionette per fenétre j ailignolles &." Œuvres. 7.

(১১) শিশুবোধক, শ্রীঅরুণোদয় বিশ্বাস এণ্ড কোং দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ৩৩১ সংখ্যক ভবন, বটতলা। এই ঠিকানায় তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন। ইতি মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

(১২) "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি'—মনু, ১০।১৩; অপিচ "স্ত্রিয়শ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ"—বিবাদতাণ্ডব, ৫ অধ্যায়, ১৭ শ্লোক।

মুণ্ডিতগুম্ফ জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যবৎ বোধ হয় (১৩।) ফলতঃ পাঁচী ধোবানী ভার বহনক্ষম যোগ্যতর পণ্ডিতগণ এ তর্কের মীমাংসা করিবেন।

পাঁচী ধোবানীর অন্যান্য বিষয় সময়ান্তরে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

শ্রীর, রা।

পরিচয় এবং প্রার্থনা।

এমন দিন ছিল যে, পঞ্চানন্দ দেবতাদের সঙ্গে আসন পাইয়া, শুদ্ধ ঠাকুরালী করিয়া, লোকের ঘাড়ে চাপিয়া, সচ্ছন্দে দিনযাপন করিত। তখন হিন্দুয়ানির প্রকোপ ছিল, বুজরুকীর আমল ছিল। সুতরাং পঞ্চানন্দের তখন সুখ ছিল। এখন হিন্দুর বড় দুর্দ্দশা, হিন্দুয়ানির ততোধিক। অগত্যা পঞ্চানন্দ, ঘাড়ে চাপা দূরে থাকুক, মুরুব্বীহীন চাকরির ভিকারীর মত, এখন লোকের দ্বারস্থ। অতএব, হে দয়াময়, তোমরা পাঁচ জন পঞ্চানন্দ পানে, একবার মুখ তুলিয়া চাও।

কি বলিলে?—"পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া ভিক্ষা দেওয়াতে অপকার ভিন্ন উপকার নাই"?—এই তোমার কথা? মুখে বলিতেছ বটে, কিন্তু তোমার মন একথায় সায় দিবে না। কথাটায় যে

---

(১৩) সঙের যাত্রা; Amateur Theatrical Company, *passim.*

তর্জ্জমার গন্ধ বাহির হইতেছে; আর একবার বিবেচনা করিয়া বলো, দাতাকর্ণের বংশধর, অতিথি বিমুখ করিও না।

মন নরম হইল না? পরিশ্রম করিয়া আহার সঞ্চয় করিতে বলিতেছ? না হয়, সম্মতই হইলাম;—এ বয়সে কি পরিশ্রম করিব, বলো? ব্যবসা করিতে পুঁজি চাই, চাকরী করিতে মুরুব্বী চাই। পঞ্চানন্দের দুইয়েরই অভাব। অধিকন্তু, যেখানে এক পূজা, সেখানে তেত্রিশ কোটি দেবতা; একটী কর্ম্ম খালি পাঁচ শ উমেদার; এক ব্যবসা, কাহন দরে ব্যবসাদার। মুটে মজুরের অভাব নাই—দেশ শুদ্ধ লোকই তাই। পঞ্চানন্দকে যদি তাহা করিতে বলো, সে ত একই কথা হইল;—তোমাদের অন্নে হন্তারক হওয়ার চেয়ে তোমরা হাতে তুলিয়া যৎকিঞ্চিৎ দাও, সেটা কি ভাল নয়? আর দশটা কুপোষ্য ত তোমার আছে; জানিবে, পঞ্চানন্দও তাহার ভিতর একটা।

বাজে খরচ করো না? গুপ্তিপাড়ার ব্রাহ্মণকেও সে কথা এক বাবু বলিয়াছিলেন। গল্পটা বলি। বাবুর একটী বৈ চক্ষু ছিল না, কিন্তু সেরেস্তাদারি চাকরি করিতেন বলিয়া টাকা যথেষ্ট। বাবু এক দিন কাছারি হইতে আসিয়া সন্ধ্যার সময় মুখ হাত ধুইতেছেন, এমন সময়ে গুপ্তিপাড়ার সেই ব্রাহ্মণ ভিক্ষার্থে উপস্থিত। বাবু কিছু দিতে চান না, ব্রাহ্মণও ছাড়ে না। "আমি বাজে খরচ করি না"—শেষে এই কথা বলিয়া

বাবু তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন এবং বিদায় করিয়া দিলেন। পর দিবস সকালে ব্রাহ্মণ আবার গিয়া উপস্থিত, বাবু তখন লেখা পড়া করিতেছেন।

বাবু বলিলেন—"ঠাকুর তুমিত বড় বেহায়া।"

ব্রাহ্মণ উত্তর করিল—"আজ্ঞে, তা' না হইলে আপনার কাছে আস'বো কেন? ভদ্রের কাছেই ভদ্র যায়।"

বাবু কিছু রুষ্ট হইয়া পুনরপি বলিলেন—"কাল্ ত তোমাকে বলেছি, আমি কিছু দিব না, তবে মিছা জ্বালাতন করো কেন?"

ব্রাহ্মণ। "আজ্ঞে দিবেন না, তা জানি; আজ সে জন্যে আসিও নি তবে, আর একটা কথাও নাকি কাল বলেছিলেন; তাই জিজ্ঞাসা কর্'তে এসেছি যে আপনার যদি বাজে খরচ নেই, তবে দুপাটী চস্মা ব্যবহার কর্‌ছেন কেন?"

বাবু অন্য উত্তর না দিয়া, একটী টাকা ব্রাহ্মণকে দিলেন। পঞ্চানন্দও তাই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করেন যে, বাপের শ্রাদ্ধ করো না, অথচ স্বর্গীয় ডিসিল্‌ক সাহেবের পাথরের ছবির জন্য চাঁদা দাও কেন? আর এই যে দিলজান বাইজী সেদিন তোমার বাগান বাড়ীতে নেচে গেয়ে এতগুলা টাকা লইয়া গেলো— তুমি সঙ্গীতাদি বিদ্যার অনুরাগী এবং পরিপোষক তাহা জানি—তবে সে যে এত বেশি পাইল, তাহা কি দিলজান গায় ভালো, সেই জন্য, নাচে ভালো,

সেই জন্য, নাকি, দিলজান হচ্চে দিলজা!, সেই জন্য ? আরও জিজ্ঞাসা করি, সে দিন ম্যাড্ অক্স্ সাহেবের বাড়ী তুমি দেখা করিতে গিয়াছিলে, উত্তম ; তাহার পরদিন পেয়াদা খুড়া, আরদালি বাবাজীদের এত ভিড় তোমার বাড়ী হইয়াছিল কেন ? তাহারা ফিরিয়া যাইবার সময়ে তোমাকে খুব সেলাম আর মান সম্মান করিয়া গেল কেন ? ইত্যাদি ইত্যাদি সকল গুলাই ন্যায্য. আর বুড়া পঞ্চানন্দ, কেবল সেই কি এত বাজে খরচের দলে পড়িল ?

"পঞ্চানন্দ চায় কি ?"

বাবুর জয় হউক ! পঞ্চানন্দ হাতী চায় না, ঘোড়া চায় না, চায়,—তোমরা পাঁচ জনে সুখে থাকো, আনন্দ করো ; চায়, পাঁচ জনকে দেখিতে শুনিতে, পাঁচ জনে মিলিয়া মিশিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে ; চায়,—পাঁচ রকম বলিতে কহিতে, সুতরাং পাঁচটা কথা সহিতে ; চায় দশে পাঁচে দেখা করিতে, পাঁচটী করিয়া টাকা লইতে, চায়,—পাঁচ বাড়ী ঘুরিয়া ফিরিয়া, পাঁচটা লোক যাহাতে প্রতিপালন হয়, তাহার উপায় করিতে। তোমরা পাঁচ ইয়ার, পঞ্চানন্দ জানেন তোমরাই তাহার 'পাঁচো হাতিয়ার' পঞ্চানন্দের আশা ভরসা বল বুদ্ধি, সকলই তোমরা। তোমাদের জয় হউক।

"পঞ্চানন্দ খায় কি?"

যৎসামান্য!—পাঁচ জনের মাথা, পাঁচটা গালা-গালি! তবে অমনি অমনি খায় না, বদান্যতা আছে; পাঁচ জনকে না দিয়া খায় না।

পঞ্চানন্দের প্রতি পঞ্চানন্দের উপদেশ।

"যাও উত্তম পুরুষ, সাবধানে যাও। ঐ যে দূরে, বহু দূরে আলোক দেখিতেছ, উহাকে লক্ষ্য করিয়া যাও। পরিচিত অন্ধকার, তাহার উপর দিয়া তোমার পথ; বুঝিয়া, বুঝাইয়া চলিবে, কিন্তু লক্ষ্য ভুলিও না, ঐ আলোক সত্য। তোমার শঙ্কা নাই।

অন্ধকারে পাদ বিক্ষেপ করিতে হইবে, অতএব সন্তর্পণে চলিবে, অতি কোমল ভাবে পদ সঞ্চালন করিবে, দেখিও তোমার অস্থির পদ দলনে ক্ষুদ্র কীট যেন বিনষ্ট না হয়। সামান্য বাধাকে বিঘ্ন মনে করিয়া যথায় তথায় খড়্গ উত্তোলন করিও না; যাহা অধম যাহা তুচ্ছ, যাহাকে ঘৃণা করিলেই পর্য্যাপ্ত আত্মাবমাননা করা হয়, তাহার প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন করিও না। অসমানে যুদ্ধ সজ্জা করিও না, দুর্ব্বলকে দয়া করিও, অজ্ঞানকে শিক্ষা দিও।

নির্ভীক হৃদয়ে অগ্রসর হও। তোমার পথে বহু-তর বিভীষিকা আছে; দণ্ডবিধি, মুদ্রণ বিধি, প্রভৃতি কত মূর্ত্তি ধরিয়া তাহারা তোমাকে ভীত করিতে, লক্ষ্য

ভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে পারে; কিন্তু ভয় নাই। মহা ব্রত উদ্‌যাপনের নিমিত্ত, দেবদত্ত মহাস্ত্র তোমার হস্তে দিয়াছি; বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিলে সকল বিঘ্ন বিদূরিত হইবে। যে পাপী সেই ভয় করে। তুমি পাপীর শাস্তি বিধান করিবে।

তোমার যদি ভ্রম হয়, মার্জ্জনা করিব। জানিয়া শুনিয়া পাপে লিপ্ত হও, পঞ্চত্বেও প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।" পঞ্চানন্দ মনোযোগ পূর্ব্বক উপদেশ গ্রহণ করিয়া বলিল—"হুঁ, তা কি আর বল্‌তে।"

সতী প্রসাদের কোণের বউ।

[যিনি ১৫ই বৈশাখের সোমপ্রকাশের সঙ্গে বেরিয়েছেন]

[পাড়া-পড়শীর লেখা]

না মা, হদ্দ করেছে! তা' না হবেই বা কেন? সোয়ামির ঐ নাই দেওয়া, ছোঁড়াদের ঐ মাথায় তোলা—যা হবার তাই হচ্ছে।

সোয়ামিকে দিয়ে সোমপ্রকাশের ছাপার কাগজে কাঁদুনি গেয়েছেন। শুনতে পাই যে মিন্সে সোমপ্রকাশে লেখে, সে নাকি বুড়ো। তাই কি ছেলে বুড়ো সমান হ'তে হয়। লজ্জা কর্‌লে না, বুড়ো মিন্সে দেখ্‌লে না, শুন্‌লে না, তলিয়ে বুঝ্‌লে না—যে কথাটা কি? আর ঐ ছোঁড়ার ধোঁয়ায় ধোঁয়া ধর্‌লে? সত্যি বোন্, দেখে শুনে পেটের ভেতর হাত পা সেঁদিয়ে যাচ্ছে।

কোণের বউ! খাবার সময় খেতে পান না, শোবার সময় শুতে পান না, হেসে কথা কইতে পান না, তেষ্টায় জলবিন্তি চাইতে পান না!—এমনি দুঃখিনীই বটে, বাছার এমনি কষ্টই বটে! এ দিকে ঢাক বাজিয়ে দেশে দেশে শ্বাশুড়ী ননদের কুচ্ছোটুকু ত গাওয়া আছে! ভাতারের হাত দে দুঃখের কাহিনী লিখিয়ে পাঠিয়েছেন। ছুঁড়ীদের কি দড়ি কলসীও যোড়ে না।

সোয়ামি রোজকেরে, এক শ টাকা মাইনের চাক্‌রে; তাই বুঝি বুড়ো শাশুড়ীর এত নাঞ্ছনা? পনেরো বছরের ছোঁড়ার বে দিয়ে ন বছরের বাঁদুরী ধরে এনে মানুষ করেছে তার, শাস্তিটে হ'ল ভালো। আজ যেনো তোর সোয়ামির টাকার মুখ দেখ্‌ছে; এত কাল আপনার বুকের উপর দে মই চালিয়ে বিষ্টিকে বিষ্টি, রোদকে রোদ মনে না করে' বুড়ো মাগী যে জলের পোকা মানুষ কোল্লে, তাও কি বউকে কষ্ট দেবার জন্যে? এখনও যে দু বেলা উঁনুনে ফুঁ পেড়ে মাগীর চোখ্ যাচ্ছে, ভাতের তোলো নাবিয়ে নাবিয়ে হাতের ছাল যাচ্ছে, তাও কি বউকে যন্তর্ণা দেবারই জন্যে?—না মা, আর বল্‌ব না, রুটী বেড়ে বউ, আপনি ঘরে নিয়ে যান, আপনি ঢাকা দিয়ে রাখেন, সোয়ামি ঘরে এলে আপনি ঢাকা খুলে দেন, সুমুখে বসে' বসে যতক্ষণ খাওয়া না হয়—ইটি খাও, উটি খাও বলেন, কত গপ্‌প করেন;—বউয়ের কষ্টের কি সীমে আছে!

ননদ! ছার কপাল যে অমন বউয়ের ননদ হয়ে'

ঘরে থাক্‌তে হয়, অমন ভাইয়ের বোন হয়ে বেঁচে থাক্‌তে হয়! কি করে সাধ্যি নেই, সেই—কাচ্চা বাচ্চা দুটো আছে, কুলীনের ঘরে ভাত পায় না—বাঁদীর মত খাটে, নাটাইয়ের মত ঘোরে, দু বেলা দু মুটো ছাই পাঁশ খেয়ে ভাই-বউয়ের মন যোগাবে মনে করে। তা' অমন অভাগীর কপালে ওটুকি সুখই বা হ'বে কেন? ও বউয়ের মন কে যোগাবে বলো?

কোণের বউত কোণেরই বউ! সকাল সন্ধ্যে কোণেই আছেন, আফিশ থেকে ঘরে, 'এলেই সোয়ামি আঁচল ধরে' বসে'—আফিশে যতক্ষণ—বউ থাক্‌তে পার্‌বে কেন, লেখা পড়া শিখেছে কিনা? বউ চিটি লিখ্‌ছেন। শাশুড়ী ননদকে কখন মুখ ফুটে কথা কয় বলো? কথা কইবার ফুরসুৎ কৈ, লজ্জা-শীলের বড় কষ্ট! মরে' যাই অমন কর্ম্মশীলের—লজ্জা-শীলের—বালাই লইয়া মরি!

কোণের বউ গেরস্তর কুটোটি কেটে দুখান করলে যে উপকার হয়, তা কর্‌বেন না। তাই যদি কেউ বল্লে' ত আগুন লাগ্‌ল, কেঁদে কেঁদে সোয়ামিকে দেখা-বার জন্যে চোখ্ করঞ্চা কর্ত্তে লাগ্‌লেন, মোমের পুতুল গল্‌তে লাগলেন। ভেড়াকান্ত ঘরে এলে মা বোন্‌কে ঝাঁটা নাথি খাওয়াবেন তার উজ্জুগ কোত্তে লাগলেন। কোণের বউয়ের মুখ ফোটে না; না?

কুকুর হাঁড়ি খেয়েছে, তাই কোণের বউকে বকেছে! মরে' যাই তা' কি বলতে আ'ছে? শাশুড়ী

রাঁধ্‌তে রাঁধ্‌তে জল আন্‌তে গেছ্‌'ল ননদ কুট্‌নো বাঁটনা কর্‌ছিল,—এমন ফাঁকে কুকুর আস্‌বে তা' বউয়ের দোষ কি? কোণের বউ যে তখন কোণে ছিলেন, নাটক পড়্‌ছিলেন,—তিনি কি তাই ছেড়ে কুকুর তাড়াতে আস্‌বেন না কি? এও কি কথা গা? এমন সোণার চাঁদ বউ ঘরে এনে শাশুড়ীকে মর্‌তে হয়, ননদকে বেরিয়ে যেতে হয়!

বউয়ের বড় দুঃখ—সে কারু কাছে দুঃখের কান্না কাঁদ্‌তেও পায় না; কাঁদ্‌লিই বা শোনে কে? বটে ত! ভাগ্যি না বল্‌তেই লিখিয়ে-সোয়ামির প্রাণ কেঁদে উঠেছিল, ছাপাওলার বুকে শেল প'ড়েছিল,—সেই তবু কথাটা বেরুল, নইলে ত এই গুম্‌রে কান্না চাপাই থাক্‌ত!

ও মা যা'ব কোথা! বউ যে গায়ের কাপড় খুল্‌তে পায় না, একি সামান্যি কথা? "শান্তিপুরে কালাপেড়ে কল্মে চুড়িদার" এ সব কাপড় কি বউ গায়ে রাখ্‌তে পারে? গেরস্ত ঘরের মেয়ে কত গা ঢেকে ঢেকে বেড়াবে' বলো? তায় আবার বাবু লিখেছেন—যৌবন কাল! সত্যি বোন্ যৌবনেই যদি গায়ের কাপড় না ফেল্‌তে পেলে, তবে আর এর পর গিন্নী বান্নী হয়ে' ফেল্‌লেই কি, আর না ফেল্‌লেই কি?

যা হোক্, আর বড় ভাবনা নেই, যখন মাথার কাপড় ফেলে খবরের কাগজ অবধি গ্যাছেন, তখন গায়ের কাপড় ফেল্‌তেও আর বড় দেরি হবে না।

হ্যাঁ গা, অমন ডাগর ডাগর চোখ্, তা' কি এক ফোঁটাও লজ্জা থাক্‌তে নেই ?

শেষ কথাই সার কথা,—স্বাধীন হয়ে, দেখে শুনে বে কর্‌তে হবে। ভালো, স্বাধীন যেন হ'ল, শাশুড়ী ননদ যেন নাই রইল,—তখন পিণ্ডি রেঁধে দেবে কে ? বউয়ের ছেলে ধর্‌বে কে ?

শোন বাছা, রাগই করো আর রোষই করো, আমাদের দিন দুখে সুখে কেটে যাবে, যখন তিন কাল গ্যাছে এক কালে ঠেকেছে, তখন যাবেই যা'বে—কিন্তু তোমাদের রীত চরিত্তির বড় ভালো বোধ হচ্ছে না। তোমাদের কপালে দুঃখু আছে।

পূজনীয় শ্রীশ্রীপঞ্চানন্দ ঠাকুর

শ্রীচরণ সরসীরুহরাজেষু।—

অবনত মস্তকে, যোড়হস্তে, নিবেদন মিদং

আমার অন্তঃকরণে বিষম এক সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; তাহার নিরসন করে, মানুষের এমন সাধ্য আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই; সেই জন্য আপনার কাছে হত্যা দিতে আসিয়াছি।

বহুকাল হইতে শুনিতে পাই যে, অনেক বাঙ্গালীর ছেলে বারেষ্টর হইবার জন্য কিম্বা সিবিল হইবার জন্য বিলাতে গিয়া থাকেন। আম পাড়াগেঁয়ে লোক,

বিশেষ জানি না, কিন্তু তাহাদের মধ্যে এক এক জনেরও ফিরিয়া আসা সংবাদ আমি পাই নাই। তাহার পর অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া সংপ্রতি আমি কলিকাতা গিয়াছিলাম। কলিকাতার লোক বড় রহস্য-প্রিয়, ভাল মানুষ পাড়াগেঁয়ে পাইলে তাহাদের আমোদস্পৃহা বড়ই চাগিয়া উঠে। আমি ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে কতকগুলি কলিকাতা-বাসী —আমি প্রথমতঃ তাহাদিগকে ঠকের হাটে ভদ্রলোক মনে করিয়াছিলাম—আমাকে বলিয়া দিল যে বড় আদালতে যাও, ফেরত বাঙ্গালী অনেক দেখিতে পাইবে। লুব্ধ আশ্বাস সহজেই প্রতারিত হয়; আমিও প্রতারিত হইলাম।

বড় আদালতে আসিয়া যাহাকে দেখি তাহাকেই ধরিয়া বসি, মহাশয় কি বিলাত গিয়াছিলেন?—সকলেই বলে—না। পরিচয় লইয়া বুঝিলাম কেহ উকিল, কেহ মোক্তার, কেহ কেরাণী, কেহ আমলা ইত্যাদি; কিন্তু বাঙ্গালী বারেষ্টর কিম্বা সিবিল একটীও দেখিলাম না।

হতাশ্বাস হইয়া, ক্ষুব্ধ চিত্তে ফিরিয়া আসিব মনে করিতেছি, এমন সময়ে একজন জুয়াচোর—সবই জুয়াচোর—আমার বিমর্ষ ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। এমন আরও পাঁচ সাতজন জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আমি মামলা করিতে আসি নাই শুনিয়া, তাহারা দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু এ

লোকটা চেহারায় যেন কতই ভদ্রলোক—বেটা পাজি পাষণ্ড!—এ লোকটা, একটী কালো কোঙ্গো, ছোট খাটো, সাহেব আমাকে দেখাইয়া দিয়া বলিল—ঐ দেখো, বাঙ্গালী বারেষ্টর! সহসা বিশ্বাস হইল না, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, হইতেও পারে, আমি পাড়া-গেঁয়ে মানুষ, হয় ত এ সরগরম আদালতে আসিয়া দিশাহারা হইয়া মানুষ চিনিতে পারিতেছি না।

তথাপি সেই লোকটাকে আর একবার জিজ্ঞাসা করিলাম; সে চটিয়া বলিল, তুমি কোথাকার পাগল! তোমায় কি আমি মিথ্যা বলিলাম। একটু অপ্রতিভ হইলাম, কারণ বুদ্ধির উপর খোঁটা দিলে সকলকারই গায়ে লাগে, তাহাতে সে ত একবারে পাগল বলিয়া ফেলিল। লোকটা ত এই বলিয়া স্থানান্তরে গেল। আমিও, আর অপদস্থ হওয়া উচিত নহে, মনে করিয়া, সাহসে ভর করিয়া একবারে গিয়া সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত।

বলিলাম, বাবু আপনি কি—? আর বলিতে হইল না। বাপু রে বাপু! সে রক্ত চক্ষু, সে স্ফুরিত নাসা-রন্ধ্র, সে কম্পিত ওষ্ঠাধর, সে কুঞ্চিত কপাল,—যদি ইহার এক বর্ণ কখনও ভুলি, তবে গোরক্ত, ব্রহ্মরক্ত। তাহার পরে, সেই নিপীড়িত-দন্ত পংক্তি-বিনিঃসৃত—'চিপ্‌র‍্যাসীএ'—আর ত বুঝিতেই পারি নাই, প্রথম চোটের কথা, তখনও পূরা অচৈতন্য হই নাই, তাই একটু একটু মনে আছে—আর সেই মদগন্ধ ব্যালোল

হৃদয়মর্ম্ম-স্থল-বিদারা স্বর—সাহেবদের গলা কি বজ্রে গড়া?—তাহার পর যাহাতে চৈতন্য পুনঃ প্রাপ্ত হই-লাম, সেই পলাণ্ডুবাসমোদিত নেড়ের সেই করলাঞ্ছিত, অস্মদ্ গ্রীবার শোভাকারী সেই অর্দ্ধ চন্দ্র; ইহার বিন্দু বিসর্গ যে ভুলিতে পারে, তাহার অন্নপ্রাশনের প্রথম গ্রাস বিষম্রক্ষিত হউক।

চৈতন্য পুনর্লাভ করিয়া আমার বিকলীকৃত ইন্দ্রিয় গ্রামকে পুনশ্চ আয়ত্ত করিয়া লইতেছি, এমন সময়ে সেই ধূর্ত্ত আবার আসিয়া উপস্থিত। আমি তখন রাগে আপাদ মস্তক থরথরায়মান, নহিলে কথা কহিয়া তাহাকে চপেটাঘাতই করিতাম। কিন্তু হস্ত পদ তখন অবশ, সুতরাং কি করি, তাঁহাকে বলিলাম, ভালো বাপু ভালো, এখনও এক পোয়া ধর্ম্ম আছে, চন্দ্র সূর্য্যের উদয় হয়, তোমার এই কাজটা কি উচিত হইয়াছে? ভালো সাহেব যদি বাঙ্গালা হন, তবে উহাঁর নামটা কি?

বেহায়া অম্লান বদনে বলিল—ছি ছি ড্বস্! তবে রে পাষণ্ড, এই তোর বাঙ্গালী!

এই প্রহারের সময় উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তখন সে পলাইয়াছে। একাকী ধৈর্য্যাবলম্বন করিলাম, বুঝিলাম যে সেও একটু রহস্য করিয়া থাকিবে।—কিন্তু, হউক, এমন রহস্যও কি করিতে হয়? কলি-কাতার মাটীকে দণ্ডবৎ!

ঠাকুর, এক রকম স্থির করিয়াছি যে, কেহ কেহ না। তথাপি বাঙ্গালীর বাঙ্গালীর জন্য প্রাণটা নাকি

কান্দে, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, কেহই কি ফিরিতে পায় না। ঐ যে ঠাকুরমার কাহিনী শুনিতাম, কোন্ দেশে পুরুষ গেলে ভেড়া করিয়া দিত; এ কি তাই? দোহাই ঠাকুর, সেবকের আদ্দাশ অবহেলা করিবেন না।

ভৃত্যানুভৃত্য

শ্রীঠ্যাকারাম দাসস্য

[পত্র প্রেরক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। চৈতন্য চরণ দাস মহাশয় যথার্থই বাঙ্গালী এবং যথার্থই বারিষ্টার।]

দেপাড়ার (১) লক্ষ্মী (২) বৈষ্ণবী।

[আজি কালি ঐতিহাসিক উপন্যাসের কিছু বাড়াবাড়ি; ছড়াছড়ি বলিলেও বলা যায়। পঞ্চানন্দের কাছে পুরাতনের আদর নাই! যাঁহারা হাল বাবু, পেটরোগা, তাঁহারাই নূতনকে ভয় করেন, নবান্ন তাঁহাদের পেটে সয় না।

এই প্রবন্ধের লেখক প্রাচীন লোক; ইনি বাল্য কালে ঠাকুরদের দিয়া দুই সের নূতন চাউল উদরস্থ করিতেন, এবং তাহাতে কাতর হওয়া দূরে থাকুক, স্ফূর্ত্তি বোধ করিতেন।

সেই জন্য আদরের সহিত তাঁহার এই নূতন প্রণালীর নূতন প্রবন্ধ পঞ্চানন্দ গ্রহণ করিলেন। এ প্রকার

---

(১) দেবপল্লী—পৃথিবী। (২) ভারতভূমি।

প্রবন্ধের নাম ঔপন্যাসিক ইতিহাস। যাহাদের অরুচিকর হইবে, তাঁহারা ডাক্তার না ডাকিয়া ইহা পাঠ করিতে প্রবৃত্ত না হন—পঞ্চানন্দ।]

প্রথম পরিচ্ছেদ।

লক্ষ্মীর পরিচয়।

লক্ষ্মী বৈষ্ণবী অনেক কালের মানুষ, তবু কিন্তু সকলের চক্ষে এখনও বুড়ী হইল না। লক্ষ্মীর বয়সী একটী প্রাণীও দেপাড়ায় নাই, তবু কিন্তু লক্ষ্মী দেখিতে শুনিতে এখনও এমন, যে, কোনও কোনও ষোড়শীকে ফেলিয়াও লক্ষ্মীর দিকে আপনার আপনি নজর যায়।

এ লক্ষ্মীর পরিচয় জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? লক্ষ্মী নিজে কাহাকেও আত্ম-পরিচয় বলে না (১); দেমাক টুকু আছে বলিয়াই মাগি এখনও হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া যায়। অন্য কেহ হইলে, কি এমন দেমাক না থাকিলে, এ বয়সে শ্মশানে তাহার অস্থি খুঁজিতে হইত। লক্ষ্মীর পরিচয় ইহার উহার মুখে শুনা। কথাটা না কি বড়ই কৌতূহলের, তাই অনেক যত্নে সংগ্রহ করা হইয়াছে।

লক্ষ্মী ভগবান বিশ্বাসের মেয়ে। বিশ্বাস বহুতর জাতি হইতে পারে, সুতরাং নানা লোকে নানা জাতি বলিয়া পরিচয় দেয়; কেহ বলে ভগবান আছে, কেহ

---

(১) ভারতবর্ষে "ইতিহাস" নাই।

বলে নাই। তাহার বাড়ী কোথায়, কেহ নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারে না।

ভগবানের অনেকগুলি মেয়ে, সবগুলি প্রায় আমাদের লক্ষ্মীর মত ; তবে দু চারিজন স্বামির ঘর করিয়াছে, এরূপ শুনিতে পাই। কিন্তু ভগবানের পরিচয় দিতে বসি নাই, তাহার অন্য মেয়েদের সঙ্গেও আমাদের কথার সম্পর্ক নাই, সুতরাং সে সব কথা আর তুলিয়াও কাজ নাই।

লক্ষ্মী রূপে অদ্বিতীয়া; যাহারা রূপ দেখিয়াছে,রূপের বিচার জানে, তাহারাই বলে, লক্ষ্মীর মত রূপ কস্মিন্ কালে কাহারও ছিল কি না, আছে কি না, সন্দেহ। বিবাহের আগে লক্ষ্মী বাপের বাড়ী হইতে বাহির হন ; অনেক সোণা রূপা, মণি মুক্তা লইয়া বাহির হন। বাহির হইয়া, সে বিভব লইয়া, সে অতুল সৌন্দর্য্য লইয়া, লক্ষ্মী আসিয়া দেপাড়ায় বাস করিলেন ; অধিক দিন যাইতে না যাইতে লক্ষ্মী ভেক লইলেন, বৈষ্ণবী হইলেন।

লক্ষ্মীর রূপ ছিল, দেমাক ছিল, খাবার ভাবনা ছিল না। কাজে কাজেই লক্ষ্মী প্রথম প্রথম অনুগ্রহের সহিত সদাব্রত বসাইলেন। গোটা কতক বাঁদর—যে প্রকার শুনা যায়, তাহাতে সে গুলাকে মানুষ বলিতে ইচ্ছা করে না—লক্ষ্মীর প্রসাদ-ভোগী হইল। বাঁদর গুলা খায় দায়, নাচিয়া বেড়ায় ; কিন্তু মুক্তা মালা বাঁদরে চিনিবে কেন? লক্ষ্মীর মস্ত

তাহারা বুঝিল না। পেট ভরিলেই সন্তুষ্ট, সুতরাং তাহারা যেমন বাঁদর তেমনই রহিয়া গেল। লক্ষ্মীরও প্রাণ চটিয়া গেল।

একটা কথা এখানে বলিয়া রাখা উচিত। আজি কালি চরিত্র বলিলে আমরা যাহা বুঝি, সে অংশে লক্ষ্মীর কখনও কোন নিন্দা গ্লানি শোনা যায় নাই। এখন, মিথ্যা কথা না বলিলে যাহার জলগ্রহণ হয় না, পরের মন্দ না করিলে যাহার দিন বৃথা যায়, এমন লোকের কথাতেও চরিত্র দোষের উল্লেখ পাওয়া যায় না; অথচ এক ব্যক্তি লক্ষ সৎকর্ম্ম করিয়া, অপরাধের মধ্যে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইলে, স্থান কালের সন্দেহ করিয়া তাহার চরিত্র মন্দ বলা হয়। এখনকার অভিধানে দেহ লইয়া চরিত্র, অন্তরাত্মার সঙ্গে চরিত্রের সম্পর্ক নাই। এই চলিত অর্থে বলিয়া রাখিতে চাই যে লক্ষ্মীর চরিত্র মন্দ বলিয়া কখনও শোনা যায় নাই; লক্ষ্মী আমোদ প্রমোদ ভালবাসে, লক্ষ্মীর ভদ্রাভদ্র বিচার নাই, লক্ষ্মী কুলত্যাগিনী, অনুগ্রহ-পাত্রকে লক্ষ্মী সর্ব্বস্ব দিবে, কিন্তু যাহা হইলে এখন চরিত্রে দোষ দেয়, তাহাতে লক্ষ্মী কখনই নাই। লক্ষ্মী ঐ এক রকমের লোক। যাহা বলিলাম, তাহাতে অনেকেই লক্ষ্মীর দোষ আর দেখিবেন না; কিন্তু আমাদের মতে লক্ষ্মী দুশ্চরিত্রা।

দেপাড়ার পার্শ্বগ্রামে অচ্যুত (১) নামে এক ব্রাহ্মণ

(১) আয্য।

তনয় ছিল ; অচ্যুত দেখিতে দিব্য সুশ্রী, কিন্তু তাহা-দের অবস্থা তত ভাল ছিল বলিয়া বোধ হয় না। লোকে বলে অচ্যুত কেবল হোহো করিয়া গুলিডাণ্ডা খেলিয়া বেড়াইত।

অচ্যুত এক দিন লক্ষ্মীকে দেখিল ; লক্ষ্মীকে দেখা, আর লক্ষ্মীর কুহকে পড়া, একই কথা। লক্ষ্মীরও তখন মন খারাপ হইয়াছিল, আকার ইঙ্গিতে লক্ষ্মী অচ্যুতকে প্রসাদ দিবে, এইরূপ জানাইল। দুই ইয়ার সঙ্গে অচ্যুত লক্ষ্মীর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। একবার যিনি লক্ষ্মীর বাড়ী পদার্পণ করিলেন, তাঁহার ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব। অচ্যুত রহিয়া গেলেন ; তাঁহার ইয়ার রাম সিং (১) এবং বেণেদের হলা দত্ত (২) ইহারাও রহিয়া গেল।

অচ্যুতের আমোদ আর ধরে না ; স্ফূর্ত্তি দেখে কে? তাহার বিশ্বাস, যে, লক্ষ্মীকে ত হস্তগত করিয়াছি, আর আমায় পায় কে? এ বাড়ীর কর্ত্তাই এখন আমি। এই ভাবে মত্ত হইয়া বাড়ীর বাঁদরগুলার উপর অচ্যুত ধূমধাম আরম্ভ করিল ; সেগুলা থাকিলে আমোদের একচেটে হইবে না, বাধো বাধো হইবে, কি ব্যাঘাত হইবে মনে করিয়া অচ্যুত শেষে তাহাদের মারা ধরা আরম্ভ করিল। কেহ কেহ আর সহ্য করিতে না পারিয়া শেষে পলাইয়া গেল ; কতকগুলা নিতান্ত

(১) ক্ষত্রিয়।

অন্ন-দাস, লক্ষ্মীর বাড়ীর মায়াও ছাড়িতে পারে না, প্রহারও সহিতে পারে না, কাঁদিয়া গিয়া লক্ষ্মীর নিকট উপস্থিত। পূর্ব্বভাব মনে করিয়া লক্ষ্মীর একটু দুঃখ হইল, একটু দয়াও হইল, অথচ বাঁদরগুলার উপর একটু বিরক্ত ছিলেন বলিয়া লক্ষ্মী বলিলেন,—"দেখ্ আমি কি করিব? ভাল মানুষের ছেলে, ওরা এসেছে, আমি ত আর ওদের কিছু বলিতে পারি না; যদি মিলে মিশে, ওদের হাতে পায়ে ধরিয়া থাকিতে পারিস্ থাক্।"

কাণা কুকুর, মাড়ে তুষ্ট; ইহারা তাহাতেই সম্মত। লক্ষ্মীর দৃষ্টিপথের বাহির না হইতে হইলেই ইহাদের পর্য্যাপ্ত লাভ, বিবেচনা করিয়া ইহারা অচ্যুতের পায়ে পড়িল, অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া কাঁদিতে লাগিল। অচ্যুত ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিল যে, ইহা-দিগকে চাকর করিয়া রাখা মন্দ নয়; খাইতে খাইবে লক্ষ্মীর, খাটিবে আমাদের। এই ভাবিয়া ইহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, তাহাদিগকে থাকিতে বলিল। তাহারাও কৃতকৃতার্থ হইয়া রহিয়া গেল।

দেপাড়ার লক্ষ্মী বৈষ্ণবী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বাঁদর গুলার সঙ্গে যখন এই রকম রফা রফিয়ৎ

হইয়া গেল, ঘরাও হাঙ্গাম যখন এইপ্রকারে চুকিয়া গেল, তখন অচ্যুত সুখের নেশায় ভোর হইয়া আমোদের রগড়ে দিন রাত্রি সমান করিয়া তুলিল। অচ্যুত আপনি কিছু করে না; আর ইয়ারদেরও কিছু করিতে দেয় না; সেই পোষমানা বাঁদরগুলা শাক পাতা, ফল মূল যাহা আনিয়া দেয়, গোঁফখেজুরের মত তাহাই খায় দায়, আর পড়িয়া থাকে।

লক্ষ্মী দেখিলেন বেগতিক। ভাল মানুষের ছেলে জানিয়া যাহাদিগকে স্থান দিয়াছেন, তাহারা এমন অকর্ম্মা হইয়া পড়িলে, শেষে তাহারাও যে বাঁদর হইয়া যাইবে, লক্ষ্মী সহজেই ইহা বুঝিতে পারিলেন। বাস্তবিক, নিষ্কর্ম্মা লোক উচ্ছন্নে যাইবার পথে সর্ব্বদাই যেন বোচকা হাতে করিয়া পা বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। যাহার হাতে কাজ থাকে, সে নষ্ট হইবার অবসর পায় না। এই সকল বিবেচনা করিয়া এক দিন আহারান্তে লক্ষ্মী সকলকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ অচ্যুত, তোমাকে আমি বড় ভাল বাসি; কিন্তু তোমার স্বভাব চরিত্র যে রকম হইয়া যাইতেছে, তাহাতে আমার মনে ভয় হইতেছে, পাছে তোমার সঙ্গে আমার পোট রাখা না চলে। এমন তর করিলে চলিবে কেন? আমি তোমাকে পরামর্শ দিই—রামসিং, হলাদত্ত প্রভৃতি সকলকেই পরামর্শ দিতেছি যে, তোমরা একটু ভদ্র হও, একটু আদব কায়দা শেখ।" এই বলিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া, লক্ষ্মী আবার

বলিল—“আমার বাড়ীতে তোমাদের স্থান দিয়াছি; যদি এখানে থাকিয়া তোমাদের চৈতন্য না হয়, দশ জনে তোমাদের সুখের কথা না জানিতে পারে, অন্য বাড়ীর লোকে যদি তোমাদের একটু হিংসাই না করে, তাহা হইলে আমার নামে কলঙ্ক হইবে, আর এখানে তোমাদের আশ্রয় দেওয়াই বৃথা হইবে। লোককে সুখে রাখিতে আমার মত কে জানে?”

লক্ষ্মীর যে বড় দেমাক ছিল, লক্ষ্মী যে কেন এত হেলিয়া দুলিয়া চলিতে ভাল বাসিত, তাহা এখন বেশ বুঝিতে পারা গেল। অচ্যুত এবং তাহার সঙ্গীরাও বুঝিল; বুঝিয়া ভয়ে ভয়ে লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিল—“তুমি যাহাতে সুখে থাক, যাহা করিলে তোমার নাম পসার খুব জারি হয়, তাহা করিতে কবে আমরা কুণ্ঠিত হইয়াছি, তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিতে আমরা ত প্রস্তুত আছি। তোমার বাগান ছাড়িয়া দিয়াছ, তোমারই লোক জনে এটা সেটা আনিয়া আমাদের দেয়; আমরা তাই খাই দাই, ঘুমাই। তবে আর আমাদের দোষ কি?”

লক্ষ্মী একটু অপ্রতিভ হইল, হইয়া বলিল—“ক্ষুণ্ণ হইও না, তোমাদের ভালর তরেই আমার বলা। তা এত দিন যাহা করিয়াছ, তাহা আমার অমতে কর নাই, ভালই করিয়াছ; এখন আবার যাহা বলি, তাহাই কর; তাহা হইলেই আমার রাগ দুঃখু কিছু হইবে না। আমার ইচ্ছা, আমার অনুরোধ যে

তোমরা সকলেই বিবাহ কর, সংসারী হও। আর অচ্যুত, তুমি একটু লেখা পড়া শিখিবার জন্য যত্ন কর; রামসিং বাড়ী ঘর দুয়ার দেখুক শুনুক, কর্ত্তৃত্ব করুক, চোর ডাকাইত আসিয়া উপদ্রব করিতে না পারে, সে ভারও গ্রহণ করুক; হলাদত্ত দোকান করিয়া বেচা-কেনা আরম্ভ করুক, আর বাকী লোক গুলা আমার বাগানে কাজ কর্ম্ম করুক। ইহাতে তোমার মানের খর্ব্বতাও হইবে না; তবে আমি বলিয়া দিতেছি, কোনও বিষয়ে তোমার কথা কেহ অমান্য করিতে পারিবে না, তবে বিষয় আশয়ে খুব নেশা থাকিলে লেখা পড়ার নাকি ব্যাঘাত হয়, সেই জন্যই বাড়ী ঘরের ভারটা তোমার উপর না দিয়া রামসিংকেই দেওয়া গেল।"

সকলেই সন্তুষ্ট হইল, সকলেই লক্ষ্মীর কথায় সম্মত হইল, কিন্তু বিবাহ করিতে, দোকান চালা-ইতে, বাড়ীর ভার লইতে ব্যয় বিধান আবশ্যক; অর্থ আসিবে কোথা হইতে, অচ্যুত এই কথা লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিল। লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল—"পাগল, তোমাদিগকে এখন খাইতে পরিতে দেয় কে? আমি পরামর্শ দিতেছি; পুঁজিও আমিই দিব। সে জন্য তোমাদের ভাবিতে হইবে না। যে আমার আশ্রিত, তাহার আবার অভাব কিসের, ভাবনাই বা কি?"

ক্রমে ক্রমে সকলে বিবাহ করিল। অচ্যুত খুব মন দিয়া লেখা পড়া করিতে লাগিল, রাম সিং বিষয়

বিভবের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিল, হলাদন্ত ব্যবসায়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে লাগিল ; অন্য সকলে বাগানের অপূর্ব্ব শোভা বৃদ্ধি করিল। গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় লক্ষ্মীর নাম ছুটিল। গরবে লক্ষ্মী মেদিনী কাঁপাইয়া তুলিল।

যথা সময়ে সকলেরই সন্তান সন্ততি জন্মিল। লক্ষ্মী ব্যবস্থা করিয়া দিল, ছেলেরা আপন আপন বাপের ব্যবসা শিখিবে, তাহারই উন্নতি করিতে যত্নবান থাকিবে। বংশধরেরাও তদনুরূপ আচরণ করিতে লাগিল।

তখন লক্ষ্মীর বাড়ীর অপূর্ব্ব শ্রী হইল, নূতন নূতন পরম রমণীয় গৃহাদি নির্ম্মিত হইতে লাগিল, অচ্যুতের বংশধরগণ বিদ্যার চৌষট্টি কলায় পারদর্শিতা লাভ করিল ; সংক্ষেপে বলিতে হইলে সকল বিষয়ে লক্ষ্মীর বাড়ী দেপাড়ার সর্ব্বত্র আদর্শ বলিয়া গণ্য হইয়া উঠিল। ক্রমে অচ্যুত রাম সিং, হলাদন্ত প্রভৃতি সন্তানদের উপর সকল বিষয়ের ভারার্পণ করিয়া, আপনারা আরামকুঞ্জে গিয়া ভগবৎ চিন্তায় কালাতিপাত করিতে লাগিল।

মোটা রসিকের প্রবন্ধ।

আপনাকে ভালো বাসা, আপনাকে বড় মনে করা, মানুষের স্বভাবসিদ্ধ হইলেও হইতে পারে ; কিন্তু তাই

বলিয়া ঘোষের স্ত্রী নিজের গরুর দুধকে দুধ বলিলে তাহা যে দুধ না হইয়া জলই হইবে, তাহার কোনও মানে নাই। যাহা সত্য, তাহা তুমি বলিলেও সত্য, না বলিলেও সত্য; তবে কেহ বিচার করিয়া দেখিতে চাহিলে, অবশ্যই তাহার বিচার করিবার অধিকার আছে। এ মুখবন্ধ টুকুর তাৎপর্য্য ক্রমে প্রকাশ পাইবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে মোটা না হইলে মানুষ রসিক হইতে পারে না। যাহারা রোগা, সরু, খিট্‌খিটে বা পাতলা, তাহারা দুষ্ট হইতে পারে, পাজি হইতে পারে, মূর্খ হইতে পারে, বড় জোর অহঙ্কারীও হইতে পারে, কিন্তু রসিক—কিছুতেই না। মোটা লোক দেখিলে, ইহারা ভোঁদা বলে, হাঁদা বলে, গোবরগণেশ বলে—বলুক; তাহাতে মোটা মানুষের রসিকত্বই প্রতিপন্ন হয়, তাহাদের নিজের রসিকতার প্রমাণ হয় না। আগুন আপনি গরম, যে আগুনের কাছে যায়, সেও গরম হয়। মোটাদের বেলাও তাই; মোটা আপনি রসিক, আর মোটার সংস্পর্শে যে আইসে সেও তখন রসিক হইয়া ওঠে। রসের আধার মোটা, যে নীরস সেই শুষ্ক।

আমি নিজে কিঞ্চিৎ মোটা, আমার পেটের বেড় পৌনে চারি হাতের বেশী নয়; তথাপি আমি রসিক বলিয়া রলিয়া প্রসিদ্ধ, একবারও দেখিলাম না যে আমার দরজী আমার কাপড়ের মাপ নিতে আসিয়া

না হাসিয়া ফিরিয়া গেল। কিন্তু আমি রসিক বলিয়াই যে মোটা মানুষ মাত্রেই রসিক, কিম্বা আমি মোটা বলিয়াই যে রসিক লোক হইলেই মোটা হইতে হইবে, তাহা বলিতেছি না। হইতে পারে আমার বেলায় এটা একটা দৈব সমাবেশ মাত্র, এবং সেই সমাবেশ জন্য আমার এই স্বজাতি পক্ষপাত জন্মিয়া আমাকে অন্ধ করিয়াছে। কিন্তু যখন ইহার যুক্তি ও কারণ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে, তখন মোটার রসিকত্ব যে প্রাকৃতিক সাধারণ তত্ত্ব এবং স্থল বিশেষের সমাবেশ নহে—ইহা কেমন করিয়া না বলিব ?

স্মরণ করিয়া দেখো, মোটা লোকে একটা কথা বলে, সহজে কেহ তাহার প্রতিবাদ করিতে পারে না ; তাহার পর মনে করো, বিদ্রূপের শাসন হইতে গুরুতর শাসন নাই, রসিকতার আশঙ্কা অপেক্ষা বেশী ভয়ানক আশঙ্কা নাই। এই দুই কথা একত্র করিয়া বলো দেখি, কি দাঁড়াইল ? মোটা লোকের সম্মান বেশী, আদর বেশী, মর্য্যাদা বেশী, ধন বেশী—কি নয় ? ভালো বস্তু, দামী জিনিস হইলেই তাহা একটু দুর্লভ হয় ; মোটা মানুষও দুর্লভ, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে মোটা মানুষের আমদানি রপ্তানি করিতেও সময় বেশী চাই, বন্দোবস্ত পাকা গোছের হওয়া চাই। ইহাতে কি প্রতিপন্ন হয় না, যে মোটা মানুষ দামী, রসিকতা দামী, অতএব মোটা মানুষ রসিক ?

জল হইতে রসের আপেক্ষিক গুরুত্ব অধিক

চপলতা হইতে রসিকতারও তাই, এবং বাঁদরামি হইতে মনুষ্যত্ব তদ্বিধ। বাঁদর বেশী মোটা, না মানুষ বেশী মোটা? আধেয়ের গৌরব থাকিলে আধারেরও গৌরব জানিতে হইবে, রসিক মানুষকে মোটা হইতেই হইবে। সামান্য তৃণে যত দিন রস থাকে, ততদিন তাহা কাব্যের বস্তু, সৌন্দর্য্যের আধার ইত্যাদি; তৃণ যখন শুষ্ক, নীরস, লঘু, তখন উপহাসের বস্তু। মোটাই রসিক।

শুদ্ধ ধারে সকল বস্তু কাটা যায় না, শুধু ভারে সবই কাটা যায়, নিতান্ত পক্ষে থেঁতো করা যায়। যাহার রস আছে তাহার ভার আছে, রস আর ভার থাকিলেই মোটা। বৈষ্ণবদের গ্রন্থে যত রস, তত আর কোথায়ও নাই; বৈষ্ণবদের গোঁসাইরা যেমন মোটা, তেমন মোটাও ভূভারতে নাই। শুদ্ধ রস আছে বলিয়াই ত? রসিকের আর এক নাম রসগ্রাহী; আয়তন না থাকিলে কি গ্রহণ করা যায়? বাস্তবিক মোটা না হইলে মোটা রসিক হইতেই পারে না।

চটুল চরণে চুট্‌কি পরিয়া খেমটাওয়ালী নাচে; তাহাতে যদি রসিকতা ভরপূর হইত, তাহা হইলে মোটা মোটা দর্শককে আদর করিয়া আসরের সম্মুখে সকলের আগে বসাইয়া দিবার নিয়ম হইত না। মোটারাই সে প্রশস্ত আসরের ভারকেন্দ্র, সেই রস-জগতের সূর্য্য, সেই রস-কুরুক্ষেত্রের কুরুপাণ্ডব।

উপর্য্যুপরি কয়েকবার আবরণ বাদ দিয়া বিলক্ষণ

মনোনিবেশ পূর্ব্বক পঞ্চানন্দের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম; ইহার মধ্যে যে একটুকুও সরস স্থান নাই, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আমার আশঙ্কা হয় যে ইহাতে মোটা বুদ্ধির অভাব আছে। পাতলা বুদ্ধিতে কুলাইবে না, ইহাও আমার বিশ্বাস। কার্য্যটা বড় সামান্য নয়, গুরুতর কাজে গুরুতর বুদ্ধিরও প্রয়োজন—আমার এই উপদেশটা গ্রহণ করিলে সুখের বিষয় হয়। (১)

মোটা রসিকের প্রবন্ধ।

[দ্বিতীয় বার।]

করিলাম এক, হইল আর; বলিলাম এক, পঞ্চানন্দ বুঝিলেন আর। দোষ পঞ্চানন্দের নয়, দোষ আমারও নয়, দোষ পোড়া দেশের, আর পোড়া কপালের। যখন বলা গেল যে, মোটা না হইলে রসিক হইতে পারে না,—পঞ্চানন্দে মোটা বুদ্ধির অভাব আছে—তখন কি আমি লিখিয়া রসিকতা করিব মনে করিয়া এ কথা বলিয়াছি? হে ভগবান! ইঙ্গিতে কথা কহিলে লোকে বোঝে না, ইহার বাড়া কি দুঃখ আছে?

১। গ্রহণ করিয়া দরকার কি? মোটা বুদ্ধির পরিচয় পাইয়াই পঞ্চানন্দ আপ্যায়িত হইয়াছেন; নিত্য নিত্য এইরূপ পাইলে পঞ্চানন্দ সুচতুর লেখককে দেবতাদের মধ্যে আসন দিতে প্রস্তুত আছেন। এ প্রকার "মোটা বুদ্ধি" দুর্লভ পদার্থ।

পঞ্চানন্দ।

সে বার বলি নাই, এবার ভাঙ্গিয়া বলিতে হইল—বাঙ্গালায় রসিকতা চলিবে না। কারণ অনেকগুলি; সমুদয় বলিতে গেলে একখানি শব্দকল্পদ্রুম তৈয়ার হয়। আমার তত অবসর নাই, অবসর থাকিলে প্রবৃত্তি নাই, মোটা মোটা দুই চারিটী বলিয়া দিতেছি।

এক কথা এই, অহোরাত্র মনে রাখিতে হইবে যে, আপন ঘরে কোন বাঙ্গালী কম রসিক নয়। গৃহিণীর কাছে পসার রাখিতে হইলেই ত এক প্রস্ত রসিকতা চাই, তাহাতে বাঙ্গালীর বাহিরিণী আছে। দু দশ জনের না থাকিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া সাধারণ সূত্রের ব্যাঘাত হইতেছে না; প্রমাণ, যেখানে শুনিবে গিন্নী, সেই সঙ্গে সঙ্গেই শুনিতে পাইবে বান্নী। তবে বল দেখি, তোমার রসিকতা লইবে কে? লইবে কখন? লইবে কেন? তায় আবার যে দর। পাঁচ টাকার পঞ্চানন্দ, কি মজার কথা। এই পাঁচ টাকায় আনন্দের বাজার বসান যায়, আনন্দের সাগর ভাসান যায়, আনন্দের জীয়ন্ত প্রতিমা গড়ে, পূজা করে শেষে, চাই প্রতিমাই ভাসাও আপনিই ভাসো—দুইয়ের এক চলে, কিম্বা দুই চলে। কেন তবে ছাপার আঁকরের উপর মাথা ধরিয়ে লোকে মরিতে যাইবে?

বলিতে পারেন, সকল লোকের গতি মতি এক রকম নয়, আমিও স্বীকার করি, "বায়ুণাং বিচিত্রা গতিঃ" কিন্তু রসিকতা অপেক্ষা—যদি রসিকতাই মানিয়া লওয়া যায়—ধার্ম্মিকতাই ভালো, স্তাবকতা

ভালো, যোজকতা ভালো, ভোজকতা ভালো, ইহাতে সংশয় নাই। এক পাঁচে যাহা হয় না, পাঁচ জড়ো করিলে তাহা হয়, অথচ পঞ্চানন্দই কোন এক পাঁচে হয়। আমার হয় বটে, কিন্তু বুঝিয়া দেখুন পঞ্চানন্দের হয় না।

ঘরের রসের কথা বলিয়াছি, সেটা মজ্জাগত, বাহিরে যে রকম টান, ভগবান্ জানেন তাহাতে টাক্‌রা শুখাইয়া যায়; পঞ্চানন্দে মাহিয়ানা বাড়ে না, টেক্স কমে না, উপাধি জোটে না, সুখ্যাতি রটে না, আয়েস্ মেটে না, ফল কথা মনের মতন কিছুই ঘটে না, ইহাতে কি রসিকতায় মন ওঠে? কিছুতেই না।

শূন্যপেটে ঢেকুর তোলা আর ছাঁচি পানে মুখশুদ্ধি করা অভ্যাস ইংরেজের থাকিতে পারে, ফরাসির থাকিতে পারে, মার্কিনের থাকিতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালীর কখনই নহে। বাঙ্গালী সারগ্রাহী, কাজ বোঝে, ফক্‌কুড়ী বোঝে না, সেই জন্য বাঙ্গালী বিদ্রূপ করে, বিদ্রূপ সহিতে পারে না। তবে বলুন দেখি, পঞ্চানন্দে তাহার কি আনন্দ হইবে? যাহার চক্ষু আছে, সেই দেখিয়াছে যে বাঙ্গালী লিখিয়া সুখী, পড়ে না; খাটাইয়া সুখী, খাটে না; এই টুকু শিখিয়া রাখা উচিত, সেই জন্য একটা কথা আছে—"শতং বদ মা লিখ"। আমি আরও একটু বলি শতং লিখ মা ছাপো। রসিকের কাছে রসিকতা কেবল বিড়ম্বনা। সক্ হয়, "শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কার্য্যে" সক্ মিটাইতে পারেন।

স্বার্থপরতার দাস হইয়া অর্থের টান ধরিয়া অনর্থক হাড় জ্বালাতন করিবেন না।

নূতন ভূগোল।

পৃথিবীর আকৃতি।

১। পৃথিবীর আগাগোড়া চাপা. নহিলে সমস্তই গোল। চাপা বলিয়াই সকলে মনের কথা বলিতে পারে না। এবং সকল সময়ে সত্য কথাও বলিতে পারে না।

২। যাঁহারা খেলেন, তাঁহারা বলেন পৃথিবী ভাঁটার মত, যাঁহারা পেটুক তাঁহারা বলেন কমলা লেবুর মত। কথা একই, তবে যাহার যেমন রুচি।

৩। জাহাজ আসিতে দেখিয়াই গোল বোঝা গিয়াছে. গ্রহণ দেখিয়া সন্দেহ ভঞ্জন হইয়াছে।

পৃথিবীর গতি।

১। পৃথিবীর দুই গতি ; নিত্য যাহা হয় তাহাকে দুর্গতি এবং বৎসরে যাহা একবার হয় তাহাকে সদ্গতি বলা যায়।

২। পৃথিবীর গতি নিয়মিত চক্রে হইয়া থাকে, সে চক্র দেখা যায় না, অনুমান করা যায়, সেই জন্য তাহাকে অদৃষ্টচক্র বলে।

৩। পৃথিবী শূন্যে অর্থাৎ অকূল পাথারে ভাসিতেছে, দাঁড়াইবার স্থল নাই।

৪। পৃথিবী এক গ্রহ, আরও অনেক গ্রহ আছে, সকলেই টানাটানি করে, তাই পৃথিবী এক রকমে চলিয়া যায়।

পৃথিবীর ভাগ বর্ণন।

১। পৃথিবীর কতক জল, কতক স্থল; ভাষা কথায় ইহাকে অর্দ্ধ গঙ্গাজলী বলে, কিন্তু সেটা ভুল; কারণ, জলই বেশী।

২। অধিক ভূমি এক স্থানে দেখিলেই দ্বেষ হয়। অনেকে দ্বেস স্বীকার করিয়াও লেখেন—দেশ। ফলতঃ দ্বেষে দোষ নাই, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত; কেননা দেশ-ত্যাগী হইতে যে সে অনুরোধ করে; কিন্তু দ্বেষত্যাগী বলিয়া কোনও কথা চলিত নাই।

৩। যেখানে গৌরাঙ্গের জন্ম, সেই স্থানকে দ্বীপ বলে; দেশী গৌরাঙ্গের জন্মস্থান বিশেষরূপে জানা-ইতে হইলে নবদ্বীপ বলা যায়।

৪। বড় লোকে যেখানে হাত ঝাড়ে সেই স্থানে পর্ব্বত হয়।

৫। অন্ধকারে সিঁধ কাটিয়া সিঁধের ভিতর হাত বাড়াইয়া দিলে সেই হাতকে অন্তরীপ বলা যায়, গৃহস্থ যদি সেই হাত চাপিয়া ধরে, তখন তাহাকে যোজক বলে।

৬। যাহা সকলে ডিঙ্গাইতে পারে না, অথচ ডিঙ্গাইতে পারিলে অমরত্ব লাভ করা যায়, তাহাকে সমুদ্র বলে।

৭। উচ্চ কুলে জন্মিয়া যে নিজের তরলতা দোষে আপনি ভাসিতে ভাসিতে শেষে দুই কুল ভাসাইয়া সাগর সঙ্গমে প্রাণত্যাগ করে, তাহাকে নদ বলে।

৮। জলের অন্যান্য বিবরণ দেওয়া গেল না। বঙ্গদেশে দড়ী কলসী অত্যন্ত সস্তা শুদ্ধ সেই কারণে। তদ্ভিন্ন অনেকে জল দেখিলে ভয় পান।

পৃথিবীর স্থূল স্থূল বিবরণ।

১। মানচিত্র করিবার সুবিধার জন্য পৃথিবীকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। দুপাটী মণ্ডা (১) ছাড়াইয়া দুই ভাগে রাখিলে যেমন হয় সেই ভাবে পৃথিবীও দ্বিধা অঙ্কিত হয়।

২। বারকোসে মণ্ডা সাজান থাকিলে যে পিঠে ধূলা গুড়া বেশী পড়ে তাহাকে কহে পুরাতন পৃথিবী। আর এক পাটী এক সঙ্গে সৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও প্রথমে নজরে পড়ে না, শেষে ভদ্র লোকের সুখসেব্য হয়, তাহাকে নূতন পৃথিবী বলে।

৩। পুরাতন পৃথিবীতে ভিড় বেশী, নানা প্রকার নরলোকের সমাগম। যেখানে প্রথমে আসিয়া জমায়েৎ হইয়া তথা হইতে, নরকুল পৃথিবী ছাইয়া ফেলে এবং শেষে যেখানে আসিয়া নরগণ (বিকল্প) দৌরাত্ম করে, তাহাকে কহে আসিয়া। কাফেরীর যেখানে জন্ম, তাহাকে কহে আফেরিকা। কেহ কেহ বলেন

। এ তত্ত্ব ঠাকুরই জানেন।

শ্মশানের নন্দী।

যে আফেরিকার প্রকৃত নাম আফেরুকা; ইয়রপে (Europe) যে প্রকার সিংহ ভল্লুক প্রভৃতি চতুষ্পদ এবং গৃধ্র প্রভৃতি মহা পক্ষীর প্রভুত্ব তাহাতে ফেরু হইতে আফেরুকার নাম করণ অসম্ভব নহে। যিনি ইয়রপ, তাহার পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, কারণ ইয়রপের অর্থই (you-are up) তুমি এখন উপরে।

৪। পৃথিবীর যে আধ খানা যুড়িয়া দেবগণ বাস করেন এবং যেখানে বাস করিলে অমরতা লব্ধ হয় তাহার নাম অমরিকা। দেবগণের আবির্ভাবের পূর্ব্বে যে সকল লোক বাস করিত, তাহাদের নাম অনুসারেও কেহ কেহ এই মহাদেশের নাম করণ করিয়া থাকেন, ঐ অনুসারে অমরিকারে কেহ কেহ মারক্ষীণ (১) বলিয়া থাকেন।

১। মারের চোটে ক্ষীণ।

ছাপাখানার নন্দী।